তন্ত্র-প্রভাব

জগন্নাথ ব্রহ্মচারী

সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৭০

শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সাহিত্যালোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০৬
থেকে প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা ৭০০ ০০৬ হতে মুদ্রিত

নয়নশোভা।

নয়নশোভার ভেতরটা যে কি, সত্যিই সে কে ?

মা হ'য়েও সে মা নয়। স্ত্রী হ'য়েও সে স্ত্রী নয়।

সে দেবী-মানবী, না দানবী ? না কোন অজানা রহস্যলোকের রহস্যময়ী ?

সেই নয়নশোভারই জীবনসন্ধান এখানে—লেখার পরতে পরতে।

কি দুর্জয় আকর্ষণ!

একটু দাঁড়াতে দিচ্ছে না ভানুকিরণকে।

পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিচ্ছে সামনে। সামনে থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে এগিয়ে। আগে। আরো আগে। আরো আরো আরো···।

কে কার কথা শোনে! নাজির ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে পেছনে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। বারণ করছে।—সায়েব! যাবেন না! যাবেন না। মত জাইয়ে। ঠাহরিয়ে।

ওর গলার সুর শতসহস্রের স্বর হ'য়ে বেজে উঠছে। নির্জন পাহাড়ি পথে। ওর কথা আছড়ে পড়ছে পাথুরে টিলার গায়ে গায়ে। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ঘুরছে ফিরছে এক টিলা থেকে আর এক টিলায়। দূরে দেখা যাচ্ছে গোলকোণ্ডা দুর্গ। পাহাড়ের ওপর পাথরে-ইটে গড়া বিশাল দেহ। জনমানবশূন্য একা আজ। বড় একা! ওখানেও কি নাজিরের আওয়াজ পৌঁছুচ্ছে ? কে জানে!

পৌঁছুলেও শোনবার কি কেউ আছে ওখানে আজ ?

নাজিরের নজর পড়ছে ওধারে আর ব্যথা ঝরা নিশ্বাস ঝরে পড়ছে বারবার।

সায়েবের জন্যে অশুভ-আতঙ্ক একটা মনের কোণে দোলা দিচ্ছে ভীষণ। ও অস্থির হ'য়ে পড়ছে ভয়ানক। এদিক-ওদিকের গাছ-পালাও কি তার নিশ্বাসের সঙ্গে নিশ্বাস ফেলছে থেকে থেকে ?

নিজের পায়ের শব্দ, সায়েবের পায়ের শব্দ—এর সঙ্গে ভেসে আসছে অসংখ্য-অগুনতি পায়ের শব্দ। লালমাটির ধুলো উড়ছে চোখের সামনে—দু'পাশে। ডাইনে-বাঁয়ে। সবই কি দেখার ভুল, না মনের ভুল!

পড়িমরি করে ছুটছে নাজির।

সায়েব যে তার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। এখুনি পৌঁছুতে না পারলে, নাগালের বাইরে চলে যাবে শেষে!

দুরন্ত বাতাস ধীরে ধীরে শান্ত হ'য়ে আসছে। মৃদু বাতাসের মিষ্টি দোলনের আমেজ নাজিরের দেহে মনে। অশান্ত মনের উৎকণ্ঠা-উত্তেজনা শান্ত হ'য়ে এসেছে। মুহূর্তে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসে যাচ্ছে নাজিরের। সায়েবের জন্যে ভাবনা-চিন্তা-ভয়, সমস্ত উবে গেছে ভেতর থেকে। নাম না জানা কত রঙবেরঙের ফুলের সুবাস ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছে নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে! মন মাতানো মাতন তুলছে ভেতরে-বাইরে।

তারামতি মহলের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

অনেকটা ভেঙে পড়েছে। ছড়ানো-ছিটানো মর্মছেঁড়া ধ্বংসের চিহ্ন শুধু। তবু মনে হ'চ্ছে সবেতে প্রাণের মোলায়েম পরশ। সমস্ত জীবন্ত। জেগে উঠেছে প্রাণের সাড়া। হয়ে উঠেছে চঞ্চল-মহল। ভেসে আসছে সুরের ঝঙ্কার। কানের পাশে বেজে উঠছে পাপিয়া কণ্ঠের মধুর সুরেলা স্বর। গানের কলি। সুরে সুরে খেলে চলেছে অন্তর নেঙড়ানো আবেদন-বাণী। কার কাছে এ প্রাণ কাঁদানো আবেদন করছে এখানে ?

সচেতন হ'য়ে উঠেছে নাজির।

এই নির্বান্ধবপুরীতে ভরসন্ধেয় কে গাইছে! তাকাচ্ছে চতুর্দিকে চনমন ক'রে। না। নজরে পড়ছে না কাউকে। আকাশের আলো

নিভেছে। অন্ধকার নামছে। শোনা কথার চিন্তা অনেক সময় ভালো লাগলে, মনে দাগ কেটে বসে যায়। সময় বিশেষে নিরালায় স্বপ্নের মতো ভেসে বেড়ায় দৃষ্টিতে। ভেসে আসে চারশো-পাঁচশো বছর আগের গাইয়ের গলা-গান মনের কানে। মনে হয় সত্যি।

নিজের মনকে সুস্থ-সবল-স্বাভাবিক ক'রে তুলতে চেষ্টা করে নাজির। নিজেকে নিজেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, না না। সত্যি নয়। ভুল ভুল!

আবার দৌড়তে শুরু ক'রেছে নাজির।

সায়েবকে দেখতে পাচ্ছে না। সায়েব না রাস্তা ভুল ক'রে বসে। এখানকার অতীত যার শোনা আছে, তাকে নাজিরের মতো ভুলের বিষম ফাঁদে পড়ে আটকে যেতে হবেই হবে। ভুলকে ঠিক ভেবে না মিথ্যে মোহের টানে কোন ধ্বংসস্তূপের ভেতর যেতে চেষ্টা না করে সায়েব।

বাড়িতে মেয়ে আছে সায়েবের, আছে মেমসায়েব।

আবার উৎকণ্ঠা। আবার ত্রাস।

কিন্তু মিথ্যে ভাবলেও, ভাবতে পারছে কই নাজির। এ যে সত্যি-সত্যিই শুনছে। আগের চেয়ে আরো জোরে, আরো স্পষ্ট। গান গান গান। মানুষের গলার।—ক্যা ফরিয়াদ করুঁ ম্যায় কিসকো, শুননেওয়ালা কই নহী···। দুনিয়া ভুলিয়ে দেয়া গান। পাগল করা গান। যত বড়ই নিষ্ঠুর হ'ক, যত বড় হৃদয়হীন অবিশ্বাসী হ'ক না কেন, এ গানে হৃদয় গলবেই গলবে।

গোলকোণ্ডা দুর্গ এখান থেকে মাইলখানেক। তবু যেন কত কাছে এগিয়ে এসেছে। গানের টানে কি?

হ্যাঁ, একসময় ওখানকার সুলতান আবদুল্লা কুতুবশাহ এই তারামতি মহলে বসে গান শুনতেন তাঁর খুশির বেগম তারামতির কাছে বসে বসে। তারামতি মহলে। সে তো অনেক আগের কথা। প্রায় চারশো-পাঁচশো বছর হ'য়ে গেল। তখন এই গানের সুর কথা ভেসে ভেসে বেড়াত বাতাসে। যে-যেখানে দাঁড়িয়ে শুনতে পেত, সে নাকি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়েই থেকেছে। গান থেমে যাবার পরও।

খানিকক্ষণ। রেশ শেষ হ'য়েও যেন শেষ হ'তে চায় না।

সে সব আজ ইতিহাস। গল্প কথা। কিন্তু নাজির নিজের কানে শুনছে যা, অবিশ্বাস করে আর কেমন ক'রে, উড়িয়ে দেয় আর কেমন ক'রে।

অনেক লোকের মুখে শুনেছে নাজির।

তারামতি মহল থেকে এখনো সন্ধের পর গানের আওয়াজ আসে। আছড়ে পড়ে মাটির বুকে। লালমাটি তখন অন্ধকারেও দেখা যায়। রক্তরাঙা। গাছের সবুজে—পাতায়-পাতায় সুরের কাঁপন। সারেঙ্গীর তার বেজে ওঠে। সব সময় না শুনলেও, মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়।

লেখাপড়া জানা নাজিরের মন মেনে নিতে চায় নি প্রথন-প্রথম। কল্পনাপ্রিয় লোকেদের ধারণা স্রেফ।

রটনার মধ্যে কিছু না কিছু ঘটনা থাকে। যা নেই, যা হয় না, যা হবে না—কল্পনায় আসবে কেমন ক'রে! জল মাটি আলো বাতাস—সবের সঙ্গেই মানুষের একটা নাড়ির যোগ। এসবের ছায়াই তো নানা ভাবে কল্পনার জাল বোনে মানুষের মাথায়। মানুষ তো আর সৃষ্টিছাড়া নয়। যা নেই, তা মনের বাসায় বাসা বাঁধবে কেমন ক'রে! সে গোচরেই হ'ক আর অগোচরেই হ'ক।

এখনো দুর্গের ফটক দিয়ে প্রবেশ ক'রে চৌকোণা জায়গাটায়—কামানের সামনে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে, চারশো ফুট উঁচু অবধি ধ্বনির প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে পরিষ্কার। এ-ও কি সেই রকম! তারামতি মহলের পাথুরে দেয়ালে তারামতির কণ্ঠ-গান ধরা রয়েছে অক্ষয়-অমর হ'য়ে। বাতাসের স্পর্শে বেজে ওঠে থেকে থেকে। হবে বা। কে জানে কি রহস্য!

সায়েবের কি খেয়াল চাপলো মাথায় আচমকা। অফিস থেকে ফিরেই বললে এধারে আসতে। মানা করেছে নাজির। ইতিহাস মাখানো রহস্যপুরী তারামতি মহলের শোনা ঘটনার কথা-বর্ণনা শোনাতে বাকি কিছু রাখে নি। কানে নেয় নি সায়েব। বাড়ি থেকে বেরোবার

মুখে কেমন আনমনা হ'য়ে পড়েছিল। কেমন উদাস-উদাস ভাব। এমন অবস্থায় সায়েবকে এর আগে দেখে নি কোনদিন কোনসময় নাজির। গাড়ি চালানো-দেখাশোনার ভার নাজিরের ওপর।

সদা হাসিখুশি সায়েব কোনদিন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে নি। অমায়িক অহঙ্কারশূন্য।

বলে, নাজির সবই সময়ের ব্যাপার। অবস্থা বিপাকে আজ তোমার এই অবস্থা। কে বলতে পারে, তুমি একদিন বড় হবে না। নিশ্চয় হবে। মনের জোর রাখো। বিশ্বাস রাখো।

সায়েব বড় অফিসের নামীদামী মানুষ নয় তো শুধু, নাজিরের বিপদে-আপদে মা-বাপ বন্ধু।

নাজির মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছে।

খুঁজছে খুঁজছে খুঁজছে।

এস্তূপ-ওস্তূপ। পাচ্ছে না। অস্থির হ'য়ে পড়েছে। গানের সুরের পথ ধরে ধরে এগোচ্ছে। সায়েব দূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে দরজা খুলে একরকম লাফিয়েই নেমে পড়ে। তারপর এই দিকে হন হন ক'রে বাতাসের গতির বেগে এগিয়ে এসেছে।

প্রথমে চুপচাপ বসে থেকেছে গাড়িতে নাজির। সায়েবের চলার ধরনধারণে কেমন সংশয় এসেছে। বসে থাকতে পারে নি স্থির হ'য়ে আর।

ফিকে আঁধারে চোখের আলোয় সায়েবের অনুসন্ধান ক'রে চলেছে নাজির।

খানিক যাবার পর থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। স্তূপের দক্ষিণদিকে একটা ছায়ার মানুষ দাঁড়িয়ে। স্তূপের ওপর পা ঝুলিয়ে বসেও এক ছায়ার মানুষ। নারী কি পুরুষ ঠিক ঠাহর ক'রে উঠতে পারছে না। তবে যতটুকু মনে হয়, নারী। হৃদয়ের সুরের তারে মেলানো সুর ওখান থেকেই উঠে আসছে যে। ছায়ার শরীরের গান নয়। ছায়ার কণ্ঠে স্বর বেরোনোর যন্ত্র কোথায়। নিশ্চয় রক্তমাংসের মানুষ ও। অন্ধকারে ধাঁধার ভ্রমে মিথ্যে এ ছায়াদর্শন। দাঁড়ানো ছায়াও নিশ্চয়

তার সায়েব। গায়িকা গানে তন্ময়। সায়েব শুনে তন্ময়। গায়িকা সায়েব নাজির—এ তিনজন ছাড়া ত্রিসীমানায় চতুর্থ আর কেউ কোথাও নেই। যাক, সায়েবের হদিশ পেয়েছে তো সে। ওদের দুজনের এ তন্ময়ের ঘোর ভাঙতে চায় না নাজির। আর তাছাড়া নাজিরও তো চাইছে, এ গান যেন না থামে এখুনি। এই নিরালায় কে গাইছে কোথা থেকে এসেছে কেন এসেছে একা একা—মনের মধ্যে প্রশ্নের পর প্রশ্নের তুফান উঠেই নিমেষে কোথায় হারিয়ে গেল। গানের রাজ্যের গভীর অতলে তলিয়ে গেল নাজির।

ক্যা ফরিয়াদ করুঁ ম্যায় কিস্ কো
শুননেওয়ালা কোই নহী।
দিল কা দরদ্ দিল মে রহা
মিটানেওয়ালা কোই নহী।
কিধার জাউঁ, ক্যা ম্যায় করুঁ,
আন্ধেরি মে ডুবকে মরুঁ,
করিব মে মেরে কোই নহী হ্যায়
বাঁচানেওয়ালা কোই নহী।

যেখানে শোনবার কেউ নেই, সেখানে কার কাছেই বা আরজি করা হবে। অন্তরের ব্যথা অন্তরেই গুমরে মরে। লাঘব করবার কেউ নেই। অন্ধকারের গহনে ডুবেই মরতে হচ্ছে। ধারেকাছে বাঁচাবার কেউ নেই। কেউ নেই কেউ নেই কেউ নেই।

বাতাসে কি মর্মস্পর্শী হাহাকার ধ্বনি।

সচেতন হ'য়ে উঠেছে নাজির। মনে হচ্ছে ছুটে যায় ওখানে। বলে, না না। শোনবার লোক বাঁচাবার লোক আছে। যেতে পারছে না এগোতে পারছে না। মুখ দিয়ে সান্ত্বনা-আশ্বাসের কোন কথা বেরোচ্ছে না। একটা কাঠের পুতুল হ'য়ে গেছে যেন। ভেতরে কি অসহ্য যন্ত্রণা মাথা কুটছে। নীরব-বোবা আর্তনাদ।

নাজিরের দৃষ্টি অপলক।

দেখছে তার সায়েব ভানুকিরণ কিন্তু এগোচ্ছে গায়িকার কাছে।

ভানুকিরণের ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠছে। গায়িকার '…বাঁচানে-ওয়ালা কোই নেহী' শোনবার সঙ্গে সঙ্গে চমক ভেঙেছে। ভেতরে কি আকুলি-বিকুলি। স্থান কাল পাত্র ভুলেছে। নিজে কে-তা-ও ভুলেছে। এতক্ষণ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ ক'রে স্বপ্নের মানুষ হ'য়ে উঠেছে। ও যেন সত্যিসত্যিই সে-যুগের সুলতানি আমলের—পারস্যের রক্ত বয়ে যাওয়া শরীরের মানুষ একটা। সুলতান আবদুল্লা কুতুবশাহ। গোলকোণ্ডা দুর্গের সুলতান। হায়দ্রাবাদের সর্বেশ্বর। তারামতির অন্তরতম।

এতটা সময় ধরে এই মন নিয়েই যেন তারামতির গান শুনেছে ভানুকিরণ। ওর সামনে যে স্তূপে বসে সে সত্যিকারের তারামতি। সঙ্গীতসাধিকা সুকণ্ঠের অধিকারী তারামতি। সুলতানের হৃদয়েশ্বরী তারামতি। সুলতান থাকতে তারামতিকে বাঁচাবার কেউ নেই! হতেই পারে না। জীবন থাকতে নয়।

কতবার এসে এসে দেখে গেছে শাহীবংশের সমাধি-মসজিদ। তারামতির সমাধি তারামতির মসজিদ। তবু কি অতীত মোহে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে ওর মনপ্রাণ, সে-সব স্মরণে আসছে না একদম। তারামতি বাস্তবে নেই। আছে শুধু স্মৃতি। এ বোধটুকুও আসছে না ভানুকিরণের মাথায়।

গায়িকার ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজে বাতাসে বিষাদ ছড়িয়ে পড়ছে। নাজির স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে আবার। এ কান্না তারও সুরমা-আঁকা সৌখিন চোখের কিনারা ছাপিয়ে উঠছে।

ব্যথাকাতর ভানুকিরণ একেবারে গায়িকার সামনা-সামনি এসে পড়েছে। গম্ভীর মোলায়েম সহানুভূতি ঝরানো স্বরে ডেকেছে।—তারামতি।

কে? জাঁহাপনা! কান্নাভেজা গলা গায়িকার।

গায়িকাও বুঝি তারামতি মহলের ধ্বংসস্তূপে বসে তারামতির ভাবে বিভোর হ'য়ে, গেছে নিজেও। নিজের আসল অস্তিত্ব ভুলেছে। তা নাহলে সায়েবকে জাঁহাপনা বলেছে কেমন ক'রে।

মাথাটা কেমন হ'য়ে যাচ্ছে নাজিরের।

আশ্চর্য ব্যাপার সব। কাছে যেয়ে তুজনের ভুল ভেঙে দেয়া এবার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে নাজিরের। নাজিরের ভালো লাগছে না কিন্তু এসব ভাব। এখনকার আবহাওয়াটা বড্ড ভারী ভারী। একটু আগের মনভোলানো আমেজটা যেন কোথায় লুকিয়ে পড়েছে নিমেষে। হয়তো ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে হঠাৎই প্রবেশ করেছে আবার।

বিশ্বাস করে নি কোন অশরীরীর শরীর ধারণের কথা। তর্কাতর্কিতে বলেছে বন্ধুদের, ভীতু মানুষরা নিজের ছায়াতে ভূত দেখে। নেশার ঘোরে রঙিন চোখে কত কি দেখে আজগুবি। জিন-পরী—আরও কত কি।

কিন্তু উপস্থিত সে যা দেখছে, শুনছে—মনের কোণে বেশ দোলা দিচ্ছে। সত্যিই কি জিন নাকি। যাই হ'ক—সায়েবকে বাঁচাতে চেষ্টা করতে হবে জিনের হাত থেকে। জিনের আকর্ষণ থেকে। অনেকের ধারণা, তারামতি নাকি জিন হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়। আর দেরী নয়। বিপদের আশঙ্কায় ত্বরুত্বরু বুকে পা বাড়িয়েছে সবে, যেতে পারে নি। যে কথা কানে এলো, আর ওখানে যাওয়া তো চলেই না, তাছাড়া এখানে একদণ্ড দাঁড়িয়ে থাকাও উচিত হবে না। এখুনি ফিরে যেতে হবে ফেরার রাস্তায়। যেখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে একা।

নাজির ফিরে যাচ্ছে।

ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনছে তবু।

সায়েব বলছে, তুমি!

গায়িকা বলছে, তুমি!

সায়েব বলছে, প্রথমে মনে হয়েছে এ গলা আমার যে খুব চেনা খুব জানা। কত আদরের কত খাতিরের। পরে কি রকম একটা বিভ্রম এসে গেছে। তোমাকে তারামতি ভেবে নিয়েছি। তা একদিকে বলতে গেলে, তুমি তো আমার তারামতিই।

গায়িকা বলেছে, আমারও তো সেই দশা গো। নিজেকে হারিয়ে

ফেলেছি। তারামতি আমি এক হ'য়ে গেছি। তুমি আমার আবদুল্লা কুলি কুতুব শাহ হ'য়ে উঠেছো। হ'য়ে উঠেছো জাঁহাপনা। তা সত্যিই তো তুমি আমার জাঁহাপনা কি নয়।

সায়েবের অভিসারিণী নিশ্চয় গায়িকা। সায়েব জানে এখানে আসে। আসে সায়েবের সঙ্গে নির্জনে দেখা করতে—লোকালয়ের বাইরে। বেরোবার সময় সায়েবের মন এই দিকেই ছিল ব'লে কেমন কেমন দেখেছে নাজির।

নাজিরের অন্য কিছু ভাবনা নেই আর সায়েবের জন্যে। কেবল একটাই চিন্তা পেয়ে বসেছে বড্ড। সায়েবের মেমসায়েব আছে। আছে একমাত্র সন্তান। একটি মেয়ে। মা-মেয়ে বড় ভালো। মেমসায়েব ছেলের মতো দেখে। মেয়েকে দেখিয়ে বলে, নাজির তোর ভাই। মনটা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাজিরের। ওদের কথা ভেবে, ওদের সুখ ভেবে। সায়েবের মন থেকে ওরা বেরিয়ে না যায় শেষে। অনেক ক্ষেত্রে অনেকের এরকম হয়েছে। জানে নাজির। বারমুখী মন ঘরে ফিরতে চায় না সহজে। এমন ভালো সায়েব তার। বেশ কষ্ট হচ্ছে নাজিরের। আর ভাবতে পারছে না।

নাজিরের অবাক হবার পালা এবার আরো।

সায়েব আর গায়িকা—দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে এগিয়ে আসছে গাড়ির দিকে। পেছনে অন্য একখানা গাড়ি। সওয়ারী নেই, শুধু ড্রাইভার। গাড়িটা কোথায় ছিল কে জানে। নজরে পড়ে নি কা'রো। হয়তো পাহাড়ের আড়ালে-আবডালে।

একটা বিস্ময়ের পরদা সরে গিয়ে আর একটা বিস্ময়। এটা সরে যেতে না যেতে আর একটা। নাজির কি ঘুমিয়ে না জেগে। স্বপ্নের কুহকিনী মায়া, না সত্যিকারের কায়ার খেলা। মাথার ভেতর সব ওলোট-পালোট হ'য়ে যাচ্ছে। কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। যথার্থই বিগড়োলো নাকি মাথাটা?

সায়েবের ডাকে খেয়াল হতেই চমকে উঠে দরজার হাতল ঘুরিয়ে নিচে নেমে দরজা খুলে দিয়েছে।

যাকে ভেবেছিল জিম যাকে ভেবেছিল অভিসারীণী যাকে ভেবেছিল তারামতি, সে কিন্তু তারই সায়েবের মেমসায়েব। ভানুকিরণের স্ত্রী নয়নশোভা।

নয়নশোভাকে দেখে হতবাক-হতভম্ব নাজির।

আশ্চর্য! মানুষ পরিবেশের আওতায় পুড়ে ধারণার বশে। চিন্তা-ভাবনার রাজ্যে কত না ভুলের মূর্তি গড়ে তোলে মনে মনে। নিজের মনের ছবিই দেখে তখন মনের নজরে। বাইরে কোন নেই অস্তিত্ব তার। একেবারে নেই-ই বা বলে কি ক'রে। অস্তিত্ব একটা না একটা থাকে। তবে সেটার আসল রূপ ঢাকা পড়ে যায় ধারণার নানা রঙের তুলির প্রলেপে। আছে সায়েব আছে মেমসায়েব আছে নাজির। এটাই পুরো বাস্তব। আর বাকিটা বাস্তব-অবাস্তবের আলো-আঁধারির মেলামেশা।

গাড়ি চলছে।

সেকেন্দ্রাবাদে যাবার রাস্তা ধরেছে নাজির। সারাদিনই আজ মেঘ-রোদ্দুরের লুকোচুরি খেলা চলেছে। কখনো রোদ্দুর আবার কখনো মেঘ। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া আর ঝমঝমে বৃষ্টি। আবার যে-কে সেই। বৃষ্টি পড়ছে এখন। পাহাড়ে রাস্তায় কনকনে বাতাস। সন্ধে পেরিয়ে রাত্রির বাসর এখন। শীত-শীত ক'রছে। ভাদ্রমাস গেছে সবে। গণেশ চতুর্থী থেকে নদিন পর্যন্ত কি ধুমধামে হায়দ্রাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদ জুড়ে মাটির তৈরী গণপতির বিশাল মূর্তির পুজো উৎসব হয়ে গেছে। পথে ঘাটে প্যাণ্ডেলে—চতুর্দিকে চতুর্ভুজ গণপতি। কি ভাগ্যিস সে সময় বৃষ্টিবাদল নামে নি তাই রক্ষে। লোকের খুশি-আনন্দ —সমস্তই মাটি হ'য়ে যেত।

কত না সায়েব-মেমসায়েব আর ওদের মেয়েকে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখিয়ে বেড়িয়েছে নানা ধরনের সাজসজ্জার নানা ভাবের দেবতাকে। কি খুশি মেমসায়েব। উৎসব সম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞেস ক'রেছে। বকশিস নেবে না নাজির কিছুতেই। জোর ক'রে হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়েছে মেমসায়েব টাকা। অবাক কাণ্ড! সেই মেমসায়েবকে চিনতে

ভুল। লোকে যে বলে, ঠিকই। চোখে দেখেও নির্ভুল ভেবে নেয়া উচিত নয়। চোখকেও বিশ্বাস করা যায় না। কানও ভুল করে রীতিমতো। কানে শুনেও চেনা-গলা চেনা মনে হয় নি। যেন অন্যের। কানকেও বিশ্বাস করা যায় না সম্পূর্ণ। একসময় বড়দের এ-উপদেশে হেসে কুটিকুটি হয়েছে নাজির। মানতে চায় নি। আজ নিজের ব্যাপারে নিজের বোকামিতে নিজেরই হাসি পাচ্ছে।

নাজির। সেকেন্দ্রাবাদে নয়। হায়দ্রাবাদে নিয়ে চলো। অনন্ত-দেবজীর বাড়ি।

স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে, প্রথমে একটু ইতস্তত করেছে নাজির। এত রাত্তিরে।

পেছন থেকে নয়নশোভার কণ্ঠস্বর। শুনেছে আবার। শুনতে পেয়েছো? বাড়ি নয়। অনন্তদেবজীর বাড়ি। অনন্তদেবজী—

...নতুন শহরে সুন্দর পরিবেশ।

...টিলার ওপর ছোট্ট বাংলো বাড়ি। দূর থেকে দেখলে, পটে আঁকা ছবি একখানা। নিঝঝুম-নিস্তব্ধ চকচকে-ঝকঝকে রাস্তা।

ওপর থেকে ভেসে আসছে জলদগম্ভীর স্বরে স্তোত্রগান।

ব্রহ্মানন্দ চিদানন্দং ত্বম্।
পূর্ণানন্দ পরিপূর্ণং ত্বম্।
তুমি আনন্দঘন দেব
আনন্দ-আধার।
পরিপূর্ণ-পরিতৃপ্তি করুণা অপার।

গাড়ি থেকে নেমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দু'জনে। নয়নশোভা-ভানুকিরণ।

এভাবে সায়েব-মেমসায়েবকে রাস্তায়—দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজে খুব বিব্রত বোধ করছে নাজির। এগিয়ে কলিংবেল টিপতে যাচ্ছে, ইশারায় বারণ ক'রেছে ভানুকিরণ। না। অনন্তদেবজীর এ গান তো ঠিক গান নয়, নিজের মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বসংসারে বিশ্বপ্রাণে আনন্দ ঢেলে দেবার সাধনা এ যে। এ সময়ে এ সাধনাতে বাদ সাধে

কি কেউ জেনে শুনে। যারা ওকে জানে, যারা ওকে চেনে—উনি কি ধরনের মানুষ।

অনন্তদেবজীর সারা শরীর প্রকৃতি—সমস্ত কিছু মায় চিন্তাভাবনা অবধি আনন্দে গড়া। চিরস্থায়ী ক্ষয়বয়হীন আনন্দে। ওর হাসিতে-চোখেতে কথাবার্তায় আনন্দ-ধারা ঝরে পড়ছে সদাসর্বদা। যত নিরানন্দ যত অশান্তি নিয়ে কেউ আসুক না, ফিরে যেতে হবে তাকে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি-শান্তি-আনন্দে ভরপুর হ'য়ে।

যে কোন কারণই ঘটুক না কেন, বিরক্ত হ'য়ে ওঠার যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাওয়া গেলেও, কেউ কখনো দেখেনি সদাহাস্যময় অনন্তদেবজীর কপালে কোন বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে। বা মুখ ভার করতে, বা রূঢ় ভাষা বলতে।

সাদাসিধে পোশাক আশাক। কাঁচাপাকা চুলে মাথাভর্তি। ছোট করে কাটা। দেখলে ভয় আসে না। কোন লুকনো কথা লুকিয়ে রাখতে মন চায় না। বলে না ফেলা পর্যন্ত শান্তিস্বস্তি আসে না। ওর আদেশ-উপদেশ মনে অসম্ভব প্রেরণা এনে দেয়। এনে দেয় অফুরন্ত কর্মশক্তি। আনে প্রবল ইচ্ছে শক্তি। দুর্যোগ দুঃসময় বিপদ কাটিয়ে ওঠে মানুষ সহজে। অনন্তদেবজী সকলের আপনজন। সবার হৃদয়ের মানুষ। সবার অভিভাবক। সব দেশই ওর দেশ। সব দেশের মানুষজন—ছোট-বড় আমির-গরিব—সকলেই ওর আপন থেকে অতি আপন।

এই মানুষের কাছে ছুটে-ছুটে আসে ভানুকিরণ। আসে যখন-তখন। আসে নয়নশোভাও। অনন্তদেবজীর অবারিত দ্বার সকলের জন্যেই খোলা। তাই রাতেও আসতে সাহস করেছে ভানুকিরণ-নয়নশোভা।

গান থামলো।

দরজাখোলারও শব্দ হ'ল।

সুন্দর চোখের মানুষটি ওপর থেকে নেমে এসে নিজেই দরজা খুলে দিয়েছে হাসিমুখে।

নয়নশোভার অবাক চোখের চাউনিরও উত্তর দিয়েছে একগাল হেসে স্থিরধীর-শান্তি সুঠাম অঙ্গের দীর্ঘদেহী-গৌরবর্ণ সুপুরুষ মানুষটি। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর সাদা আলোয়ান। দু'কাঁধ বেয়ে পা অবধি লুটোচ্ছে। মৃদু গলায় থেমে থেমে বলেছে, নয়ন-কিরণ! আমি চেয়েছিলুম, তোমরা দু'জনে একসঙ্গে এসো আমার কাছে। ভেতরের ঘরে বোসো।

ওদের বসিয়ে ওপরের ঘরে চলে গেছে অনন্তদেবজী।

ঘরের ভেতরে একটা পবিত্র-স্নিগ্ধ পরশ। মধ্যিখানে পাথরের টেবিলে শ্বেতপাথরের ধূপদানিতে চন্দনধূপ জ্বলছে কটা। ঘুম পাড়ানো মিষ্টি সুবাস। দুধসাদা দেয়ালে কোন ছবি টাঙানো নেই। টেবিলেও রাখা নেই। পাথরের ফুলদানে সাদাফুলের বাহার। গোল ক'রে সাজানো সোফা-কৌচও সাদা কাপড়ে মোড়া। শ্বেতপাথরের মেঝেয় সাদা কার্পেট। সব থেকেও, মনে হয় ঘরে কিছু নেই বুঝি। নীল আলোয় ঘরখানি যেন একটা আকাশ। এ আকাশে মনের জ্বালাযন্ত্রণা দুঃখ-শোক হারিয়ে যায় কোথায়। খালি ঘুমুতে ইচ্ছে করে। দু'চোখের পাতাজুড়ে গভীর ঘুম নামে। সমস্ত ভুলিয়ে দেয়। নিমেষে এনে দেয় প্রাণভরা প্রশান্তি। প্রশান্তি প্রশান্তি প্রশান্তি।

আজ পাঁচছদিন আগে এই ঘরে এসেছে নয়নশোভা। একা। সঙ্গে ছিল না ভানুকিরণ। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক'রে কিছুতেই হার মানতে চায়নি নয়নশোভা। সেই জন্যে আবারো এই রাতেও আসা।

ভানুকিরণ বহু অনুরোধ-অনুনয়-বিনয় করেছে তাকে বাড়ি ফিরে যেতে। পারে নি সে ভানুকিরণের কাতর মিনতি রাখতে। তার স্বাধীনসত্তা হারিয়ে যাক, এটা মেনে নিতে কিছুতেই পারবে না সে। কিছুতেই না। সে কি করবে, ফিরবে, না—না? সমস্ত কিছু নির্ভর করছে অনন্তদেবজীর ওপর। ওর রায়ের ওপর। মুখের কথা খসবার ওপর। হ্যাঁ বা না। স্রেফ দু'টো অক্ষর। কিন্তু দু'টো অক্ষর নয় এখানে। এখানে দু'টো জীবন। কাছে আসার প্রশ্ন আর দূরে সরার প্রশ্ন।

অনন্তদেবজীর নির্দেশে তো মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিল। কিন্তু আবার দেখা হ'য়ে গেল ভানুকিরণের সঙ্গে অদ্ভুত-ভাবে। সংসর্গ ছাড়বো বললেই কি ছাড়া যায়। দেখা হ'তে, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে নয়নশোভা। ভাবটা যত সহজ, কার্য গতিকে ততটাই কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। ভানুকিরণকে দেখে সে-ও তো কেমন হ'য়ে গেছল। আগেকার নয়নশোভা হ'য়ে উঠেছিল আবার সব ভুলে গিয়ে।

ফেরার কথা শুনতেই নয়নশোভার ভেতরে জেগে উঠেছে তার নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা। না, আর নয়। ভানুকিরণের পেড়া-পীড়ি এড়াতে পারে নি। ওর মুখে অনন্তদেবের নাম উচ্চারণ শুনে। অনন্তদেবজী যা বলবে, মাথা পেতে নেবে ভানুকিরণ সেই আদেশ সেই উপদেশ। সেইটাই হবে তার জীবনের বড় আশীর্বাদ। আশীর্বাদ—আশীর্বাদ।

করুণমুখে গালে হাত দিয়ে বসে আছে একভাবে ভানুকিরণ। অনন্তদেবজীর ওপর থেকে নামার অধীর প্রতীক্ষা। টেবিলের এবারে সামনাসামনি কৌচে বসে নয়নশোভা। মুখ নিচু ক'রেই বসেছিল নিজের পায়ের দিকে চেয়ে একদৃষ্টে। কি ভাবছিল। ভানুকিরণের বুকখালি করা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ার আওয়াজে সচেতন হ'য়ে উঠেছে নয়নশোভা। মুখ তুলে তাকিয়েছে ভানুকিরণের দিকে। আহা! মানুষটা বড় অসহায়। সে ছাড়া ওর আর জগতে কেউ নেই। কিছু নেই। দেখলেও কষ্ট লাগে। তার জন্যেই তো বাড়ি-ঘর আত্মীয়-স্বজন—সমস্ত ছেড়ে একসময়। ওদের পছন্দ মতো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হোক, চেয়েছিল ওরা। নয়নশোভার সঙ্গে বিয়েতে একেবারে অমত। ও সুন্দরী-সুকন্যা মেয়ে কি কারো ঘরণী হয়ে থাকতে পারে নাকি। যার এখানে-ওখানে নেচে-গেয়ে বেড়ানো অভ্যেস। বিয়ে করলে, আহাম্মুকের মতো মস্ত ভুল করবে ভানুকিরণ। সারাজীবন ধরে পস্তাতে হবে ওকে। নয়নশোভার মাকে—জীবনতারাকে দেখেও কি জ্ঞানচক্ষু খুলছে না গো ছোঁড়াটার। ধনুকভাঙাপণ, সবাই

একদিকে আর ও একদিকে। এ বিয়ে স্বয়ং ভগবান এলেও, আটকাতে পারবে না। কারো সাধ্যি নেই, বাধা দেয়। সে কথা দিয়েছে যখন, তখন করবেই করবে।

ওর আবার কি মোক্ষম যুক্তি!

কেন, মেবারের রানী পদ্মিনী কি রূপসী ছিল না? কই, রূপের গরবে তো রাণা ভীমসিংহের মান মর্যাদাকে ধূলিস্মাৎ করে নি। বরং আলাউদ্দিনের সকল আশা-আকাঙ্খা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে আত্মাহুতি দিয়ে। স্বামীর সম্মানে স্বামীর বংশের সম্মানে।

সেই মানুষ ভানুকিরণ!

ভানুকিরণকে কি সত্যিসত্যিই ছেড়ে যেতে চেয়েছে, না চাইছে নয়নশোভা? মন থেকে তো নয়ই। কিন্তু পরিস্থিতি-পরিবেশ যে তাকে পাগল ক'রে তুলেছে। তুলছে প্রতিমুহূর্তে। একদম তিষ্ঠতে দিচ্ছে না। যে ভানুকিরণ তার ওপর কোন কথা কইত না, বাদ-প্রতিবাদ তো দূরের কথা, সেই ভানুকিরণ এখন সমস্ত ব্যাপারেই ভুল ধরতে আরম্ভ করেছে। রূপলেখা একা তারই মেয়ে নয় শুধু, নয়নশোভারও মেয়ে। মায়ের অধিকার বিস্মরণ হয়ে যাচ্ছে ভানুকিরণ। বাপেরই অধিকার নাকি কেবল মেয়ের ওপর। মেয়ের ভালোর জন্যে কিছু বলতে গেলে বিপদ। মেয়ের সামনেই হেনস্থা করতে কিছু বাকি আর রাখে নি ভানুকিরণ সেদিন।

অপরাধ?

মায়ের বাড়ি থেকে মায়ের পোষা প্রিয় কুকুর জুলু আর কলকাতা থেকে আনানো মিষ্টি বুলির টিয়াপাখী মিঠাইয়াকে—মায়ের দেয়াই নাম ছুটোর—নিয়ে এসেছে নিজের বাড়িতে। মাসখানেক হয়েছে সবে, রূপলেখা দেশত্যাগী হ'তে চাইল। কারণ, কুকুর-পাখীর উৎপাত—চিৎকার—বাড়িতে টেকা দায়।

সংসারের সব কাজই নিয়মিত তত্ত্বাবধান করেছে রোজ। বাপ-মেয়ের যাতে কোন ত্রুটি না হয়। বাপের অফিস যাবার আগে, মেয়ের কলেজ যাবার আগে, খাওয়া জলখাবার সমস্তই নিয়মমাফিক

ক'রে গেছে নয়নশোভা। তবুও কি মন পেয়েছে ওদের? পায় নি। ওদের আচার-ব্যবহারই তার প্রমাণ।

নয়নশোভা নিজে আর এক মেয়ের মা, অস্বীকার করছে না। তা বলে তার মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব মুছে ফেলতে হবে— মায়ের যত স্মৃতি। জুলুর কাছে দিনরাত বসে বসে খালি তাদেরই হচ্ছে। খা খা খা! খেয়ে খেয়ে পেট ফুলে উঠছে, সে ধারে লক্ষ্য নেই। কুকুর গেল তো পাখী নিয়ে পড়ল। গানটা গা-রে, গা না। গা গা গা। মায়ের সেই গানটা রে! ক্যায়সে বোলাউ ম্যায় উনকো···। বোবা হ'য়ে গেলি নাকি রে! মা নেই আজ, আমি তো তোদের রয়েছি। ভাবনা কি।

নে, আমি গাইছি। আমার সঙ্গে গা। ক্যায়সে···।

এইসব দৃশ্য প্রভুকিরণকে ডেকে এনে, নিত্যই দেখিয়েছে। বলেছে, পাপা! বল তো কি ক'রে থাকা যায়! পড়াশোনাই বা করা যায় কি ক'রে। দিনরাত বাড়িতে যদি এই চলে, বন্ধু-বান্ধবই বা দেখে কি বলে। আমার গান-বাজনা একেবারে চুলোয় যেতে বসেছে। বন্ধু-বান্ধবদেরও একই অবস্থা। বাড়িতে যদি এতটুকু শান্তি পাওয়া যায়। তার চেয়ে থাকার ব্যবস্থা কর অন্যত্র। হোস্টেল হ'ক, অন্য কারো বাড়ি হ'ক। এ পরিবেশে কোন উন্নতি হ'তে পারে না কারো।

ভানুকিরণের কাছে নয়নশোভার নামে তীব্র-তীক্ষ্ণ ভাষায় নালিশ জানিয়েছে রূপলেখা।

নয়নশোভা প্রতিবাদ করে নি। রূপলেখা যে তার একমাত্র মেয়ে। কত আদরের। ওই তার ছেলে ওই তার মেয়ে। কোলের পিঠের ভাইবোন থাকলে এরকম হেংসাহেংসি হয়। ওর তো আর ভাইবোন নেই। নয়নশোভাকে আগের মতো অত কাছে পায় না এখন। সেই ক্ষোভ-অভিমান। হওয়াই স্বাভাবিক। ওর দিদিমার বুকের ধন, নয়নের মণি ছিল ও। হয়তো ও দিদিমার স্মৃতি সহ্য করতে পারছে না। চাপা মেয়ে কষ্ট হয় বড্ড ওর ভেতরে।

নয়নশোভা জুলু আর মিঠাইয়াকে ছাতের ঘরে রাখার ব্যবস্থা করেছে। যাতে মেয়ের লেখাপড়ায় বাধা না পড়ে। গান-বাজনায় অসুবিধে না হয়।

সুবিধে করতে গিয়ে আরো উল্টো ফল ফলেছে। রূপলেখার উত্তেজনা চতুর্গুণ বেড়েছে, রাগ আরো বেশী। মাকে দেখিয়ে দেখিয়ে দুধের বাটি ছুঁড়ছে। ভাতের থালা ছুঁড়ছে। পাপা! মা বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। তুমি একটা বিহিত কর। ছাতে কি দাপাদাপি লাফালাফি মায়ের কুকুর নিয়ে। পড়বার সময় গাইবার সময় বুকে-মাথায় দমাদম হাতুড়ি পেটে যেন। নিচে ছিল তবু একরকম। এবারে মাথায় চড়ে নাচ!

ছাতেতে মা পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে করতে গলা ছেড়ে কি গান! আচ্ছা বল তো আশপাশের লোকরা কিভাবে! হাসাহাসি করে সবাই। পাগলের বাড়ি ভাববে না লোকে। লজ্জায়—অপমানে মরে যাই। লোকের কাছে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারি না।

নয়নশোভা বোঝাতে এসে, বাপ-মেয়ের মুখে যে ভাষা শুনেছে, ভাবা যায় না। এমনও হৃদয় হয় মানুষের! নিজের পেটের মেয়েও বুঝল না তাকে একটুও। তাকে চিনল না, তার মনটাও দেখল না।

দিদিমার কথা তুললে যদি মেয়েটা শান্ত হয়, লেখা! মাসখানেকের মধ্যে তোর দিদিমাকে কি একদম ভুলে গেলি রে!

আগুনে জল না পড়ে ঘি পড়ল যেন।

ক্ষেপে আগুন রূপলেখা।—সব ঘরেই তো মানুষ মরছে। কে অমর হ'য়ে থেকেছে কবে! মা যেন আর কারো মরেনি, মরে না। তোমার মায়েরও কি মা-বাপ মরে নি। সমস্ত তোমার আদিখ্যেতা আর বাড়াবাড়ি।

ভানুকিরণ গলা মিলিয়েছে মেয়ের সঙ্গে। তোমার শোক হ'য়েছে, হয়েছে। মেয়েটাকে ভাগী করতে চাইছ কোন আক্কেলে। বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়েছে নাকি। মাথা ঠাণ্ডা কর। মাথা ঠিক রাখো।

আমারও মা-বাপ গেছে। এটুকু মনে রেখো।

শুনতে পারেনি আর। এর চেয়ে আকাশ ভেঙে মাথায় বাজ পড়ল না কেন। সেটা তবু ছিল যে ভালো। ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে তাড়াতাড়ি। মেয়ের কান্নার আওয়াজ কানে আসছে। তার সঙ্গে অভিযোগ। আমার ভবিষ্যতের দিকে একটুও লক্ষ্য নেই কারো। থাক, মায়ের জিদই বজায় থাকে যদি, পাখী আর কুকুর যদি বিদেয় না হয়। সেই-ই বিদেয় হবে। আপদের শান্তি হ'ক সবার!

দু'কানে হাতচাপা দিয়ে তরতর ক'রে কালো পাথর বসানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছে নয়নশোভা। নাজিরের গাড়িতেই এসেছে এই বাড়িতে সাতসকালে। কি করবে, বুঝে উঠতে পারছে না নয়নশোভা। তাই পরামর্শ নিতে এসেছে চিরদিনের তাদের সুহৃদের কাছে। অনন্তদেবজীর কাছে।

প্রথমে চোখের জল মুছতে বলেছে অনন্তদেবজী। বাপের সামনে মেয়ের কান্না, ভালো লাগে না মা। আদ্যান্ত সমস্ত শুনে বলেছে, মা! দুঃখ কোরো না। মনে মনে কামনা কর, ওরা শান্তি পাক, ওরা যেন ঠিক ঠিক বোঝে। মা, সংসারে ভুল বোঝাবুঝিই বেশী। ওরা ভুল বুঝেছে। অপেক্ষা করলে, সময়ে সব ঠিকঠাক হ'য়ে যায়। ধৈর্য ধর। আসক্তিশূন্য হও মা। আসক্তিশূন্য। দেখবে অনেক শান্তি অনেক আনন্দ। ত্যাগ। ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। রাগ-দ্বেষ মান-অভিমান মোহ—ত্যাগ।

বাবা! তাহলে কি ওবাড়ি ত্যাগ করবো?

মন থেকে নাহলে কিচ্ছু হবে না। সবের মধ্যে থেকেও, সবের মধ্যে নেই তুমি। মন তৈরী কর এইভাবে। মা চলে গেছে, আর আসবে না। কুকুর-পাখীর সেবা কর! মাকে ডেকে এনো না বারে বারে। নিজে বুঝতে চেষ্টা কর একটু। চিন্তার মধ্যে কোন জিনিস না পেয়ে বসে বেশী ক'রে। সে-বস্তু সরিয়ে রাখবে। সরিয়ে রাখবে!

সরিয়ে রেখেছে নয়নশোভা।

জুলু-মিঠাইয়াকে মায়ের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। নিজেও সেই সঙ্গে।

নিজেকেও একটু সরিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু এসেও মন ঠিক রাখতে পারছে কই? মনের মধ্যে সদাই হু-হু করে। মায়ের কথা আরো বেশী তোলপাড় করে ভেতরে। মায়ের ড্রাইভার-গাড়ি নিয়ে রোজ বেরিয়ে পড়ে। মা যেখানে তাকে ছোটবেলায় নিয়ে গিয়ে পাশে বসিয়ে রাখত, সেই জায়গার আকর্ষণ অনুভব করে ভেতরে। নিজে ন'দশ বছর বয়েসে ফিরে যায় যেন।

তারামতিমহলের স্তূপে বসে বসে মা আপন মনে দু'চোখ বুজে গান গাইত। মনে পড়েছে সেই গান, সেই তন্ময়ভাব। সে-ও মায়ের মতো হ'য়ে পড়ে। মা আর সে এক হ'য়ে যায়। তার মধ্যে বেঁচে ওঠে তার হারিয়ে যাওয়া মা। কিছুক্ষণের জন্যে সব কিছু ভুলে যায়। মা যেমন তারামতি হ'য়ে উঠত, সে-ও তারামতি হ'য়ে, ওঠে। খানিকবাদে ড্রাইভার উপনয়ন ডেকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায় প্রতিদিন।

ভানুকিরণ অফিস ফেরত রোজই মায়ের বাড়িতে গেছে নয়নশোভার খোঁজে। দেখা হয় নি। মাসিমার কাছে শুনেছে, নয়ন বিকেল হ'লেই কেমন যেন হ'য়ে যায়। একেবারে অন্য মানুষ। কোথায় বেরিয়ে যায়। সন্ধের পর আবার ফিরে আসে। অর্গ্যান বাজিয়ে জীবনতারার, ওর মায়ের গাওয়া গান গায় একটার পর একটা।

ওর যা মনের অবস্থা। ভয় হয় মাসিমার। ভয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে না। ড্রাইভারকেও না। যদি জানতে পেরে অনর্থ ক'রে বসে কিছু। যাতে শান্তি পায় ও, পাক। মাসিমা বাধা দিতে চায় নি ওকে কোন বিষয়ে। ও বড় অভিমানী। বোন তার কোন সুখশান্তি পায় নি জীবনে। নয়নকে নিয়েও বড় চিন্তা ছিল তার। নয়নের জীবন যেন তার মতো না হ'য়ে পড়ে শেষে। মাসিমা শাড়ির আঁচলে দু'চোখ মুছে ভানুকিরণের দু'হাত ধরে অনুনয় করেছে। বাবা! ওকে একটু বুঝতে চেষ্টা কোরো তোমরা দু'জনে—তুমি আর লেখা। ওর মনের দিকে চেয়ে ভেবো একটু। সবে মাকে হারিয়েছে। তোমাদের কাছেও যদি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পায়, তাহলে ও দাঁড়ায় কোথা। নিজের জীবনের ওপর না একটা ধিক্কার এসে যায় এতে। সেই ভয়টাই বেশী মাসিমার।

ছু'চোখ জলে ভরে উঠেছে ভানুকিরণের। গলার স্বর বেরোয় নি একদম। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। কেউ না জানুক, কেউ বিশ্বাস না করুক, কিন্তু নয়নশোভা তো জানে তাকে ভালোরকম। ওর অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই তো। নয়নশোভার কিছু হ'লে, ভানুকিরণও কি বেঁচে থাকবে? না। বাঁচতে পারে না। বাঁচবে না কখনো। যেটা তার মুখ দিয়ে বেরোনো মোটেই উচিত নয়, সেই কটুভাষা যে কি ক'রে বেরিয়েছে, ভানুকিরণ নিজেও ভেবে আশ্চর্য। ভানুকিরণ অনুতাপের-অনুশোচনার জ্বালায় জ্বলেপুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছে। নাওয়া নেই খাওয়া নেই ঘুমও নেই একদম।

বেরিয়ে এসে নাজিরকে গোলকোণ্ডার দুর্গের রাস্তায় নিয়ে যেতে বলেছে। তাড়াতাড়ি। খুব তাড়াতাড়ি। একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব ক'রেছে। সে যেন তার মনকে দেহ থেকে ছিনিয়ে-টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কি দুর্দান্ত গতি। কেবলি মনে হয়েছে কখন পৌঁছয়!...

মুখ নিচু ক'রে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসেছিল ভানুকিরণ। সিঁড়ি দিয়ে নামার পায়ের শব্দে সিধে হ'য়ে বসেছে। অনন্তদেবজীর হরিণ-চটির আওয়াজ। তাকিয়েছে নয়নশোভার দিকে। বসে আছে পাথর মূর্তি একখানা। কালো জর্জেটের শাড়ি-জামায়—এক কথায় অপরূপা। পায়ে কালো ভেলভেটের জরির কাজ করা চটি।

ভানুকিরণ শ্যামবর্ণ। হলে, কি হবে। ওরকম কেষ্টঠাকুরের মতো মুখশ্রী কটা লোকের হয়। দীর্ঘদেহী মিষ্টি চেহারার মানুষ। পরনে ঘি-রঙের কোট-প্যান্ট সাদাশার্ট বিস্কুটরঙের বাটারফ্লাই নেকটাই আর চকচকে খয়েরি সু। এ সাজ-সবই পছন্দ ক'রে করা নয়নশোভার। রঙে রঙ। মিলিয়ে কত সুন্দর ক'রে সাজানো যায় তার অন্তরতমকে এই ধ্যান-জ্ঞান নিয়েই তো দিনরাত ব্যস্ত থেকেছে নয়নশোভা।

আজ আটতিরিশ-উনচল্লিশেও যেমন আটাশ-উনতিরিশে দাঁড়িয়ে নয়নশোভা, তেমনি আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশের ভানুকিরণকেও আটতিরিশ-উনচল্লিশের সীমানায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। পেরোতে দেয়নি। দু'জনের ঘন কালোচুলের ফাঁক দিয়েও একগাছা রূপোলীসাদাও লুকিয়ে

রিয়ে উঁকিঝুঁকি মারেনি। নয়নশোভার থাক-থাক কোঁকড়ানো চুল াড়ের নিচে ছ'কাঁধ ছড়িয়ে থমকে রয়েছে। ভানুকিরণের উসকো-সকো ওল্টানো চুলে চিরুনি পড়ে নি বোধ হয়। কে লক্ষ্য রাখবে? চিরুনি এগিয়ে দেবে, নিজে আঁচড়ে দেবে—সেই তো ঘরছাড়া।

ছ'হাতে ছ'টো জলখাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকেছে অনন্তদেবজী। পছনে তুলতুল। ছ'হাতে জলের গেলাস। দেখেই, ছ'জনে—ভানু-করণ আর নয়নশোভা উঠে দাঁড়িয়েছে।

আহা-হা। বোসো, বোসো! নাও! লক্ষ্মীমেয়ের মতো লক্ষ্মী-ছেলের মতো খেয়ে নাও আগে। তারপর কথাবার্তা। ভুঁড়ি ঠাণ্ডা াকলে, মুড়িও ঠাণ্ডা থাকে। মুখচোখের কি অবস্থা সব! ছ'মাসের রুগী।

অনন্তদেবজী সংসারী নয়।

ব্রহ্মতান্ত্রিক।

কিন্তু সংসারী লোকেদের আদর-আপ্যায়নের সব সরঞ্জামই মজুত াড়িতে। কাজের লোকের অভাব নেই, তবুও নিজে হাতে নিজেরটা ক'রে নিয়ে খায়। লোকজন এলে, নিজে হাতে যত্ন ক'রে বসিয়ে-সিয়ে খাওয়ায়। এতে নাকি ওর তৃপ্তি ওর আনন্দ। বলে, এই তো আমার ঈশ্বরকে ভোগ দেয়া। তোমাদের সকলের মধ্যেই যে-শক্তি আছে, যে প্রাণ আছে—তার অবর্তমানে, সকলে মড়া। তাহলে জ্যান্ত জীবজন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরশক্তি খেলা করছে, স্বীকার করতেই হবে। শ্বর না মানলেও, একটা শক্তির খেলা—এটা মিথ্যে কি ক'রে আর লে কে।

প্লেটের দিকে তাকিয়েছে নয়নশোভা।

লুচি আলুছেঁচকি নারকোলনাড়ু। চোখে জল এসে গেছে। অনন্তদেবজীর ভেতর কি মা এসেছে। যা-যা ভালোবাসে নয়নশোভা সেই পদই সাজানো। অনন্তদেবজী একাধারে মা, একাধারে বাপ। স্নেহপ্রাণ বাপ। তার বাবা কুসুমসুবাসের মতো নির্দয়-নিষ্ঠুর প্রাণের য়।

চমকে উঠেছে নয়নশোভা অনন্তদেবজীর মমতা মাখানো স্বরের

ডাকে—নয়ন! তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও মা। সামান্য তো। রাত হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরতে হবে। মনে রেখো, কাল ছুটির দিন নয়—রবিবার নয়। বুধবার। অফিসে যেতে হবে ভানুকিরণকে।

এ লোকের হাত থেকে, এ লোকের চোখের দৃষ্টি থেকে কোন কিছুর রেহাই নেই। কারো মনের ব্যাপার এর অজানা নয়। একলহমায় চোখ ঘোরালেই অন্যের মনের ছবি নিজের মনে ফুটে ওঠে। এর মুখের ওপর চলে না কোন তর্কাতর্কি। এর আদেশ-নির্দেশ অমান্য করে এখানে এসে, এমন কারো শক্তি নেই, সাধ্যি নেই।

ভানুকিরণের খিদেও পেয়েছে। প্লেটের বস্তু শেষ হ'তে দেরী হয়নি। নয়নশোভা অর্ধেক খেয়ে, আর পারে নি। পারছে না।

অনন্তদেবজী নিজে থেকেই বারণ করেছে।—নয়ন! তোমার আর চেষ্টা কোরতে হবে না মা। চাপাচাপিতে শরীরের কষ্ট, শরীর নষ্ট—এটা আমি চাই না।

দু'জনকে কাছে ডেকে, দু'জনের দু'হাত এক করে ধরে রেখে বলেছে, বাড়ি ফিরে যাও। আজ আর মায়ের বাড়ি নয়। উপনয়নকে ফিরে যেতে বলে দিচ্ছি আমি। নাজির নিয়ে যাক তোমাদের দু'জনকে। অশান্তি অভিমান ক্ষোভ-দুঃখু—মন থেকে সরিয়ে রাখতে বলেছি, সরিয়ে ফেলতে বলেছি। কথাটা বুঝতে একটু অসুবিধে হয়েছে বোধ হয়। সরে গিয়েও কি সরতে পেরেছ? আরো জড়িয়ে পড়েছ এদের চিন্তায় মায়ের চিন্তায়। আরো অশান্তি বেড়েছে, বেড়েছে ক্ষোভদুঃখুও দ্বিগুণ। সব তোমায় জড়িয়ে থাকবে। তোমার সামনে থাকবে, অথচ তুমি একটা আলাদা তুমি হয়ে থাকবে। তোমার মনে কোন দাগ কাটবে না। কঠিন বটে। তবে অভ্যেস করতেই হবে, তবেই সংসার স্বর্গ। নাহ'লে স্বর্গে গিয়েও সেই নরকভোগ। অর্থাৎ ভালো জায়গায় গিয়েও তোমার মনের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবে নাকো তুমি। জানবে—সবের মূলে মন। মনকে ঠিক কর, ঠিক রাখতে চেষ্টা কর!

প্রণাম করেছে দু'জনে অনন্তদেবজীর চরণ স্পর্শ ক'রে।

অনন্তদেবজীর আশীর্বাদ নিয়ে গাড়িতে উঠে এসে বসেছে ওরা।

ভানুকিরণ-নয়নশোভা।

গাড়ি চলছে সেকেন্দ্রাবাদের পথে। চলছে চলছে চলছে। মন্থরগতি থেকে দ্রুত। দ্রুত—আরো দ্রুত···।

···বাড়ির দরজায় গাড়ি থামতে হিমাতুল দারোয়ান এসে সেলাম জানিয়েছে সায়েব-মেমসায়েবকে। দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে শোভান। শোভান ভানুকিরণের অতিপ্রিয়। ছেলেটাকে সায়েব বাপের মতো ভালোবাসে। সায়েব যখনি ফেরে যে কোন সময়, দূরে গাড়ি, তবুও ও কেমন ক'রে বুঝতে পারে, ওই জানে। ওপর থেকে নেমে এসে দরজার পাশে দাঁড়াবে। গাড়ি এসে থামা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেবে। সাহেবাও আসবে। সাহেবা শোভান—এরা কাজের লোক। কিন্তু এদের সাজগোজ আর আদবকায়দা দেখলে, মনেই হবে না। মনে হবে, বাড়ির ছেলে-মেয়ে। সেই আদরেই রাখে নয়নশোভা। শোভান তো নিশ্চয়ই প্রিয় কিন্তু নয়নশোভার কাছে সাহেবা আবার অতিরিক্ত। তার কারণও আছে একটা। ব্যথাবেদনার আঁচড়ে খোদাই করা ভেতরে। সহজে ওঠবার নয়, সহজে মোছবার নয়। যদি না সুদিন আসে ফিরে কোন সময়। গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে সাহেবা দাঁড়িয়েছে শোভান। ওদের মুখে-চোখে আনন্দ উপচে পড়ছে নয়নশোভাকে দেখে। আম্মা না থাকলে বাড়ি মানায়। একেবারে ফাঁকা। জমজমাট-ভাবটা কোথায় মিলিয়ে যায়। নিস্তব্ধ-নিঝঝুম নির্বান্ধবপুরী। প্রাণহীন বাড়িটায় প্রাণ ফিরে এসেছে এবার।

ওরা কেমন ছিল, কেমন আছে—খবর নিতে নিতে ভেতরে প্রবেশ করেছে নয়নশোভা। মার্বেলে মোড়া মেঝেয় লাল কার্পেটের ওপর সোনালী সোফা-কৌচ পাতা বসার ঘরে। ওপাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ না ক'রে, বসার ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রেছে। রূপলেখাকে খুঁজছে নয়নশোভা। চনমনে চাউনি চতুর্দিকে। ওপর দিকে তাকিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিয়েছে সাহেবা।—লেখা বহিন ওপরে। ওপরে ব্যালকনি বারান্দা। ঘাড় উঁচু ক'রে তাকিয়েও ওখানে কাউকে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখা গেল না।

আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছে নয়নশোভা। ভেবেছিল, মেয়ে হয়তো দৌড়ে আসবে সবার আগে। পাঁচ-ছদিনে কিসে এত পর হ'য়ে গেল রূপলেখার কাছে! ভানুকিরণ ছাড়া আর আপনার বলতে কেউ নেই তার এ বাড়িতে। শুধু এ বাড়িতে কেন—ত্রিভুবনে নেই আর কেউ!

কালো পাথরের সিড়ির ধাপে পা ফেলে-ফেলে রেলিং ধরে আস্তে-আস্তে ওপরে উঠছে নয়নশোভা। শেষ ধাপে এসে দাঁড়াল একটু। কোন সাড়াশব্দ নেই কারো। কেমন-কেমন লাগছে। নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাত-পা এলিয়ে তারই খাটে তারই বিছানায় শুয়ে রূপলেখা। একদৃষ্টে দেখেছে খানিক। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কোন সাড় নেই। পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখছে। চোখের জলে পাতার কাজল নেমেছে দু'গাল বেয়ে। কালো জলের দাগ শুকোয় নি এখনো। এখনো ভিজে ভিজে। নীল টিউবের মিঠে আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। পাশেই নয়নশোভার সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো টেবিলে রাখার রঙিন ফোটাটা শোয়ানো।

নয়নশোভার হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ভেতরে যত জমা কান্না আছে, সমস্ত উজাড় ক'রে দিতে ইচ্ছে করছে রূপলেখাকে জড়িয়ে ধ'রে।

নয়নশোভার কত আপনার রূপলেখা। আর রূপলেখায়? রূপলেখার অতি আপন নয়নশোভা। নয়নশোভা নিজেকে ঠিক ধরে রাখতে পারছে না আর। আবেগের বশে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেছে রূপলেখার ওপর। সামনের আয়নার চোখ পড়তে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সংযত হয়ে পড়েছে। ঘুম ভেঙে যাবে। থাক।

সাহেবার মুখে শুনেছে সব নয়নশোভা রূপলেখার ব্যাপার। লেখা-বহিন কদিন ধরে খাওয়াদাওয়া করছে না ঠিকমতো। ঘুমও হচ্ছে না ভালোরকম। গান-নাচ একদম বন্ধ। বন্ধুবান্ধব আসা বন্ধ। নয়নশোভার ঘরে দিনরাত পড়ে রয়েছে। খালি কান্না আর কান্না। মুখে কেবল—

আম্মা আমার জন্যেই চলে গেছে। আমার জন্যে। আর আসবে না, আর আসবে না। এ বাড়িতে আমি আর থাকবো না। চলে যাবো, চলে যাবো। পাপার সঙ্গেও কোন কথাবার্তা নয়। পাপাও তো মনমরা সদাসর্বদা। লেখাবহিন কলেজ-মুখোও হ'চ্ছে না একদম।

পাশে—রূপলেখার ঘরে গিয়ে ওর বিছানায় আছড়ে পড়েছে নয়নশোভা। হাপুসনয়নে কেঁদে সারা। সোনার চাঁদ স্বামী সোনার পুতলী মেয়ে—এদের কি সর্বনাশ করতে বসেছিল নয়নশোভা ভুল বুঝে —মিথ্যে অভিমানে।

রূপলেখাকে আর বাধা দিয়ে কষ্ট দেবে না নয়নশোভা। ও যেটা ভালো বোঝে, যাকে ভালো লাগে, বেছে নিয়ে বিয়ে করুক। মায়ের ধর্ম মায়ের কর্তব্য—ও যেন সুখী হয় ও যেন শান্তি পায়।

এটা মাথায় রেখে, ধর্ম-কর্তব্যের রীতিনীতি পালন করতে গিয়েই না যত অনাসৃষ্টি-অনর্থ হ'য়ে গেছে আগে। আর ধর্ম-কর্তব্যের মধ্যে নাক না গলানোই ভালো। ওঃ। সে কি তুলকালামকাণ্ড!

কলেজবন্ধুদের নিয়ে খালি হৈ-হৈ-রৈ-রৈ। লেখাপড়া চুলোয় গেল। কেবল নাচগান আড্ডা আর হৈ-হল্লা। কার আর ভালো লাগে! তিতিবিরক্ত নয়নশোভা। কোন মা চায় চোখের সামনে তার মেয়ে উচ্ছন্নে যাক!

ভালোভাবেই বুঝিয়ে বলতে গিয়েই কেলেঙ্কারির একশেষ।

মায়ের মাথায় যত সব কুচিন্তার বাসা! বাইরে বেরোবে না। কারো বাড়ি যাবে না। কারো সঙ্গে কোথাও নয় একদম। বেশ! সব মানা হ'ল। তবু রেহাই নেই। কথা মতো কাজ হ'ল। বাড়িতেই আসবে সকলে। গানবাজনা বাড়িতেই হবে। এতেও আপত্তি-অশান্তি মায়ের। মা যে কি চায়, বুঝতে পারে না রূপলেখা। রূপলেখা কোন রাস্তা ধরবে তাহ'লে? অসহ্য অসহ্য। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে অন্ধমানুষের মতো অন্ধ হ'য়ে বসে থাকবে চুপচাপ?

দিনকতক এটা করেও তো দেখেছে রূপলেখা। মা খুশি হ'য়েছে কোথায়। উল্টে রূপলেখার একটা বাড়তি বদনাম দিয়ে সে-কি হইচই।

মা নাকি দেখেছে রূপলেখার কোন ছেলে বন্ধু পাখী পাঠিয়ে রূপলেখার বারান্দার দরজায় ধাক্কা দেয়ায়। অদ্ভুত কথা! কার না রাগ হয় এসব শুনলে। মড়া মানুষও ক্ষেপে ওঠে। পাপা কেবলই মায়ের পক্ষে। বলছে, বলতে দে না। তোর গায়ে কি ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে! তুই আমাদের একটা মাত্র মেয়ে। তোর মায়ের ওই জন্যে অত টান। তোর কিসে ভালো হয়, সেই চেষ্টা।

সেই চেষ্টা! সত্যিই কি কোন ছেলে পাখীকে শিখিয়ে-পড়িয়ে পাঠিয়ে দেয় বলতে চাও? মা ভুল বললেও সত্যি মেনে নিতে হবে?

নয়নশোভা এসে দাঁড়িয়েছে বাপ-মেয়ের কথা কাটাকাটির মাঝ-খানে। নিজে যে ভুল নয়, প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছে।

পাখী পা দিয়ে থেমে থেমে মানুষের মতো টোকা দেয় কি ক'রে? পেছনে মানুষের মাথার শিক্ষা না থাকলে? আর তাছাড়া নয়নশোভার চোখ তো ভুল করে নি মন ভুল করলেও। স্বচক্ষে দেখেছে আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরের জানলা খুলে। ছেলেটা বনবন ক'রে সাইকেল চালিয়ে পালাচ্ছে। পেছন দেখে মনে হয়েছে, সেই পাজিটা! খোশামুদে রামপেসাদে।

আলসের ওপর তাল। কাক উড়ে যাওয়ার সঙ্গে পড়ে গেল। কাক নাকি ফেলে দিলে। এ তো সেই কাকতালীয় ব্যাপার। পাখীর সঙ্গে কে সাইকেলে গেল। মায়ের ধারণা সুখন নাকি। আটটার আগে ও উঠতেই পারে না বিছানা ছেড়ে। ও ভোর ছটায় পাখী নিয়ে এখানে এসে উড়িয়ে দেয় দরজা ঠেলার জন্যে। সেদিন রূপলেখার এক বন্ধু পাপার সামনেই তো বলেছে। মা-ও সেখানে ছিল না যে, তা নয়। স্বকর্ণেই শুনেছে। ওরকম পাখী এখানে বহু। ওরা মানুষ ঘেঁষা। যে ঘরে মানুষ দেখে, শার্শী দিয়ে দেখতে পেলে, সেই ঘরে দরজায় ধাক্কা দেয়। সে একতলাই হ'ক দোতলাই হ'ক—মাঝের ঘর হ'ক, ধারের ঘর হ'ক। এ বাড়িতে সব ঘরেই ধাক্কা দিচ্ছে। সব ঘরেই কি রূপলেখা থাকছে, থাকে নাকি? বিশ্বাস আর হয় না কিছুতেই।

সুখন এ বাড়ি থেকে বিদেয়, রূপলেখার মন থেকেও বিদেয়।

তবুও মায়ের সুখস্বস্তি নেই। এক গেল, আর একজনকে নিয়ে পড়ল। রূপলেখার গানের সঙ্গে নিগম নাচে বেহায়ার মতো। ওরকম বেহায়াপনা একেবারে ভালো লাগে না নয়নশোভার। যাক, সে-ও গেল। এবার নাথুনার পালা। নাথুনার গানের গলা একদম ভালো নয়। একে খুব মোটা, তায় বেসুরো। রূপলেখার সঙ্গে গাইলে, রূপলেখারও গলার দফারফা হয়ে যাবে। ও অচল টাকা। সে-ও বাতিল। এবারে যে এসেছে তার ভাগ্যে কি আছে কে জানে। মা ছুতো খুঁজতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ছুতো পেয়েও যাচ্ছে। ওর আচার-ব্যবহার খুব ধোপদুরস্ত নয়। এ সমাজে ঠিক খাপ খাওয়ার মতো নয়। নামের সঙ্গে ছেলেটার চরিত্রে হুবহু মিল। অভিরাম ভ্যাবারাম।

একজনকেই পছন্দ কেবল। দিব্যমনকে। সে এখন নাগালের বাইরে। রূপেগুণে সর্বেসর্বা। আমেরিকায় চলে গেছে। নয়নশোভার আপসোসের অন্ত নেই। লেখাকেও ওর পছন্দ খুব। বিয়ে করতে চেয়েছে। নয়নশোভা রাজী হয় নি। রাম! মেয়ে আরো পড়ুক। তাছাড়া ছেলের ভবিষ্যত ছেলে তৈরী ক'রে আসুক আগে। লোকের কাছে জামাইয়ের পরিচয় দেবার মতো হয়ে উঠুক, তবে না বিয়ে! এর মধ্যে —লোকে হাসবে যে। নয়নশোভাকে পাগল বলবে যে!

এখন অস্বস্তির একশেষ নয়নশোভার। দিব্যমনের মতো আর একটাও যদি নজরে পড়ে। পড়ছে না মোটে। কি ব্যক্তিত্ব। যে কদিন ছিল দেশের মাটিতে, এসেছে। ওকে দেখে রূপলেখা ভয়ে জড়সড়। নিয়ম ক'রে রেওয়াজ করছে। গান গাইছে। লেখাপড়ার কি মন। সমস্ত কথাই ওর শুনেছে। ওই ছিল রূপলেখার উপযুক্ত পাত্র। কবে আসবে—দিন গুনে গুনে সার হ'চ্ছে নয়নশোভা। আর হায় হয়ে ক'রে কপাল চাপড়াচ্ছে। এ খেয়ালী মেয়ের রাশ ধরে টেনে রাখবে কে। চিন্তায়-চিন্তায় পাগল। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও যে পাগল হ'তে বসেছে।

ভানুকিরণ বোঝায় মাকে। অত বাছবিচারে অনেক সময়ে ফল ভালো হয় না। শেষে যা চাওয়া হয়নি, তাই-ই নিতে হয় ভুল ক'রে।

ভালো ভেবে। তার চেয়ে মেয়ে নিজে পছন্দ ক'রে নিলে, মা-বাপের দোষ দিতে পারবে নাকো ভবিষ্যতে। নয়নশোভা যে ভানুকিরণকে বেছে নিয়েছিল, ভুল হয়েছে কি?

না, ভুল হয় নি।

বরং ঠিকের চেয়ে আরো ঠিক—মহাঠিক।

'কিন্তু' বলে একটা কথা তবুও থেকে যাচ্ছে। আচমকা কোন কিছু ঘটে যাওয়া—সে ভালোই হ'ক আর মন্দই হ'ক, বিশেষ একটা ঘটনা বই তো নয়। সকলের ভাগ্যে কি ঘটে। ভানুকিরণকে নিয়ে একান্তে বসে বসে—রূপলেখার অগোচরে কত না আলোচনা হ'য়ে গেছে। ও-সমস্ত এখন পুরনো—তামাদি।

নয়নশোভা এখন মনেপ্রাণে চায় রূপলেখা যাকেই বিয়ে করুক, সুখী হ'ক। শান্তি পাক, আনন্দ পাক।

সত্যিকথা বলতে কি, ভানুকিরণের মতো আপনভোলা—ভোলা-মহেশ্বর স্বামী পেয়ে নয়নশোভা সুখ-শান্তি-আনন্দে ভরপুর। জন্মে-জন্মে যেন এই স্বামীর স্ত্রী হ'য়ে ঘুরে ফিরে আসে বারে বারে এই ভুবন-ভোলানো-মায়ার সাজের এই ভুবনে।

দুজনের প্রথম দর্শনই 'শুভদৃষ্টি'র সূচনা করেছিল দু'জনেরই ভবিষ্যৎ জীবনের। নয়নশোভা আর ভানুকিরণের।

গুজরাটি সমাজ।

দেয়ালে-দেয়ালে সাধুসন্ত আর গুণীজ্ঞানীর বড় বড় তেলরঙা ছবি টাঙানো। ছবির মানুষরা যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে শিল্পীর নিষ্ঠায়—অন্তরের অনুভূতির তুলির টানে! বড় হলঘর বেশ ছিমছাম। সাজানো-গোছানো। একবেগদা উঁচু কাঠের বিরাট প্রায় ঘরজোড়া পাটাতনের ওপর সতরঞ্চি-চাদর বিছানো। এপাশ থেকে ওপাশ অবধি সার সার সাদা ওয়াড়ে ঢাকা তাকিয়া। ঠেসান দিয়ে বসে আছে বরপক্ষ কনেপক্ষ। শুধু বরপক্ষ-কনেপক্ষ নয়, বর-কনেও বসে।

নয়নশোভার বান্ধবী সুরসেবার 'চুন্দরী'—আশীর্বাদ। এই সূত্রে

সুরসেবার, ওর মা-বাবার বিশেষ অনুরোধে আসা। নয়নশোভাকে গাইতে হবে সভায়। ভানুকিরণও এসেছে তার বন্ধুর আশীর্বাদে। ও-ও গাইবে শোনা গেল।

সুন্দর পরিবেশ। ধুপের সুবাস ছড়ানো ঘরময়। একটি মেয়ে সাধক নরসিংহ মেহতার ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে একমনে তাঁরই রচনা-গান গেয়ে চলেছে। যে-গান মহাত্মা গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার প্রধান অঙ্গ ছিল। নরসিংহজীই হরিজনদের বুকে টেনে নিয়েছিলেন। ছোট-বড়—জাতবেজাত—কোন ভেদাভেদই ছিল না তাঁর কাছে। পরের দুঃখে কাতর হতে, পরের উপকার ক'রে মনে মনে অভিমান না আনতেই বিশেষ করে বলে গেছেন এই মহৎ-হৃদয়ের গুজরাটী সাধক কবি।

যারা সমাজের হলে প্রবেশ করছে—অতিথি কুটুম-স্বজন, সকলেই ছবির সামনে হাতজোড় ক'রে, মাথা নত ক'রে শ্রদ্ধা-প্রণাম জানিয়ে যে যার আসনে গিয়ে বসছে।

বরপক্ষ-কনেপক্ষের—দু'তরফেরই গয়না-আংটি সিল্কের শাড়ী সোনার বোতাম দেয়াদিয়ির পালা শেষ হয়েছে। তখনো মেয়েটি গাইছে।—

> "বৈষ্ণবজন তো তেনে কহিয়ে
> পীড় পরাই জানে রে।
> পরদুঃখে উপকার করে তোয়ে জে
> মন অভিমান না করে রে।

গান শেষ হ'তেই, বরপক্ষের-কনেপক্ষের গানের আসর বসবার তোড়জোড় চলার সময় কর্তাব্যক্তিদের অনুরোধ করেছে নয়নশোভা, তাকে যে গান গাওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। সে গাইতে পারবে না। কারণ কি? কারণ—এ ঘরটা দেবতার মন্দির। মানুষের মিলনের গান প্রেম-ভালোবাসার গান এখানে মানায় না। মেয়েটি যে প্রার্থনা-ভজন গেয়েছে, তারপরে তো মোটেই নয়।

ভানুকিরণ এগিয়ে এসে বলেছে, আমার মনেও একই প্রশ্ন। অসম্ভব। এই দু'জনে চোখাচোখি আর ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি-মৃদু হাসি। পাশের ঘরে গানের আসর বসিয়েছে কর্মকর্তারা। ধন্যবাদ জানিয়েছে

নয়নশোভাকে জনায়-জনায়। এতদিন এটা কারো মাথায় ঢোকে নি। অনুচিত-অন্যায় হ'য়ে এসেছে এতদিন ধরে।

তবলচী-সারেঙ্গী পাশাপাশি। মধ্যিখানে হারমোনিয়াম। গজলের আসর। কে আগে শুরু করবে, এই নিয়েই কিছু সময় কেটে গেল। ভানুকিরণ বলছে নয়নশোভাকে প্রথম গাইতে। নয়নশোভা বলছে, বরপক্ষেরা কন্যাপক্ষের মাননীয়। তাই তাঁদের তরফেই আগে সাড়া পাওয়া যাবার আশা করতেই পারি আমরা। কথায় অনুনয়-বিনয়ের সুর ঝঙ্কার বেজে উঠেছে ভানুকিরণের কানে। এড়াতে পারেনি ভানুকিরণ আর এরপর। হারমোনিয়ামটা কোলের কাছে টেনে নিয়েছে।

ভানুকিরণের কণ্ঠে গম্ভীর-মধুর স্বর হাওয়ায় তরঙ্গে তরঙ্গে নামা ওঠা করছে। সহজ-স্বচ্ছন্দ গতিতে। গানে মুগ্ধ ঘরসুদ্ধ সকলে। সকলের একমন এককান হয়ে গেছে বুঝি। নয়নশোভা তো দু'চোখ বুজে তন্ময়।

ভানুকিরণের গানের বাণী প্রাণে দোলন আনছে শ্রোতাদের। শ্রোতাদের সবাই-ই তরুণ-তরুণী। থেকে থেকে ওরা তারিফ করছে। বাহবা নিচ্ছে। গানের বাণী ঘরময় ঘুরছে। ঘুরছে এক কান থেকে অন্য কানে। কানে কানে।

আনেওয়ালাকো আনে দো।
আদাবকীজীয়ে।
মুশাফিরকো গরীবখানে
সওগত কীজীয়ে।
আঁখো মে নজর বনাকর,
দিল মে তশবির বনাকর,
আপনি খুশি সে উনকো
খুজ কীজীয়ে।

গান শেষ। হাততালি চললো খানিকক্ষণ। আর কিছুতেই দ্বিতীয় গান গাইতে রাজী হয় নি ভানুকিরণ। নয়নাশোভার গানের পর, তখন

দেখা যাবে'খন।

নয়নশোভার নিজের হারমোনিয়াম এনেছে বাড়ি থেকে। হারমোনিয়ামের কাছে বসে, জোড়হাতে সমাগতদের নমস্কার জানিয়ে বলেছে, যিনি গেয়ে গেলেন এতক্ষণ, তাঁর ভেতরের আনন্দ উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছেন আপনাদের সকলকে খুশি করবার জন্যে গানের কাজে গানের মাধুর্যে। এরপর আর গান জমে না কারো। তবু আপনাদের আদেশ শিরোধার্য কোরে আমি গাইছি। আমি খুব নগণ্য। মাপ কোরবেন। এ যেন চাঁদের কাছে জোনাকীর আলো।

ভানুকিরণের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল নয়নশোভা।

হারমোনিয়াম তবলা সারঙ্গী একসুরে বাজছে।

হাঁটুমুড়ে বসে তান ধরেছে নয়নশোভা। হারমোনিয়াম তবলা সারেঙ্গী গলা—একসুরে মাতিয়ে তুলেছে ঘরখানাকে। তুলছে মধুর থেকে আরো মধুর ক'রে পাপিয়াকণ্ঠী নয়নশোভার কণ্ঠে।

মোহব্বত কো নফরৎ না কীজীয়ে (জনাব)।
আঁখো সে নজর না পড়ে তো
দিল সে দেখিয়ে (জনাব)।
মেহবুব মত জায়ো,
মুঝে না সতায়ো,
আপকি খুশিয়াঁকে বাহারোঁ সে শবনম
ম্যায় হুঁ ইয়াদ কীজীয়ে (জনাব)।

গান থামবার পরও কারো হুঁশ নেই। চোখ বুজে একইভাবে চুপচাপ বসে সকলে। গানের রেশ মনের ঘোর কেটেছে ওদের, নয়নশোভার বিদেয় নেবার পালায়। নয়নশোভা বলেছে, আপলোগ আজ্ঞা দিজীয়ে। ম্যায় পরশান করকে জা রহুঁ হ্যায়। মাফ কীজীয়ে। নমস্কার নমস্কার নমস্কার।

কাছে এসে ভানুকিরণ নয়নশোভার দু'হাত ধরে বলেছে, সুকরিয়া সুকরিয়া সুকরিয়া। অনেক—অনেক ধন্যবাদ। এ গান অন্তরের গান। এ গান চিরজীবনের সকলের গান। এ গান ভুলতে পারবে না কেউ

কখনো। কখনো না।

সব শেষে কাকুতি ক'রে বলেছে ভানুকিরণ, আবার কবে দেখা হবে ?

পাশ থেকে মাসিমা বলেছে, সময় পেলে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসো না। আমার বোন জীবনতারাও খুব ভালো গায়। তার কাছেই নয়নের শেখা। তারই লেখা গান গাইল ও। তুমি তো খুবই ভালো গাও। জীবনতারার ভালো লাগবে। ও বড্ড গানপাগল। ওই নিয়েই রয়েছে দিনরাত। কত ছেলেমেয়েরা শেখে ওর কাছে।

ঠিকানা দিয়েছে মাসিমা ভানুকিরণকে।

নয়নশোভার জীবনের অনেক ছবি একের পর এক ভিড় ক'রে আসছে কেবল। ছবি এত জলজ্যান্ত। যেন এই মুহূর্তে ঘটছে সত্যি-সত্যি, পুরোনো দিনের সত্যি ঘটনা আবার নতুন ক'রে। নয়নশোভা কি জেগে না ঘুমিয়ে। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে কি ? তা কেন হবে। কেমন একটা আবেশ। রাতভোর না ঘুমিয়ে না জেগে। এমন একটা অবস্থা তার। চোখ বুজেই পড়ে রয়েছে নয়নশোভা। উঠতে ইচ্ছে করছে না। নড়তে ইচ্ছে করছে না। চোখ চাইতেও না। নিজেকে ভুলে যাওয়ার আমেজ একটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে নয়নশোভাকে। অনন্তদেবজী বলেছে, শরীর-মনের উর্ধ্বে তুমি। তোমার নেই দুঃখু নেই শোক নেই রোগ নেই রাগ নেই মৃত্যু ভয়। তুমি অমৃত তুমি আনন্দ তুমি অসীম।

নয়নশোভাকে আরো বলেছে অনন্তদেবজী। তুমি আকাশ। কত গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশের কিছু এসে যায় না। আকাশ নির্লিপ্ত নির্বিকার। কিন্তু আকাশে মায়ের মুখ ফুটে উঠছে যে! অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে নয়নশোভার—মা! মা গো!

মা! মা গো! বলেই, আছড়ে পড়েছে রূপলেখা নয়নশোভার ওপর। কাঁদছে। মা, তুমি কি নিষ্ঠুর কি নির্দয়! একটুও মন কেমন করে নি আমাদের জন্যে। কি ক'রে ছিলে এতদিন। এত রাগ আমার

ওপর ! এসেও ডাকো নি। সাহেবা বহিন খবর দিতেই আমি তো না এসে পারি নি। তুমি আমাদের ভালোবাস না, ভালোবাস না।

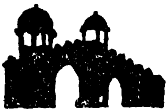
নয়নশোভা নির্বাক। খালি দু'চোখের জলে ভাসছে আর রূপলেখার পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলোচ্ছে। ভালোবাসে কি না বাসে, কেমন ক'রে বোঝাবে নয়নশোভা তার এ পাগলী মেয়েকে।

নয়নশোভা মনে মনে বলছে, লেখা! তোর মঙ্গল হ'ক। তুই সুখী হ'। এ বলা ছাড়া এ কামনা করা ছাড়া আর কি করতে পারে নয়নশোভা। অনন্তদেবজী বলেছে, ঠাকুর বিশ্বাস কর আর না কর, তাতে কিন্তু কিছু এসে যায় না। এসে যায় মনের জোর কমে গেলে। মনের জোর রাখবে সদাসর্বদা কোনরকমে ভেঙে পড়বে না কোন কিছুতেই। নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখবে। তোমার একান্ত মনের আন্তরিক শুভকামনায় নিশ্চয় শুভ হবে। হবেই হবে।

অনন্তদেবজীর বাক্য সফল হ'ক! রূপলেখা আনন্দ পাক!

ঘরে প্রবেশ করেছে ভানুকিরণ।

মা-মেয়ের মিলনদৃশ্যে ওরও চোখের জলের বাঁধ ভেঙেছে। মেয়েকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসেছে নয়নশোভা। বলেছে লেখা তোর পাপাকে আর মাকে একটা গান শোনা দিকিনি। বড় শুনতে ইচ্ছে করছে।



বাড়িতে আনন্দের জোয়ার বইছে ক'দিন ধরেই।

নয়নশোভা ফিরে আসার পর থেকেই।

নয়নশোভা অর্গ্যান বাজিয়ে গান গায়। মায়ের কাছে শেখা গান। মা আবার তার কলকাতার পিসির কাছ থেকে বেড়াতে গিয়ে শিখে এসেছিল। কাজী সায়েবের—কাজী নজরুল ইসলামের লেখা। নয়ন-শোভা গায়।

'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর,
নমো নম নমো নম নমো নম।'

রূপলেখা নীচে গানের ছন্দে তালে তালে। প্রাণমাতানো নাচ। যেন নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ ক'রে চলেছে দেবতার চরণে হৃদয়ের আকুতি ভক্তি উজাড় ক'রে দিয়ে দেবলোকের কোন এক দেবপ্রাণা। মর্ত্যের মানবী বলে তখন ওকে ভাবতেও মুগ্ধ-দর্শকের দ্বিধা-সংশয় না এসে পারে না। নিজের মনের মতো ক'রে নিখুঁত নৃত্যশিল্পী গড়ে তুলেছে মেয়েকে নয়নশোভা।

রূপলেখা যখন নাচে আপনভাবে বিভোর হ'য়ে, তখন নয়নশোভাও যেন নেচে চলে সঙ্গে সঙ্গে। এক সময় সেও কত সন্ধেয় কতবার না নেচেছে তার মায়ের গানেও। রূপলেখার মতোই।

আজ বাড়িতে রোজের বিশেষ খুশির আমেজ সবার চোখে মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

নয়নশোভা-ভানুকিরণের 'বিবাহবার্ষিকী'।

এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা রূপলেখা। বন্ধুবান্ধব জ্ঞাতিস্বজন জানাশোনা —কাউকে আর নেমন্তন্নের নামের কোটা থেকে বাদ দেয় নি। সবদিকে লক্ষ্য রূপলেখার। তীক্ষ্ণদৃষ্টি। সন্ধে থেকে মহোৎসব শুরু, তাই সকাল থেকেই তার তোড়জোড় চলছে।

নয়নশোভা সকালবেলা সদর দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। বাহারি নক্সাদার দরজার মাথায় কাঠে খোদাই চতুর্ভুজা লক্ষ্মী। দু'পাশ থেকে দুটি হাতি গেঁদার মতো চেবন্তীফুলের হলুদ মালা শুড়ে ধরে আস্তে আস্তে —অতিসন্তর্পণে এগিয়ে আসছে দেবীর গলায় পরিয়ে দেবে বলে। জোড়হাত ক'রে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাচ্ছে প্রতিদিনের মতো। প্রতিদিন এই প্রণাম জানাতে আসে নয়নশোভা মেয়ের কলেজ যাবার সময়, স্বামীর অফিসের গাড়িতে ওঠার মুখে। এদের মঙ্গল কামনায়। আজও সেই মঙ্গল কামনা করছে নয়নশোভা। স্বামী অফিস না গেলেও, মেয়ে কলেজে ছুটি নিলেও।

বাপ-মেয়ে—ভানুকিরণ আর রূপলেখা সারা বাড়ি খুঁজে তোলপাড়

রে এসে হাজির হয়েছে এখানে।

নয়নশোভাকে ওই অবস্থায় দেখে, হেসে বলেছে, জ্যান্ত লক্ষ্মী কাঠের লক্ষ্মীর কাছে আবার কী চাইছে এত!

জিভ কেটে, নাক-কান মলে, কপালে-বুকে ডানহাতের আঙুল ছুঁইয়ে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করেছে ভেতরে।—ছিঃ! ওকথা বলতে নেই।

ভেতরে সোফা-কোচে বসে তিনজনে।

নয়নশোভা রূপলেখার দিকে তাকিয়ে বলেছে, লেখা! আমাকে তুই লোকের কাছে হাসির খোরাক না ক'রে আর ছাড়বি না দেখছি! কোথায় তোর বিয়েতে আমরা আনন্দ করবো, তা নয়—আমাদের 'বিবাহবার্ষিকী'। লজ্জায় মরে যাচ্ছি। দুষ্টু মেয়ে বারণ শুনলো না গো কিছুতেই।

নিজের সোফা থেকে উঠে গিয়ে নয়নশোভার পায়ের কাছে থপাস ক'রে বসে পড়েছে রূপলেখা। মায়ের কোলে মাথা রেখে মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—আম্মা! তোমায় কত সুন্দর দেখাচ্ছে।

কি যে বলিস! এ বয়েসে সুন্দর দেখাচ্ছে। অবাক করলি!

কেন—নীরজের দিদিও তো বলেছিলো তোমাকে প্রথম দেখে, আমার দিদি মনে হয়েছে। 'মা' শুনে, গাছ থেকে পড়েছে একেবারে।

সামনের আয়নার দিকে নিজেকে একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়েছে নয়নশোভা। মেয়েটার যে শেষ পরিণতি কি, সেই ভেবেই সারা দিনে রাতে। বুকের ভেতর কি যে যন্ত্রণা, বোঝাবে কাকে, বলবে কাকে, ওর সাধ-আহ্লাদে বাধা দিতে চায় নি কোনদিন নয়নশোভা। চায়-ও না। যেটুকু আটকানো যেটুকু বকাবকি—সবই তো ওর ভালো ভেবে। মনের কথা মনেই চেপে রাখতে হচ্ছে। পাথর ভারী বুক। রূপলেখাকে জীবন গেলেও বলতে পারবে না সে! চোখের কোণে জলের কণা চিকচিক ক'রে উঠেছে নয়নশোভার। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পাছে মেয়ে বা মেয়ের বাপ দেখে ফেলে।

আম্মা! তোমার মুখখানা গম্ভীর হ'য়ে গেল কেন হঠাৎ?

নিরুত্তর নয়নশোভা। কি উত্তর দেবে! গলাটা ধরে এসেছে।

বুদ্ধিমতী মেয়ে ধরে ফেলবে এখুনি। প্রশ্নে-প্রশ্নে জের বার করে ফেলবে তাকে। মহাফ্যাসাদে পড়বে এখুনি। সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছে নয়নশোভা।

আম্মা! আঃ, ছাড় লেখা! ঘড়ির আওয়াজ বড্ড কম শোনাচ্ছে। বাজনাটা ঝিমিয়ে পড়ছে। এমন মিষ্টি সুরে গৎ বাজে সময়ের ঘণ্টা বাজার আগে—আমার ভেতরটাও আনন্দে নেচে ওঠে। ঝিমিয়ে পড়লে, আমিও কেমন নিস্তেজ হ'য়ে আসতে থাকি। আমারও দমটা কেমন আটকে আসে যেন।

সিঁড়ির ধাপে পা রেখে, বলেছে নয়নশোভা রূপলেখাকে, এখুনি শোভান ব্যাটারি এনে পাল্টে দিক।

ওপরে এসে, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। মায়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, চোখমুখ মুছে, হাসতে-হাসতে তরতর ক'রে নেমে এসেছে ওপর থেকে।

অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছে চুপচাপ বাপ-মেয়ে। এই বিষাদ এই আনন্দ! আশ্চর্য। চেনা দায়, বোঝা দায়।

তোমাদের আবার কি হ'ল? মুখে হাসি নেই কথা নেই! শোন কিরণ! স্যাকরা ঠিক আসবে তো সন্ধেয়? আজকে সাহেবাকে কিন্তু খুশি করতেই হবে।

ভানুকিরণ বলেছে, সন্ধে কেন—এখুনি হয়তো এসে পড়বে, সেই রকম কথা হ'য়ে আছে।

আম্মা! আমায় কি দিচ্ছো শুনি? বেশ তো এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছো দেখছি। ওসব হবে না, লেখা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়।

ওমা সে কি কথা রে! তুই তো আমাদের দিবিথুবি। তোকে আবার দেবো কি? তুই তো পেয়েছিস সব। আর আজ আমরা তোরই মেয়ে-ছেলে। তুই আমাদের আম্মা। আমরাই-ই তোর যে রে। বাড়ি-ঘর—যা কিছু, সমস্তই তোর। কার নিয়ে কাকে দেব মা আমার!

বাঃ রে! ওসব ফাঁকি দেয়ার যুক্তি। দেখো যদি কোন কিছু না পাই, সন্ধেবেলা তুমি একলা-একলা গেয়ো তাহলে, আমি আর নাচছি না। দেখো না, লোকে কিরকম ছিঁড়ে খায়। আমার নাচের জন্যেই আসছে সব।

হো-হো ক'রে হেসে উঠেছে নয়নশোভা।—পাগলী কোথাকার! কি চাই, তুই-ই বল না!

মুক্তোর মালা আর বালা।

আর?

হ্যাঁ, আংটি আর ঝুমকো।

আর?

আর—মনে পড়ছে না এখন। পরে দেখা যাবে'খন।

হালকা বাতাসে ভরে যাবেই গোটা ঘরখানা। পেতলের টবে বসানো ঘরের কোণে পাতাবাহারি গাছের পাতা নড়ছে। ফুলদানীর রজনী-গোলাপ বেশী ক'রে সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঘর থেকে দালানে, দালান থেকে বাইরের শ্বেতপাথরে মোড়া চাতালের বারান্দায়। লাল-মাটির দু'ধার ঘেঁষে ফুলের কেয়ারি ধরে লোহার গেট অবধি। দিনের দারোয়ান সমশেরের কাছ অবধি। সমশেরের ঠোঁটের কোণে ফুলের হাসি।

নয়নশোভাকে বিয়ের কনে সাজতে হবে।

ভানুকিরণকে বিয়ের বর।

বিশ বাইশ বছর আগে যে সাজে সেজেছে ওরা, ঠিক সেই সাজে।

তখন কিভাবে সাজিয়েছিল মাসিমা, নয়নশোভার অত স্মরণ নেই। স্মরণ নেই তো নেই। মাসিমা এখনো বেঁচে। বেশ শক্ত সমর্থ। মাসিমাকে আনিয়েছে রূপলেখা। জেদী মেয়ে, জিদ যা ধরবে, ক'রে তবে ছাড়বে। বিয়ের সাজ মঙ্গলস্মৃতি হিসেবে মানুষ যত্ন ক'রে তুলে রাখে। রাখা আছে। নষ্ট হয় নি। নয়নশোভা বেশ যত্ন করেই রাখে। যত্ন নিয়ে দেখাশোনাও করে। বলে, যত্নে দূরের মানুষকে কাছে টানা যায়, আবার অনাদরে কাছের মানুষও দূরে সরে যায়। সমস্ত বড়

জিনিসের মধ্যে যত্ন জানা আর যত্ন করাটাও পড়ে। জিনিসপত্তর যত্নে না রাখলে দু'দিনে নষ্ট। নইলে বছরের পর বছর গেলেও চিরনতুন চিরবসন্ত।

মাসিমা সাজিয়েছে নয়নশোভাকে। সাহায্য করেছে রূপলেখা সঙ্গে সঙ্গে থেকে। লাল সোনালী জরির ফুল বসানো বেনারসী শাড়ী-জামা। পাতলা গোলাপী ওড়না। হাতে-গলায়-কানে পাথর বসানো গয়নার সাজে সাজানো। হীরে পান্না-চুনী-মুক্তো পাথরে। যেন নয়নশোভার সারা শরীরে আকাশের রঙবেরঙের তারাফুল ফুটে উঠেছে তরতাজা। চাঁপারঙের মানুষের অঙ্গে অঙ্গে আলোয় আলোয় ছয়লাপ।

নয়নশোভাকে দেখে চোখ ফেরানো অসম্ভব। যে দেখছে, সে দেখছে তো দেখছেই। নাকের নথ আর টানায় একেবারে পটের লক্ষ্মীঠাকরুন। দেখে দেখে সাধ মিটছে না কারো। কনে চন্দন পরিয়ে দিয়েছে মাসিমা। লবঙ্গ দিয়ে চন্দনে ডুবিয়ে ডুবিয়ে। একেবারে বিয়ের কনে। কার সাধ্যি বয়স বোঝে! যেন আঠারো-উনিশে ফিরে গেছে নয়নশোভা। হয়তো ও আগের জীবনেই ঘোরাফেরা করছে এই মুহূর্তে। মনেপ্রাণে কনে নববধূ। তেমনি হাসি তেমনি সলজ্জভাব।

নিজের মুক্তোর গয়না পরতে চায় নি আর। এ সেটটা বিয়ের সাজে ছিল না তখন। পরে হয়েছে। অনেক পরে। এটা পরে আজ নাচবে রূপলেখা।

আপত্তি করে নি রূপলেখা।

মা তার সমস্ত ইচ্ছেই যখন পূর্ণ করেছে নির্বিবাদে, তখন তারও মায়ের অনুমতি মেনে নেওয়া উচিত। রূপলেখা তামাশা করেই বলেছে, সকালে মুক্তোর গয়নায় সেজে নাচবে। সত্যি সত্যি চায় নি ওটা। সে-জানে মায়ের ও সেটটা বড় প্রিয়। তাই রাগাতে গিয়ে রগড় করতে গিয়ে ফ্যাসাদ হয়েছে তার। এখন যা পরিস্থিতি রূপলেখার, আর ফেরার পথ সেই কোন। মা নিজে হাতে মনোমতো করে সাজাচ্ছে, হাত সরিয়ে দেয়া যায় না আর কোন প্রকারে। মোটেই না।

মা-মেয়ের সাজ শেষ।

মাসিমাই ভানুকিরণকে গরদের জরিপাড় ধুতি আর হীরের বোতাম লাগানো গরদের পাঞ্জাবি পরিয়ে দিয়েছে। পায়ে ঘি রঙের ভেলভেটের নাগরা। কপাল থেকে ছু'পাশের গাল অবধি নেমে এসেছে চন্দন মাখানো লবঙ্গের ছাপ। ওরও বয়েস কমে আটাশ-উনতিরিশে নেমে এসেছে। ছু'জনকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। কেউ বলছে রামসীতা, কেউ বলছে রাধাকৃষ্ণ।

ভেতরের বড় হলে আসর বসেছে।

একতলা থেকে সোজা দোতলা অবধি উঁচু। দোতলায় ছাত। ছাতের নিচে থেকে বেলোয়ারী কাঁচের ঝাড় ঝুলছে। চকচকে আলো ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। কত রকমের। লাল নীল হলুদ সবুজ বেগুনী কমলা। এক কথায় রামধনু রঙ। ঝাড়ের ত্রিকোণা কাঁচের ঝোলা ঝালর থেকে। ভোরের সূর্য আর রাতের পূর্ণিমার চাঁদ বুঝি উদয় হয়েছে ঘরের আকাশে। অপূর্ব দৃশ্য! হলের চারদিকে ফুলে ফুল। দেয়ালে বসার জায়গায় মানুষের হাতে হাতে—সর্বত্র।

মাসিমা ভানুকিরণের হাত ধরে নিয়ে এসে, লাল ভেলভেটে মোড়া, সিংহাসনের মতো ফুলে সাজানো সোফায় বসিয়ে দিয়েছে। নয়নশোভাকে রূপলেখা। এ যেন রাজারানীর দরবারে আগমন। সিংহাসনে উপবেশন। সমবেত দর্শকদের দর্শন।

সকলে হাততালি দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। এক এক ক'রে মেয়ে-পুরুষ এগিয়ে গিয়ে, ছু'জনের হাতে ছু'টি ক'রে উপহার দিয়েছে। উপহারের মধ্যে সবরকমেরই জিনিস। সোনাদানা থেকে শাড়ী-স্যুট বইপত্তর। পাশে বসে রূপলেখার বান্ধবী বন্ধু নীরজের বোন নির্বানি খাতায় নাম আর পাগে উপহারের ফিরিস্তি লিখে যাচ্ছে।

একটি উপহারে খুশিতে ভরে উঠেছে নয়নশোভার মন সব চাইতে বেশী। সমস্ত উপহারকে ছাপিয়ে গেছে সে-উপহার। নীরজের হাতে লেখা একটি কার্ড। ছু'টি ছত্রের কবিতা একটি। সহজ-সরল ভাষায় অন্তরের শুভেচ্ছা-প্রার্থনা। এইটাই তো আসল। এর চেয়ে আর কি আছে ছুনিয়ায়। কি থাকতে পারে। লেখার বাণীতে অন্তরের বাণী

ফুটে উঠেছে। মন আছে প্রাণ আছে ভাব আছে। মনের আবেগ চেপে রাখতে পারে নি আর নয়নশোভা। স্নেহচুম্বন এঁকে দিয়েছে নীরজের উজ্জ্বল কপালে।

ভানুকিরণ আর নয়নশোভাকে প্রণাম করেছে পায়ে হাত দিয়ে নীরজ। দু'জনেই মাথায় হাত রেখেছে। স্নেহের আশীর্বাদ।

নয়নশোভার খুশি দেখে রূপলেখার আনন্দ আর ধরে না। নীরজের দিকে চেয়ে গর্বের হাসি হেসেছে। আজকের আসরে তুমিই জয়ী একমাত্র। মায়ের সুনজর পড়েছে। এটা কম কথা নয়। কম বড় পুরস্কার নয়।

কার্ডটা জোরে জোরে পাঠ করতে বলেছে রূপলেখাকে নয়নশোভা। রূপলেখা পড়েছে, তারও পড়ার আগ্রহ ছিল। জানার কৌতূহল, কি এমন লেখা আছে। উপস্থিত সকলের মনেই চাপা জিজ্ঞাসা এত উচ্ছ্বাস এত উল্লাসের কারণটা কি ?

কানপেতে শুনছে সকলে। লজ্জারাঙা মুখে মাথানত ক'রে এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে নীরব।

রূপলেখার উঁচুনিচু গলার আওয়াজ অনেক গম্ভীর অনেক জোরালো শোনাচ্ছে। গমগম করছে গোটা হল ঘরটা। মুক্ত বিহঙ্গের মতো বাণী দেয়ালে ধাক্কা মেরে সমস্ত ঘর ঘুরে চতুর্দিকে লাল-নীল-হলুদ কাঁচের শার্সীতেও ঠোক্কর মেরে মেরে ওপর দিকে দোতলার ছাদের তলায় আঘাত হেনে তরতরিয়ে নেমে আসছে আবার সবার কানের দরজায়। ঘর ভালো লাগছে। সকলের ঠোঁটে মিষ্টি হাসির ছোঁয়া।—

"স্নেহময় পিতা-স্নেহময়ী মাতার উদ্দেশে পুত্রের শুভেচ্ছা-প্রার্থনা।"

এই দিন ফিরে আসুক আবার-আবার।

ফিরে আসুক জীবনে শত-শত বার।

স্নেহধন্য সন্তান

নীরজ।"

রূপলেখা পাঠ শেষে বসে পড়েছে। তখনো বলে চলেছে অনেক খাদে-চড়ায়।—বাঃ বাঃ, বেশ বেশ। দীর্ঘজীবন লাভ করুক ভানু-

কিরণজী, দীর্ঘজীবন লাভ করুক নয়নশোভাজী।

এবার গানের পালা।

নয়নশোভা-ভানুকিরণ গান শোনাবে। বেশীর ভাগ লোকেরই অনুরোধ বাংলা গানের জন্যে। কিন্তু রূপলেখার আব্দার বিপরীত। গুজরাটি সমাজে পাপা-আম্মার প্রথম পরিচয়ের গান গাইতে হবে প্রথমে। উর্দু গজলের পর বাংলা গান। তারপর আম্মার নজরুলের গানের সঙ্গে রূপলেখার নাচ। আর তারপর মিষ্টান্ন বিতরণ। এরপর অভিনন্দন আর অনুষ্ঠানের সমাপন।

রূপলেখার অনুষ্ঠানসূচি মেনে নিয়েছে সকলে।

কোণের অর্গ্যানের কাছে উঠে এসেছে নয়নশোভা, উঠে এসেছে ভানুকিরণ।

মেয়ের অনুরোধের গানই গাইছে ভানুকিরণ।

'আনেওয়ালা কো আনে দো
আদাব কীজীয়ে···।'

যে আসছে, তাকে আদরআপ্যায়নে নিয়ে এসো! হৃদয়ের ছবি নয়নের মণি ক'রে তোমার ভেতরের আনন্দের জোয়ারে তাকে ভাসিয়ে রাখো।

এরপর বাংলাও গেয়েছে ভানুকিরণ। রবীন্দ্রনাথের।

"ধরা দিয়েছি গো, আমি আকাশের পাখী···।'

এবার অর্গ্যানের রীডে আঙুলের স্পর্শ নয়নশোভার। রূপলেখার দিকে তাকিয়ে হেসেছে একটু। তোর ইচ্ছেই পূর্ণ হ'ক আজ।

'মোহব্বত কো নফরৎ না কীজীয়ে···'

তোমার খুশির সাগরে একবিন্দু শিশিরকণা আমি। তুমি একটু অন্তত মনে রেখো গো। আমার নিখাদ ভালোবাসাকে অবহেলার চোখে যেন দেখো না তুমি।

ভানুকিরণের মতো নয়নশোভাকেও গাইতে হয়েছে রবি ঠাকুরের গান।

'আপনাকে এই জানা
আমার ফুরাবে না,

সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে

তোমায় চেনা '

এবারে নজরুলের 'মোর ঘুম ঘোরে' নয়নশোভার দরদী কণ্ঠে। ছন্দে ছন্দে ভাবে-আবেগে নেচে সকলের স্নেহ কুড়িয়ে নিয়েছে রূপলেখা। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

নীরজকে কাছে ডেকে, চিবুক ধ'রে আদর ক'রে বলেছে নয়নশোভা, আবার আসবে বাবা! মাকে মনে রেখো ভুলোনা যেন।

মাথা নিচু ক'রে মৃদুস্বরে বলেছে নীরজ, অনুমতি করলে রোজও আসতে পারি একবার ক'রে। আমার কোন অসুবিধে হবে না মা।

সাহেবা আর সাহেবার নিরুদ্দেশ স্বামী এতক্ষণ দূরে দূরেই ছিল। সকলের খাওয়াদাওয়ার তদারকিতে ব্যতিব্যস্ত ছিল। সুযোগ পায় নি।

কাছে এসে সায়েব মেমসায়েবকে প্রণাম জানিয়ে দু'জনের হাতে দু'টো বড় বড় লাড্ডু দিয়ে বলেছে, আম্মা! আপনাদের খেয়ে-পরে মানুষ। কি আর দেয়ার আছে আমাদের। এটা ওয়াদগিরি পাহাড়ের নরসিংহ অবতারের প্রসাদ—আশীর্বাদ।

ওরাদগিরিতে একবার গেছল নয়নশোভা। রূপলেখা ভানুকিরণও সঙ্গে ছিল। পাহাড় কেটে কেটে ঘোরানো রাস্তা নিচে থেকে ঘুরে ঘুরে বাড়ি উঠেছে শেষ সীমানায় যেখানে, আকাশ ছোঁয়া পাথরের বিশাল মন্দির। রুপোর পাতে মোড়া দশ অবতারের মূর্তি খোদাই বিরাট দরজা। সিঁড়ি বেয়ে একতলা সমান নিচে—গুহার ভেতর মূর্তি নরসিংহদেবের। রুপোর সোনার পাথরের। পাশে লক্ষ্মীদেবী।

অনন্তদেবের মুখে শুনেছে নয়নশোভা, শক্তি কোথায় নেই? পাহাড়-নদী-সমুদ্র জীবজন্তু গাছপালা—সবের মধ্যে একটি শক্তির খেলা অদৃশ্য-ভাবে। এ শক্তি বিহনে শক্তিহীন মানুষও মৃত। পুরাণের প্রহ্লাদও এ জ্ঞান দিয়েছিল তার পিতৃদেবকে—পাহাড়ে, পাথরের খামেও তিনি। তিনি তিনি।

সাহেবা আর তার স্বামী নরিন্দ্রমের বিশ্বাসে আঘাত হানতে চায়নি কোন নয়নশোভা। বিশ্বাসের জোরে মানুষের ইচ্ছে শক্তি বেড়ে অসাধ্য

সাধনও হয় অনেক। হয়েছে অনেক। একথাও অনন্তদেবজীর। ঠিকপথে যাবার যদি কারো প্রবল ইচ্ছে থাকে, এক লক্ষ্য থাকে, সে ভুল করেও ভুল পথে গেলে, নিজের অগোচরেই ঠিক পথে পৌঁছে যায় সময়ে।

সাহেবার স্বামী বারো বছর ধরে নিরুদ্দেশ ছিল। কোন খোঁজখবর মেলে নি। সাহেবা বিশ্বাস হারায় নি। স্বামী আসবেই একদিন না একদিন।

এসেছে দিনকতক আগে।

নয়নশোভার হাতের বালা জোড়া খুব পছন্দ সাহেবার। বার বার দেখতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আর বলতো, ভারী সুন্দর আপনার বালা দুটো আম্মা। নয়নশোভা বলেছে, তোর স্বামী ফিরে এলে, তোরও এইরকম বালা উঠবে দেখবি।

বালা তৈরী হ'য়ে এসেছে। তারই বালার হুবহু গড়ন-নক্সা নিজের হাতেরটাই দেবে ভেবেছিল প্রথমে। ভানুকিরণ আপত্তি করেছে ওটা তোমার মা দিয়েছেন। স্মৃতি থাকুক। স্যাকরা গড়ে দেবে'খন।

ভানুকিরণ পাঞ্জাবির পকেট থেকে নীল কাগজে মোড়া বালা জোড়া বার ক'রে নয়নশোভার হাতে তুলে দিয়েছে।

সাহেবার দু'হাতে যত্ন ক'রে, আস্তে আস্তে পরিয়ে দিয়েছে নয়নশোভা। নয়নশোভার আজ খুব পরিতৃপ্তি। একদৃষ্টে তাকিয়ে ভানুকিরণের দিকে।

কি এত দেখছো?

দেখছি তোমাকে। দেখছি নিজেকে।

দু'টি পুরুষের দুই মূর্তি। প্রকৃতিতেও অনেক ফারাক। আসমান-জমিন। বাবা আর স্বামী। বাবার কি আসুরিক প্রবৃত্তি, কি হৃদয়হীন সর্বগ্রাসী লোভ। কুসুমসুবাসের একটা মাত্র মেয়ে নয়নশোভা। কতই বা বয়েস তখন, ন-দশ। কি উগ্রমূর্তি বাবার। কান্নায় মেঝেয় পড়ে আছাড়-পিছাড়ি করছে। নেই দয়া নেই মমতা। মা বলেছে, ওগো! বাচ্চাটার হাতের নিয়ো না। আমার যা আছে, তোমাকে দিচ্ছি। এত

নিষ্ঠুর হয়ো না।

আজো মনে পড়লে বুকে কাঁপন মরে নয়নশোভার। কি হা-হা ক'রে বিকৃত গলায় নৈশাচিক হাসি। গলা টিপে কান্না বন্ধ করতে গেছে বাবা, মা প্রাণপণ শক্তিতে টেনে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরেছে। উত্তেজনায় কাঁপছে।

একপাও এগোবে না আর! মেয়ের গায়ে হাত দেবে না একদম। আমি খুলে দিচ্ছি তোমায়। আমি—আমি।

নিজের হাতের দিকে তাকালো নয়নশোভা। মা করে দিয়েছে পরে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে নয়নশোভা। মা সুখী হয়নি বাবাকে নিয়ে কোনদিন কোনসময়। নিজের গান শেখানো উপায়ের পয়সায় এই বালা। এ বালা খুলতে দেয় না হাত থেকে কখনো ভানুকিরণ। কাউকে দিতেও দেয় না। দিতে দেয় নি সাহেবাকে। গড়িয়ে নিয়ে এসেছে তারই ইচ্ছে পূর্ণ করার জন্যে। তার কথা দেয়ার মর্যাদা রাখবার জন্যে। মূল্য রাখবার জন্যে। ভানুকিরণ দেবতুল্য স্বামী তার।

হাঁপাচ্ছে নয়নশোভা। দম আটকে আসছে বুঝি। নিশ্বাস নিতে ফেলতে কি নিদারুণ কষ্ট—অসহ্য। গলা শুকিয়ে কাঠ। একটু জল। মনে মনেই বলছে। স্বর বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে।

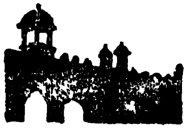
আচমকা নয়নশোভার এ অবস্থা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে ভানুকিরণ। হকচকিয়ে গেছে রূপলেখা।

সায়েবা বোধহয় বুঝতে পেরেছে আম্মার গলা শুকিয়ে গেছে। কথা বেরোচ্ছে না। দৌড়ে গিয়ে ফিডিং কাপে ক'রে জল নিয়ে এসেছে। ভানুকিরণ নিজের বুকের কাছে আলতোভাবে মাথা চেপে ধরেছে, পড়ে না যায়। একহাতে ফিডিং কাপের জল ঢালছে মুখে একটু একটু ক'রে।

গলা ভিজেছে নয়নশোভার। ঠোঁট নড়ছে। কথা কয়বার চেষ্টা করছে। খুব ফিসফিস ক'রে বলছে, ওপরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও! ক্লান্ত বড্ড! নয়নশোভার বুকখালি করা নিশ্বাস পড়েছে জোরে। ঘুম আসছে। ঘুম ঘুম···

ভানুকিরণের বুকেই মাথা রেখে, শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভানুকিরণ তার যে মস্ত অবলম্বন। নিরাপদ, নির্ভয় আশ্রয়। যন্ত্রণার মহৌষধ। সকল ব্যাপারের অভয় ও সাহস ও। নয়নশোভার আনন্দ ও শান্তি ও। ভানুকিরণকে ঘিরেই যে নয়নশোভার জগৎ। নয়ন-শোভার জীবন।



প্রতিদিনই সন্ধের আসর খুব জমজমাট।

নীরজ হেসে-খেলে নেচে-গেয়ে গল্প বলে মাতিয়ে রাখে সকলকে। ও একাই একশো। নয়নশোভার খুব ভালো লাগে। প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছেলেটা। প্রায় দিব্যমনেরই কাছাকাছি। কিন্তু কেন জানে না নয়নশোভা, দিব্যমনকে কিছুতেই সরাতে পারছে না। ভুলতে পারছে না।

দিব্যমন আমেরিকা যাবার পর যে-সব বন্ধুরা রূপলেখার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে এসেছে, সে আর কহতব্য নয়। যেমন চেহারা তেমনি গুণাগুণ। অপগণ্ড-অপদার্থের দল। ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ। কোনটা আসল নয় গা। সেকি সেকি। সব কটাই হ'তে হয়। হায় অদৃষ্ট পোড়াকপাল, আসছে ক'রে খালি গোয়াল। যাক, বাঁচা গেছে। যায় না। যেতে চায় না। মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা যাকে বলে। বিদেয় করতে কি নাকানি-চুবানি না খেতে হয়েছে। বাড়িতে যেন আগ্নেয়গিরির আগুন জ্বলেছে দিনেরাতে। জ্বলেছে বুকে মাথায় নয়নশোভার। আর সেই সঙ্গে বাড়ির সকলের। রূপলেখার কি হাল না হয়েছিল। মেয়েকে দেখে, কি গোমরানো কষ্ট ভেতরে ভেতরে ভানুকিরণের।

এখন রূপলেখা কত হাসিখুশি। ভানুকিরণের ভেতর-বার ঠাণ্ডা। আর নয়নশোভার? নয়নশোভার কথা আর বলতে? সীমা-পরিসীমাহীন পরিতৃপ্তি।

নীরজ যেন পূর্বজন্মের কেউ না কেউ ছিল বোধ হয়। তা নাহলে

এত অল্পদিনে এই মাস হু'তিনের মধ্যে—এত আপনার হয়ে ওঠে। যেন কত যুগের কত বছরের ও এবাড়ির। ও-ও একদিন না এসে থাকতে পারে না যেমন; এ বাড়িও পারে না। বেশী ক'রে নয়নশোভা তো চারিদিক শূন্য দেখে।

নীরজ এসে অবধি একটা না একটা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবেই। ছোটবেলায় মা হারিয়েছে। বেচারা! মায়ের স্নেহ আর তেমন পেল কোথা। কাকির কাছে মানুষ। ছেলেটা বড্ড স্নেহের কাঙাল। কি মায়াবী চোখ। শান্ত-সুন্দর মুখে রাগ-অভিমানের লেশমাত্র নেই। 'মা মা' ব'লে ডাকটা ওর বড় মধুর মিষ্টি। প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মন ঘুমিয়ে পড়ে। নয়নশোভার ছেলের সাধ বড্ড ছিল, ভগবান থাকুক না থাকুক, তার ইচ্ছের জোরেই বা যদি হয়—হয়েছে। তার মানস পুত্র নীরজ। নীরজ বেঁচে থাকুক, দীর্ঘজীবী হ'ক।

চিন্তা ক'রে কোন কূলকিনারা খুঁজে পায় না নয়নশোভা। এটা কেন হয়। আশ্চর্য। যখুনি বেশি ক'রে নীরজকে নিয়ে ভাবে, তখুনি দিব্যমন এসে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেন কেন কেন?

সব চেয়ে আরো একটা বিষয়ে খুব অদ্ভুত লাগে নয়নশোভার কাছে। নীরজের চিন্তায় যেমন দিব্যমন হাজির হয়, তেমনি দিব্যমনের চিন্তায় একটু বেশিক্ষণ থাকলে, এসে পড়ে নীরজ। দিব্যমন আসে চিন্তার আয়নায়। এ একেবারে সশরীরে। তার মনের ব্যাপারটা কি বাড়িতে বসে বসেও ও বুঝতে পারে, দেখতে পায়! ওর সঙ্গে আর দিব্যমনের সঙ্গে কি কোন অদৃশ্য-সুতোর বন্ধনে বাঁধা হয়ে আছে ওদের অগোচরে! মনে মনে!

হয়তো যথার্থ কিছু নেই এসবের মধ্যে। স্রেফ নয়নশোভার বৃথাই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো। তারই মনের উদ্ভট-উদ্ভট প্রশ্নের জবাব নিজেরই তৈরী করা, মনগড়া। মানুষমনে রহস্যের খনি অসংখ্য-অগুনতি। কে তার হদিশ রাখে! খুঁজতে-খুঁজতে হয়রান হ'য়ে গেলেও, একটার শেষ হ'তে না হ'তে আর একটা এসে উপস্থিত। এই নিয়ম বুঝি। একটা একটা, আবার একটা আবার একটা। মন ক্লান্ত হয়ে নীরেট

অন্ধকারের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। মরণ ঘুম।

ভাবনার রাজ্যে ছেদ পড়ে নয়নশোভার।

এসেছে নীরজ।

জমা মেঘ সরে গেছে উজ্জ্বল হাসিতে। হাসতে হাসতেই চলেছে নীরজ।—মা-মনি, কি এত চিন্তা করছিলেন? আজ জ্যুলজিক্যাল পার্কে যেতে হবে ভুলে গেছেন! তৈরী হন নি!

আকাশের দিকে চেয়ে বারান্দার চেয়ারে বসেছিল এতক্ষণ নয়নশোভা। উঠে পড়েছে। হাসিমুখে বলেছে, এই যে বাবা! এখুনি এলুম ব'লে। লেখা কোথায়?

ও তৈরী। গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে।

…গাড়ি চলছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পথ ধরে ধরে। কাছে-দূরে বাড়ির ছবি। সুন্দর দোতলা বাড়ি। দেখে দেখে চোখের তৃপ্তি মনের তৃপ্তি। পাহাড়ি রাস্তায় আয়না-চকচকে সমান-পিচের চাদর। উঁচু নিচু একটু। কিন্তু খানা-খন্দ আর এবড়ো-খেবড়োর বালাই নেই। রাস্তার ধারে গাছ মানুষ পাথরের স্ট্যাচু সাইকেল রিক্সা টেম্পো স্কুটার মোটর।

বিরাট তোরণের তলা দিয়ে প্রবেশ ক'রেছে গাড়ি। চলেছে ব্রীজের ওপর দিয়ে। ডানপাশে হুসেনসাগর। কি বিশাল। চোখ ফেরানো যায় না। কত পুরনোদিনের, এখনো জলে টাইটুম্বুর। ছোট ছোট ঢেউ খেলে যাচ্ছে মৃদু বাতাসে—মানুষের তৈরী সাগরের বুকে। গাড়ি সামনের দিকে এগোচ্ছে।…

নেহেরু জ্যুলজিক্যাল পার্ক।

প্রবেশ করেছে ভেতরে গাড়ি। টিকিট কাটার পর্ব সারা। নয়নশোভা কাটতে যাচ্ছিল, নীরজ বাধা দিয়েছে। বেড়াচ্ছে তিনজনে জন্তু-জানোয়ার দেখতে দেখতে। ভানুকিরণ আসতে পারে নি। অফিস আছে।

মাঝে রাস্তা। দু'পাশে দ্বীপ-জঙ্গল। দ্বীপের চারদিকে খালকাটা,

বেশ নিচে। এধারে মানুষ ওধারে জীবজন্তু। বানর ভাল্লুক আরো কত কি। লায়ন সাফারিতে এসে গেছে ওরা পায়ে পায়ে। বাঘ জঙ্গলের আড়ালে। কোন কোন দ্বীপে বেড়াচ্ছে ঘুরে ফিরে। বহাল তবিয়তে। মানুষ ওদের দেখছে। মানুষের কাছে যে ওরা দর্শনীয় বস্তু—এটা ওদের কোন খেয়াল নেই। মানুষ দেখছে ওদের, সেদিকেও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

কেবল একটা সিংহী বসে আছে শিকার ধরার ভঙ্গীতে। রাস্তায় তেল চকচকে সাদা নাদুস-নুদুস দু'টো গোরু কিসব জিনিস পত্তরের গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সিংহীর ওই দিকেই চোখ ঘুরছে কেবল। উপায় নেই লাফিয়ে পড়ার। দৌড়ের গতি বাড়ানোর জায়গা নেই। সমস্ত মাপজোপে বাঁধাধরা।

নীরজ জিদ্ ধরেছে ভেতরের জঙ্গলে বসে বসে দেখতে হবে সিংহ-বাঘকে! তার বড় মজা লাগে। শ্বেতবাঘের খাঁচার আগের গেটে দাঁড়িয়ে বাবাইয়া। বাঘ-সিংহের তত্ত্বাবধানের বিশ্বাসী লোক। ওই-ই ওদের প্রতিদিন খাবার দেয় খেতে। মাংস।

বাবাইয়া এগিয়ে এসেছে।

বলেছে, খাঁচার বাসে গিয়ে কি দেখবেন আপনারা? আপনারা খাঁচায় ওরা আপনাদের দেখবে। এই তো নয়!

বাবাইয়া খাঁচার বাসে চড়তে দেয় নি কাউকে। খালের ধারে তিন-জনকে নিয়ে এসে হাততালি দিয়ে 'ডাডা ডাডা—আয়ো-আয়ো' বলে ডেকেছে। জঙ্গল নড়ে উঠেছে। ঘন সবুজের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একজোড়া হলুদ রঙা কালো ডোরার বাঘ। বেশ বড়সড়। ওপর থেকে গড়ানো পথে নেমেছে খালের জলের কাছ অবধি। তারপর বাবাইয়ার দিকে ওপরে মুখ তুলে হুম হুম গর্জন করেছে পোষা বেড়াল কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে।

নয়নশোভা এদৃশ্যটা নতুন দেখল।

ছোটবেলায় বাবা-মার সঙ্গে এসেছে। বছর আটেকের হবে বোধ হয়। এই বাঘ দেখার কৌতূহলে, একটা মর্মান্তিক ঘটনার মুখোমুখি

পড়েও, দৈবের আকর্ষণে হয়তো সে যাত্রা বেঁচে ফিরেছে তারা। তখনো তিনজন এখনো তিনজন, গুনতির দিক দিয়ে কি মিল। তবে তখন মা-বাবা আর সে। এখন সে, তার মেয়ে আর নীরজ। মা-মেয়ে নামটাও ঠিক রয়ে গেছে। তফাৎ কেবল তখনকার মেয়ে, এখনকার মা!

বাবাইয়ার জায়গায় অন্য লোক ছিল বাঘ-সিংহ দেখাশোনা করবার। প্রায় এইরকমই সাজসজ্জা। লুঙ্গী-পাঞ্জাবি। শ্যামবর্ণ। হাসিখুশি। কথাবার্তায় মিষ্টিঢালা ভদ্রতা-মাখানো। পঞ্চমুখ কেন, দশমুখেও প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। শেষ হয়ে-হয়েও যেন শেষ হতে চায় না। বাকির পর বাকি থেকে যেতেই থাকে। এক কথা ঘুরে ফিরে আসছে, তবু মনে হয় আগে বলা হয় নি। নতুন নতুন। এমনি মানুষটার আচার-ব্যবহার—ভোলা যায় না।

তিরিশ একতিরিশ বছর আগের ঘটনা কি আবার ঘটতে যাচ্ছে না-কি! সেইরকমই কথা শুনছে বুঝি নিজের কানে। বাবাইয়া বলছে, আম্মা আপ হামারে সাথ আইয়ে, আইয়ে বহিনজী।

নীরজ সঙ্গে থাকবার জন্যে পেড়াপীড়ি করছে।

সায়েব। পরে। এদের নিয়ে এসে, তারপর।

অগত্যা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে নীরজকে।

মা-মেয়ে ভেতরে যাচ্ছে। যেন একটা গুহার ভেতর দিয়ে দিয়ে। বাইরের কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। বাইরের কারো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না ওরাও।

এক একটা স্টিলের দরজা খুলছে বাবাইয়া। ওদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিচ্ছে ভেতর থেকে তক্ষুনি। পর পর তিনটে দরজা পেরিয়ে এবারে একেবারে বিরাট বাঘের সামনে মা-মেয়ে। বাবাইয়াকে দেখে উঠে এসেছে কাছে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে। বাচ্চাটা শুয়ে পেছনে। বাবাইয়া মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। কেমন হ'য়ে গেছে নয়নশোভা। ও-ও হাত বাড়িয়েছে। স্পর্শ করেছে মাথা। ফিরে এসে জিজ্ঞেস করেছে বাবাইয়াকে, এরা কামড়ায় না?

বড় বড় চোখ করে দু'ভুরু কপালে তুলে বিস্ময় মেশানো স্বরে বলেছে বাবাইয়া। —ওরা ভয়ানক ? তিনটে বন্ধ দরজার মধ্যে দিয়ে নিয়ে এলুম। বুঝতে পারলেন না।

তোমায় কিছু বোললো না তো।

ওদের আমি ভালোবাসি যে। ওরাও আমায় ভালোবাসে।

তোমার জন্যে কি আমায়ও—

তা কেন হবে। আপনাকে ওরা চিনেছে। ওরা চিনতে পারে।

ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল মায়ের বেলায় নয়নশোভার মতো। ঘটনায়-ঘটনায় এত মিল!

বেরিয়ে আসতে ঢুকতে গেছে নীরজ।

বারণ করেছে বাবাইয়া। —মানা আছে। আমার সায়েব এসে পড়বে। দেখলে তার সর্বনাশ!

এদের বেলায় ?

এদের সায়েব নিজেই ছেড়ে দিত।

নীরজের জেদাজেদিতে আর নয়নশোভার অনুরোধে কথা ঠেলতে পারে নি বাবাইয়া। বিশেষ ক'রে নয়নশোভার মুখের দিকে তাকিয়ে।

নয়নশোভাকে সঙ্গে নিয়েছে বাবাইয়া।

দু'টো দরজা খোলার পর কি গর্জন বাঘের। শেষ দরজাটা ভেঙে ফেলে আর কি!

তাড়াতাড়ি সরিয়ে এনেছে নীরজকে বাবাইয়া।

সায়েব। এত বন্ধ। তবু কোন ফাঁকফোকর দিয়ে কি গন্ধ পায়— ওরাই জানে। আপনাকে সহ্য করতে পারছে না।

তবু নাছোড়বান্দা নীরজ।

আমার গন্ধে কি তোমাদের গন্ধে তার প্রমাণ কি ?

বাবাইয়া দরজার সামনে—কখনো দরজায় গা ঘেঁষে নয়নশোভাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দেখিয়েছে নীরজকে। বাঘ নিস্তব্ধ। ভেতরে আছে বলেই মনে হয় না। নয়নশোভাকে সরিয়ে এনে, নীরজকে দরজার কাছ বরাবর নিয়ে যেতেই আবার ভীষণ হুঙ্কার বাঘের। ভেতর থেকে

দরজায় কি ধাক্কা। এবারে আরো জোরে। এখুনি ভেঙে ফেলে বুঝি।

আর নয় সায়েব। আর নয়। বিপদে পড়ব সকলে। তাড়াতাড়ি বার করে নিয়ে এসেছে নীরজকেই প্রথমে বাবাইয়া।

উঃ, কি ভয়ঙ্কর! নীরজের মুখের দিকে তাকাতেই বুকের মধ্যে ছাঁৎ ক'রে উঠেছে নয়নশোভার। নীরজের এ মুখের সঙ্গে পরিচয় হয় নি আগে। নরম চোখে এত হিংস্র চাউনি হ'তে পারে! পারলে ও একদিকে বাবাইয়াকে আর একদিকে হিংস্র জন্তুটাকে কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খায়। ফর্সা মুখে লালরক্ত ফেটে বেরিয়ে আসছে। চোখ দু'টো আগুনের ভাঁটা। রাগে ফুলছে দেহ। দ্বিগুণ হ'য়ে উঠছে। নিশ্বাসে গরম বাতাসের ঝড় বইছে। কি তাপ! কাছ থেকে সরে গেছে নয়নশোভা একটু তফাতে।

এখানে না এলেই যে ভালো ছিল। নীরজের এ মূর্তি দেখাটা মোটেই মঙ্গল নয়। অন্তত নয়শোভার পক্ষে। সব আশাভরসা ধূলিস্মাৎ হ'য়ে যেতে বসেছে। বালির বাঁধে ঘর বেঁধেছিল নয়নশোভা ভুল ক'রে তাহলে। নীরজকে তার আদর্শ-সন্তান ভেবে। মনেপ্রাণে সুখী হ'তে আসে নি নয়নশোভা পৃথিবীতে। একটার পর একটা আঘাত আর তার অশেষ যন্ত্রণাভোগ। এমনি পোড়াভাগ্য।

দুর্ভাগ্য পেছু পেছু ঘুরছে নয়নশোভার!

ছাড়তে চাইলে ছাড়ছে কই। খালি ভোল পাল্টে, বেশবাস পাল্টে এসে এসে হাজির হ'চ্ছে সামনে। জীবনভোরই চলবে বোধ হয় এইভাবে। নয়নশোভা যা চায়, তা পাবে না। মনস্কামনা পূর্ণ হবে না কখনো।

বাবার সঙ্গে নীরজের বিশেষ কোন পার্থক্য আছে বলে, মনে হ'চ্ছে না।

নীরজের উপস্থিতি অনুভব ক'রে বাঘ ক্ষেপে গেছে। ওরাও বোঝে ভালো-মন্দ মনের মানুষকে। বাবার বেলায়ও প্রায় এই রকমের ঘটনা। এ দরজার বাইরে। সে লোহার রেলিংঘেরা ঘরের বাইরে।

রেলিংয়ের ধারে মা-নয়নশোভা দাঁড়িয়ে দেখছে। বাঘ কাছ দিয়ে এসে দেখে গেছে ঘুরে। কত ভালো কত নির্বিকার। হিংসের 'হ'-টাও ফুটে ওঠে নি বাঘের খয়েরি চোখে।

বাবা রেলিংয়ের ধারে দেখতে আসতেই কি রক্তহিম করা গর্জন! রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে চোখের পলকে। একটু-খানির জন্যে মারাত্মক আঘাত থেকে রক্ষে পেয়ে গেছে বাবা। বরাত জোর। ঠিক সেই মুহূর্তেই বাবা একটু পেছু হটে গেছল। কেন—নিজেও জানে না বাবা।

সেদিনও পাহারাদার বলেছিল, ওরা মানুষ চেনে। নিজের বাবা বলে, সত্যি গোপন ক'রে কোন লাভ নেই।

বাবা কিন্তু মোটেই সুবিধের ছিল না। ভালোমানুষদের দলের একেবারেই নয়। অসহ্য নির্যাতন হয়েছে মায়ের ওপর। অমানুষিক অত্যাচার।

পশুরা ঠিকই চেনে। ওদেরও কি অন্তর্দৃষ্টি আছে নাকি মানুষের ভেতর দেখার! কে জানে কি রহস্য!

মুখের হাসি মিলিয়েছে নয়নশোভার।

এখনো বুকের ধড়ফড়ানি কমে নি। আর ঘুরতে ইচ্ছে করছে না। আর দেখতে ইচ্ছে করছে না। বাড়িমুখো মন। রূপলেখা মায়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠেছে নিয়ে ফ্লাস্ক খুলে জল খাইয়ে দিয়েছে। আবার না গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। অজ্ঞানের মতো না হয়ে পড়ে।

নীরজ? ফিরে চলি আমরা।

হুঁ!

চমকে উঠেছে নয়নশোভা। 'হুঁ' শব্দটা অনেক বেশী বড় হয়ে বেজে উঠেছে সজোরে কানের পরদায় ধাক্কা মেরে! এ যে ক্রুদ্ধ-বাঘের গর্জন শুনল সে! অস্থির হ'য়ে পড়ছে। এখন পৌছুবে। ভানু-কিরণের সঙ্গে দেখা হবে কখন? কখন কখন?

গাড়ি ছুটছে ঝড়ের বেগে।

নয়নশোভার ভেতরে প্রবল ঝড়। ঘূর্ণিঝড়।

কোন ধারণা মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেলে, সহজে পরিবর্তন হওয়া মুশকিল হ'য়ে পড়ে। সে ভালোই হ'ক আর মন্দই হ'ক।

নীরজের ও-মুখ কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছে না। কেবলি ভাবছে, তার দেখা ভুল, তার ধারণা ভুল, ভাবা ভুল। ভেবে-ভেবেও ভুল প্রতিপন্ন করতে পারছে না কিছুতেই। ভেতর থেকে কে যেন বলছে বারে বারে। ভুল নয়, ভুল নয়। বাবা নীরজ এক। নীরজ আর বাবা এক। এক এক। একেবারে এক।

দেয়ালে ঝুলোনো মায়ের ফোটোর কাছে দাঁড়ালেই, এসব কথার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বাজতে থাকে মনের কোণে এক নাগাড়ে।

আগের মতো প্রাণখোলা মেলামেশা-কথাবার্তা কওয়া আর আসে না নয়নশোভার। নীরজ এলেই কেমন হ'য়ে যায়।

শরীর-মন ছু'টোই অসুস্থ হ'য়ে পড়ে।

শরীর থেকে শরীর নেই, মন থেকে মন নেই।

বসে আছে তো বসেই আছে। দেখছে তো দেখছেই। গান শোনায় নীরজ। কাছে এসে বসে। 'মা-মা' বলে ডাকে, কোন প্রাণের সাড়া পায় না আগের মতো।

ভানুকিরণ বারণ করে দিয়েছে সকলকে। কেউ যেন বিরক্ত না করে নয়নশোভাকে। ও যেমন চুপচাপ আছে, তেমনই থাকতে দেয়া হ'ক।

নীরজ চেয়ে থাকে রূপলেখার মুখের দিকে। ছু'চোখে প্রশ্ন—'কেন'। আড়ালে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বলে রূপলেখা, দিদিমা চলে যাবার পর থেকে মাঝে মাঝে আম্মা কেমন হ'য়ে যায়। তুমি কিছু মনে কোরো না। আম্মা আমার খুব ভালো। আম্মার নজরে না পড়লে কি আর তোমার সঙ্গে মিশতে পারতুম আমি। আম্মা যার তার সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না, পাছে পরে দুখঃ পাই।

আম্মা ছাড়া তোমার কোন স্বাধীন সত্তা নেই, তাহলে? গম্ভীর স্বর নীরজের।

কি করে বলি। আম্মার যাকে যাকে অপছন্দ হয়েছে, প্রথমে আম্মার ওপর রেগে গেলেও, পরে দেখেছি—তারা সত্যিই অপছন্দের। হাসতে-হাসতে হালকাভাবেই বলেছে রূপলেখা।

আর কোন প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যে যায় নি নীরজ। শুধু ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বলেছে, বেশ বেশ। এযুগেও তাহ'লে এমন মেয়ে আছে তোমার মতো, যে নিজের জীবন-ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠা করে না কোন মাতৃ-আজ্ঞায়। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।'

মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেছে রূপলেখার। কণ্ঠে দারুণ ক্ষোভ। —নীরজ! আমার আম্মাকে টেনে ঠাট্টা-তামাশা, একদম পছন্দ নয়।

ভুল বুঝো না লেখা। উনি আমারও মা। যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা আছে ওঁর ওপর। তোমার চেয়ে কিছু কম নয় জানবে। উনি আমারো মা বলেই এত কাছে টেনে নিয়েছেন। সেই মাকে টেনে আমি ঠাট্টা—

কেঁদে ফেলেছে নীরজ।

কান্নাভেজা গলায় বলেছে, আমি বলতে চেয়েছিলুম—মা-বাপও তো মানুষ! তাদেরও ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। ছেলে-মেয়ের উচিত নিজের বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিবেচনা করে, বুঝিয়ে-সুজিয়ে সংশোধন ক'রে দেয়া। মহাকর্তব্য এটা। লোকচক্ষে মা-বাবাকে ভুলের মধ্যে রেখে হাস্যাস্পদ ক'রে তোলা নয়। অন্যায় হ'য়ে থাকে, ক্ষমা কর।

ওকি বোলছো নীরজ। আমি এতটা বুঝি নি। ঠিকই বোলেছো! সময়ে ছেলে-মেয়েকেও মা-বাবার মা-বাবা হয়ে যেতে হয়।

বারান্দা থেকে ঘরের ভেতরে এসেছে আবার ওরা।

নয়নশোভাকে প্রণাম ক'রে চলে গেছে নীরজ।

নীরজ চলে যেতেই নয়নশোভা স্বাভাবিক-সুস্থ-চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

বেশ কদিন ধরেই এই ভাবটা চলছে নয়নশোভার। নীরজ এলে অসুস্থ, নীরজ গেলে সুস্থ। এটা বাপ-মেয়ের দৃষ্টি এড়ায় নি। যতদিন যাচ্ছে, তত আরো বেশি ক'রে লক্ষ্য পড়ছে ওদের।

রূপলেখা তো প্রমাদ গণছে।

কে জানে, কখন কি মূর্তি ধরে মা! তবে এবারে যদি সত্যি কোন ভুল ক'রে বসে, সে কিন্তু প্রতিবাদ করবেই। মায়ের রকম-সকম যেন ঝড় ওঠবার পূর্বাভাস। নীরজ এলেই, এবাড়ির আকাশ বাতাস থমথমে করে তোলে মা-ই। আনন্দ দিয়ে গড়া ছেলেটা। মা নেই। মাতৃস্নেহ পাবার জন্যে ছুটে ছুটে আসে। এসে কি পায়? মায়ের বিষণ্ণ মুখ দেখে ও—ও বিষণ্ণ মুখে ফিরে যায়। আনন্দের মূর্তি দেখতে এসে মানুষ দেখবে বিষাদের প্রতিমা। রোজ-রোজ কার আর ভালো লাগে। নীরজ কিছু মনে করে না তাই। খুব সাদাসাপটা ছেলে বলেই, এটা সম্ভব। অন্য কেউ হ'লে নিশ্চয় ভেবে বসতো, তাকে অবহেলা অপমান করা হচ্ছে পাকে-প্রকারে। বিদেয় করবার ভদ্র-আচরণ। এটা ঠিক নয়, এটা ঠিক নয়।

ভানুকিরণের কাছে প্রতিদিনের রোজনামচা জানায় রূপলেখা। পাপ্পা! তুমি এর একটা বিহিত কর। মায়ের মতিগতি ফেরাও। ভদ্রলোকের ছেলেরা বাড়িতে এসে আদর-আপ্যায়ন না পেলে, কি ভাববে বলো তো। বাইরে মুখ দেখানো দায়! কখনো কাউকে মাথায় তুলছে, কখনো তাকেই আবার পায়ের তলায় থেঁতলাচ্ছে। লোকে কি বলবে—পাগল বোলবে না?

মানুষের কান। শোনা কথা শুনে শুনে বাসা বেঁধে যায় মনে। সহজে ভাঙা দুষ্কর হয়ে ওঠে। কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয় একেবারে। কখন যে বাসা আগ্নেয়গিরির রূপ নেবে, হলপ করে কেউ বলতে পারে না। জান্তে অজান্তে মুখ ফসকে একসময় না একসময় আগুনের ফুলকির মতো বেরিয়ে পড়েই। সে ভুল বুঝেই হ'ক, আর ঠিক বুঝেই হ'ক। যত প্রিয়জনই হ'ক বা শ্রদ্ধেয়ই হ'ক কোন বাধা মানে না। কথা গিয়ে তার বুকের কোনখানে ফলার মতো বিঁধে চিরজীবনের জন্যে মনে রাখা দুরারোগ্য ক্ষত ক'রে বসলো, তার খেয়ালও থাকে না মাথায়।

কন্যাস্নেহে অন্ধপিতা ভানুকিরণেরও সেই মতিচ্ছন্ন হয়েছিল একদিন। বিরক্তির জমা পাহাড় ফেটে পড়েছে। আচমকা নয়। একটা কারণের ওপর ভিত্তি করে। অন্যায়-ন্যায়ের বিচারবুদ্ধির নির্বাসন

হয়ে গেছল ভেতর থেকে।

সেদিনের সন্ধেয় মাহেন্দ্রক্ষণই চলছে তখন। এক্ষণকে কিন্তু শুভ বলে মেনে নিতে বাধো-বাধো ঠেকেছে নয়নশোভার। দুর্দান্ত মূর্তিতে নীরজের আবির্ভাবে। ওর হাত ঘড়ি চুরি করেছে নাকি শোভান। ও সোফায় বসেছিল, শোভান অনেকবার গেছে এসেছে। এক একটা ছুতো কেবল। কখনও চা কখনও টোস্ট কখনও ওমলেট। যাচ্ছে আর আড়চোখে চেয়ে-চেয়ে দেখছে তার হাতের ঘড়ির দিকে। ব্যাণ্ডটা আলগা করাই ছিল। পড়ে গেছে সোফায়। উঠে, মায়ের কাছে যেতেই, হাতসাফাই। মনে ক'রেছে টের পাবে না। ওটা শয়তান। একনম্বর ডাকাত। শীগগির বার কর বোলছি! কেউ রক্ষে করতে পারবে না তোকে! মেরে মাটির তলায় পুঁতে ফেলবো।

বৈঠকখানায় বসে সবাই।

নয়নশোভা-রূপলেখা-ভানুকিরণ।

শোভানের চুলের মুঠি ধরে কিল-চড়-লাথি মারছে নীরজ। ভানু-কিরণ-রূপলেখা চুপচাপ বসে। মাঝে দু'একবার বলেছে ভানুকিরণ, শোভান! দিয়ে দে বোলছি, ভালো চাস তো, দিয়ে দে।

নয়নশোভা মারধোর হ'বার আগেই কি বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়েছে রূপলেখা। আম্মা! তুমি এর ভেতর মিছিমিছি আসতে যাচ্ছো কেন? যার ঘড়ি, আর যে চোর, দু'জনের মোকাবিলা করতে দাও। চোরকে প্রশ্রয় দিয়ো না!

নয়নশোভা তবু বলেছে, মাথাগরম করিস নি। বাড়িতে গয়নাগাটি টাকাকড়ি দিনের পর দিন পড়ে থেকেছে একই জায়গায়। কই, একটা কানাকড়িও তো যায় নি। নেবার হ'লে, ঘড়ির চেয়ে অনেক অনেক দামি জিনিস একটা নিতে পারতো। আমি জোরগলায় বোলছি, ও নেয় নি নেয় নি নেয় নি। আজ পাঁচ-ছ বছর রয়েছে।

থামো তুমি! ঝাঁঝিয়ে উঠেছে রূপলেখা। এখানে নেবে কেন—চতুর্দিকে পাহারা যে। নীরজেরই তো সুবিধে। যা আপনভোলা!

ভানুকিরণ বলেছে, তুমি এসবে থেকো না নয়ন। তুমি কি নিজেকে

এত বড় ভাবো—যা বোঝো, সমস্ত ঠিক ? আর সবাই গোরু-গাধা !

আমি এখুনি বার কোরছি ওর কাছ থেকে। এখুনি এখুনি। ওর ভালোমানুষি সেজে কান্না, দেখাচ্ছি। নীরজের চিৎকার।

শোভান জোড়হাত ক'রে বলেছে, বিশ্বাস করুন! আমি নিই নি! আমি নিই নি।

কে কার কথা শোনে! নীরজ মেরেই চলেছে।

চুপ ক'রে বসে থাকতে আর পারে নি নয়নশোভা। উঠে গিয়ে শোভানকে আগলে সামনে দাঁড়িয়েছে। দেখছে নীরজকে। সেই ভয়ঙ্কর চোখ সেই মুখ। সেই গলার বিকৃত স্বর। বাবার আত্মা কী ভড় করেছে ওর মধ্যে !

নয়নশোভার গলার স্বর বেশ উঁচু গ্রামে উঠে গেছে।—কত দাম ? নিয়ে বেরোও এখুনি বোলছি। বেরোও বেরোও বেরোও। একদম এবাড়িতে ঢুকবে না আর। রূপলেখার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আর নয়। একেবারে পশু।

ভানুকিরণের বুকের ওপর পরে হাউহাউ ক'রে কেঁদেছে রূপলেখা। পাপ্পা! আম্মা আমার সুখ সইতে পারবে না কিছুতেই। আম্মাই আমার সর্বনাশ করবে।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে নয়নশোভা।

লেখা! তুই মুখ দিয়ে বার করতে পারলি এত বড় কথা। সুখ চাই·না···সর্বনাশ করবো !

ভানুকিরণ দাঁড়িয়ে উঠে বলেছে, ঠিকই বোলেছে ও। আমিও বোলেছি, তুমি চাও না। চাও না। চাও না। তুমিই ওর সর্বনাশ করবে। আর বাকি কি রাখলে !

নয়নশোভা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিস্পন্দ-নিথর পাথর-মূর্তি একখানা।

ভানুকিরণ বলছে, মায়ের রোগ পেয়েছে তোমার। একটু-আধটু নয়। পূর্ণমাত্রায়। হুঁশিয়ার হও এখনো বোলছি। অন্তত মেয়েটার মুখের দিকে চাও! এভাবে ওর জীবন নষ্ট কোরো না আর।

নয়নশোভা কি সত্যিই শুনছে ভানুকিরণের মুখে এমন নির্মম-রূঢ় ভাষা! কেন বধির হ'য়ে গেল না সে শোনার আগে!

মায়ের রোগ! মা কি রুগী ছিল? সমস্ত ঘটনাই তো জানে ভানুকিরণ। জেনেশুনেও এত বড় আঘাত হানতে পারলো তার ওপর! আজো মায়ের ব্যাপারটা মায়ের দুঃখের জীবনটা, তাহ'লে মুখে মানলেও, মনে মেনে নেয় নি। রাগের মুখেই মানুষের অন্তরের চাপা রাগদ্বেষ ক্ষোভ-ধারণার ঠিক কথাই বেরিয়ে যায় মুখের আগল আলগা হ'য়ে। এতদিন নয়নশোভা ভানুকিরণের জীবন-মরণ-দুনিয়া হয়েছে স্রেফ মুখে। বুকে নয়। যাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, যার ওপর অগাধ আত্মবিশ্বাস—দীর্ঘদিন একসঙ্গে ঘর করেও সে-মানুষ বুঝলো না!

এখনো মনে আগের রাগ পুষে রেখেছে!

হ্যাঁ, মা ভানুকিরণের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় নি নয়নশোভার। প্রচণ্ড অমত ছিল। মায়ের ভয়, তার মতো অসুখী-দুঃখীর জীবন না হয় শেষে মেয়ের। শুধু ভানুকিরণের বেলায় কেন, যে কোন সম্বন্ধ এলেই, আলোচনা না চালিয়েই নাকচ ক'রে দিয়েছে।

বিয়েতে ঘেন্না এসে গেছল মায়ের। পুরুষে ভীষণ অবিশ্বাস। অকারণে এসব হয় নি মায়ের। যথার্থ কারণ ছিল। সেটার দিকে চেয়ে কেউ দেখে নি, চোখ ফিরিয়ে থেকেছে কেবল সকলে। মায়ের হতভাগ্য-অদৃষ্টের জন্যে মাকেই দায়ী করেছে। মা অপয়া। পূর্ব-জন্মের কর্মফল মাকেই ভোগ করতে হবে। অন্যে কেন ভাগী হ'তে যাবে। মেয়েছেলের এত দেমাক-অহঙ্কার ভালো নয়। স্বামীর অত ঐশ্বর্য। চারদিকে সুখ ছড়ানো। ছেড়েছুড়ে চলে এলো নিজের মায়ের কাছে—বাপের বাড়িতে। সুখ আবার সকলের ভাগ্যে সয় না। মাকে নাকি সুখে থাকতে ভূতে ধরলো।

কারো কাছ থেকেই মা কোন সহানুভূতি পায় নি কখনো কোনদিন।

আত্মীয়স্বজনের তো কথাই নেই। দেখলে, মুখ টিপে হেসে দূরে সরে গেছে। কারো সঙ্গে আবার কুমারী মেয়ে থাকলে, তার হাত ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেছে মায়ের চোখের আড়ালে।

মায়ের দৃষ্টিতে নাকি লোকের সর্বনাশ।

মায়ের ব্যথাবেদনা একমাত্র মায়ের বিধবা দিদিই বুঝেছে। মাতৃস্নেহে মাকে বুকে টেনে নিয়েছে। বলেছে, ভাবিস নে নয়ন! মা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে যায় নি আমাদের দু'বোনকে। বাড়ি আর কিছু রেখে গেছে তো। একেবারে না খেয়ে পথেঘাটে পড়ে তোদের মা-মেয়েকে মরতে হবে না। মরতে হয়, মরণ আসুক তোদের মা-মেয়ের—আমার কোলেই হ'ক সেটা। আর যেতে হবে না জীবনে ওখানে। একেবারে সাক্ষাৎ দৈত্য নরপিশাচ। হৃদয়হীন মানুষ। দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই এতটুকু।

দয়ামায়ার যে লেশ নেই ভেতরে, এটা স্বচক্ষে দেখেছে নয়নশোভা। বাবার তেজারতি কারবার। গয়না বন্ধকের। প্রতিবেশিনী সুনীলাদি অনেক গয়নাই বন্ধক দিয়েছে বাবার কাছে। অভাবের তাড়নায় সমস্ত খুইয়ে সার হয়েছে দু'হাতে দু'গাছা সরু সোনার চুড়ি। বারোমাস ছেলেটা ভোগে। অতিরিক্ত লিভার খারাপ নাকি। এবারে শয্যাগত। বিধবা মানুষ, কোথা থেকে কি করে। ভেবেচিন্তে কূলকিনারা না পেয়ে দৌড়ে এসেছে বাবার কাছে। চোখের জলে আবেদন করেছে কিছু টাকার জন্যে। মা সেসময় বাজার থেকে ফিরে দোতলার সিঁড়িতে পা রেখেছে মাত্র। ওপর থেকে বাবার চিৎকার শুনছে। যাচ্ছেতাই কথাবার্তা। ছেলে মরুক-বাঁচুক, বাবার কি এসে যায়। কড়ারে রাখা ছিল। এতদিনের মধ্যে না নিতে পারলে বিক্রি হয়ে যাবে। সুদে-আসলে অনেক জমে ছিল, বিক্রি করেও বাবার পুরো টাকা ওঠে নি। সুনীলাদির কাছে বাবার পাওনা অনেক এখনো। হাতের চুড়ি দু'টো খুলে দিয়ে যাক এখুনি। লোকের উপকার ক'রে ক'রে আর পেরে উঠছে না বাবা। এ ব্যবসায় ঝকমারি। টাকা দিয়ে কড়ি দিয়ে অপযশ কেনা শুধু। ব্যবসা তুলে দেবে এবার। আর দরকার নেই!

একজন বিধবা। একমাত্র ছেলে মৃত্যুশয্যায়। ডাক্তার দেখানোর ওষুধ আনার পথ্য নেই মায়ের। কি অবস্থা! মানুষটারও তো একটা মেয়ে রয়েছে! কি ক'রে এমন নির্দয়নিষ্ঠুর মনের মানুষ হ'ল বাবা!

মা তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এসেছে। সুনীলাদি বাবার দু'পা জড়িয়ে ধরে হাপুসনয়নে কাঁদছে। ধরা গলা।—দয়া করুন দাদা, দয়া করুন। হাতের চুড়ি খুলে দিতুম এখুনি। ছেলে চায় না। ওর জন্যেই পরে থাকে। খালি হাত ওর ভালো লাগে না।

এ-ব্যবসা মোটে পছন্দ নয় মায়ের। লোকের চোখের জলের পয়সা থাকে না। একটা মেয়ে বই তো নয়। কি হবে লোকের মনঃকষ্ট কুড়িয়ে। সে না হয় গান শিখিয়ে চালিয়ে নেবে। বাবা কর্ণপাত করে নি মায়ের কথায়। নিজের কাজ নিজেই করে চলেছে। মা মুক্তি চেয়েছে। এ সংসর্গ থেকে মুক্তি। দিন গুনে গুনে সময়ই কেটেছে কেবল। মুক্তির আলো নজরে পড়ে নি। মাকে গান শেখানোর চাকরিও করতে দেয় নি বাবা।

ওপরে এসে, সুনীলাদির পায়ে পড়ার দৃশ্য দেখে, মায়ের মাথায় দপ ক'রে আগুন জ্বলে উঠেছে।—কি লোকরে বাবা! পয়সাটাই সবচেয়ে বড় তোমার!

দেখ, লোকজনের সামনে মুখ সামলে কথা বল বোলছি। তোমরা খাবে-পড়বে কোত্থেকে? এত সুখ হবে কি ক'রে পয়সা না হলে?

এমন পয়সায় খাওয়ার চেয়ে মরণই ভালো।

ম'লে তো হাড় জুড়োয়। পয়সা বাঁচে।

কথা কয়বার অনুপযুক্ত এ-লোক! মা আর কোন কথা না বলে, আলমারি খুলতে গেছে, সুনীলাদিকে টাকা দেবে।

দৌড়ে এসে, মায়ের হাত মচকে দিয়ে চাবি কেড়ে নিয়েছে বাবা। মাকে সজোরে ধাক্কা দিয়েছে বুকে। বুক চেপে বসে পড়েছে মেঝেয় মা। চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠেছে নয়নশোভা মাকে জড়িয়ে ধরে।

বাবার বিকৃতস্বর।—কার পয়সা নিতে গেছিস? লজ্জা করে না। আমারই ঘাড় ভেঙে, আমারই বুকের ওপর বসে দানছত্র দেখাবেন নবাবনন্দিনী! মেয়েটাও মায়ের শেখানোয় মায়েরই পক্ষে! কান্নার কি আছে! তোদের মেরে ফেলেছি, না কেটে ফেলেছি!

এর চেয়ে মেরে-কেটে ফেলাটা ঢের ভালো ছিল। আস্তে আস্তে

উঠে দাঁড়িয়েছে নয়নশোভা। নিজের হাতের বালা খুলে সুনীলাকে দিতে গেছে।—বোন, এটা কোথাও বিক্রিপাটা করে ওষুধ-পত্তর কর ছেলের।

চিলের মতো ছোঁ মেরে, হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বালা বাবা। —কার পয়সার বালা দিচ্ছিস। জানবি, ওটাও আমার জিনিস।

তোমার জিনিস ছুঁতেও ঘেন্না আমার।

ঘেন্না? ফেলে দে, শীগগির দে বোলছি।

এক এক ক'রে হার চুড়ি বালা মাকড়ি নাকছাবি মাথার সোনার ফুলকাঁটাটা পর্যন্ত খুলে দিয়েছে মা।

থাকবে না আর এখানে, চলে যাবে।

নিজের গয়নার বাক্স আনতে গিয়ে আবার এক ধাক্কা খেয়েছে মা। এবারে পিঠে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে।

আবারো কেঁদে উঠেছে নয়নশোভা মাকে জড়িয়ে ধরে। অসমর্থ-অসহায়ের আর কান্না ছাড়া কি-ই বা আছে! মাকে রক্ষে করবার কি আকুলি-বিকুলি। পারে নি, পারছে না। শিশু মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে, আমাকে বড় কোরে দাও এখুনি বাবার মতো। বাবাকে দেখি একবার। বাবারও হাত দুটো মুচড়ে ধাক্কা দিয়ে এইভাবে ফেলে দিয়ে। বোবা-পঙ্গু রাগ ভেতরে গর্জেছে শুধু। মাথা কুটে কুটে মরেছে।

অপমান-অবহেলা থেকে, নির্যাতনের হাত থেকে মাকে রক্ষে করতে পারে নি সেদিন নয়নশোভা। মা কিন্তু তাকে রক্ষে করেছে নিজের বুকে আঁকড়ে ধরে।

বাবা মায়ের গয়নার বাক্স আলমারির মধ্যে পুরে চাবি বন্ধ ক'রে দিয়েছে। দেয় নি। বলেছে, এতদিন খেয়েছিস-পড়েছিস তার টাকা আরো পাওনা!

নয়নশোভার হাত থেকে জোর ক'রে বালা খুলতে এসে কি বীভৎস কাণ্ড! নয়নশোভা দেবে না। কান্নাকাটি, মেঝেয় গড়াগড়ি। মা কত অনুনয় বিনয় করেছে, আমার যথাসর্বস্ব নাও, আমি চাই না। ওর নিয়ো না।

আমার দেয়া। আমি নোবই। আমিই রাজরানী রাজকুমারী করেছিলুম তোদের দু'জনকে, আমিই তুলেছিলুম মাথায়, আমিই নামিয়ে দোব, তোদের পথের ভিখিরী কোরে দোব। আমার পয়সা খেয়ে আমার পয়সায় ঘেন্না দেখানো ?

গলা টিপতে এসেছে বাবা নয়নশোভার।

মা বুক দিয়ে আগলেছে। আমার হাতের বালা খুলে মেঝেয় রেখেছে। তারপর ?

তারপর নয়নশোভার হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে বাড়ির বাইরে। মা মুক্তি চেয়েছিল, এমন অভদ্র-আচরণ পেয়ে মুক্তি পাবে ভাবতেও পারে নি। অজ্ঞান-অজ্ঞ লোকের মতো ভাষা! ছি! ছি! ছি!

দিদিমার বাড়িতে এসে উঠেছে মা।

দিদিমা অনেক দিন আগেই চলে গেছে। মাসিমাই টেনে নিয়েছে মা-মেয়েকে বুকে।

মা গান শিখিয়ে যা আয় করেছে, সংসার খুব খারাপ চলে নি। নয়নশোভাকেও লেখাপড়া গান ভালোভাবেই শিখিয়েছে। মায়ের ওস্তাদ অনেক ছিল। গলার জন্যে ওরা এমনিই শিখিয়েছে প্রাণ ঢেলে।

মা বোলতো, তার প্রধান গানের গুরু তারামতি। অবাক করা কথা! কোনযুগের তারামতি মায়ের গুরু হ'ল কি কোরে এযুগে। মা হেসে বোলেছে তারামতি মহলের স্তূপটার ওপর বসলে, আশ্চর্য! গলায় কত রকমের সুর আসে, আসে অজানা বাণী।

কথাটা ধ্রুবসত্য।

মা প্রায়ই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে গোলকোণ্ডা দুর্গের কাছে, তারামতি মহলের স্তূপ যেখানে। মা বসে-বসে আপনভাবে বিভোর হয়ে কত না নতুন গান গেয়ে গেছে একটার পর একটা।

এটা প্রমাণও হয়ে গেছে নয়নশোভার বেলাতেও। যখুনি মায়ের জন্যে মন কেমন করেছে, গেছে ওখানে। ও নিজে কখনো তারামতি আবার কখনো মা হয়ে গেছে। গান-সুর-বাণী নতুন-নতুন এসেছে ভেতর থেকে, যেটা অন্য কোথাও আসে না ওখান ছাড়া।

মায়ের অমন মধুর কণ্ঠ একদিন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সেকথা ভাবলে আজো নয়নশোভার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। কি যন্ত্রণা বুকের ভেতর। প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যায় আর কি!

কে বোঝে নয়নশোভাকে? কেউ বুঝলো না। মায়ের দোষটা কিসে? নিজের জীবনে যা যন্ত্রণা পেয়েছে বিয়ের পর। আগে অনেক দেখাশোনাই হয়েছে। ছেলে রত্ন। ভাগ্যে থাকলে মিলবে। কি সভ্যভব্য। এযুগে এমন ছেলে দেখা যায় না। দুর্লভ।

পরে কি মূর্তি, কি মূর্তি!

একমাত্র সালারজং-মিউজিয়ামে রাখা স্ট্যাচু দুর্দান্ত দুষ্টুবুদ্ধির প্রতীক মেফিসটলেসের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ভয়ঙ্কর! সজ্জনের বিভীষিকা বলা চলে। জার্মান শিল্পীর কি সুন্দর খোদাই। একটা মূর্তির সামনে একরূপ, পেছনে আর এক রূপ। পেছনের আয়নায় পরিষ্কার দেখা যায় কমনীয়-নমনীয় নতমুখী মার্গারেটা, কি অপূর্ব সৃষ্টি! শিল্পী কি দেখাতে চেয়েছেন কে জানে। বড় হয়ে নয়নশোভার দেখার পর মনে হয়েছে, মানুষ ভয়ঙ্কর আবার মানুষ সুন্দরও। বাবা ভয়ঙ্কর যতখানি, মা তার বিপরীত, ততখানি সুন্দর।

মা কোনদিনই চায় নি নয়নশোভা অসুখী হ'ক। দিদিমাও কি চান নি মায়ের বিষয়ে? নিশ্চয় চেয়েছেন। মায়ের দুর্দশায় দিদিমার অনুতাপ-অনুশোচনার অন্ত ছিল না। ভেবে ভেবে মন মরুভূমি। মনের বাতাসে দেহ শুকিয়েছে। শেষে নিঃশেষ হয়ে গেছে মায়ের কোলে মাথা রেখে নিজেই।

মা চায়নি দিদিমার মতো পরে আপসোস করতে। বিয়ে দিতে চায় নি তাই। এটা কি মায়ের দোষ! মায়ের দিক থেকে দেখলে, প্রকৃত বিচার করলে, মা একদম দোষী নয়, সম্পূর্ণ নির্দোষ।

মাসিমা মাকে লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছে ভানুকিরণের সঙ্গে।

মা আজ বেঁচে থাকলে, ভানুকিরণের এই ব্যবহার আর নয়নশোভার এই মুহূর্তের দশা দেখলে খুব সুখী হ'ত? সত্যিই কি দুঃখ পেত না। আগে গেছে, ভালো হয়েছে। এখন বুঝতে পারছে নয়নশোভা। বেঁচে

থাকলে, যে অশান্তি পেয়েছে, তার আরো দ্বিগুণ অশান্তি নিয়ে যেতে হ'ত।

মা চিরদুঃখী। চিন্তার-ভাবনায় পরিশ্রমে দেহকে দেহ বলে জ্ঞান করেনি। নেয় নি কোন যত্ন দিনের পর দিন। দেহ ক্ষমা করে নি মাকে। তিলে তিলে চরম দিনের তোড়জোড় করেছে। রক্তশূন্যতা। পূর্ণ আর করা গেল না কিছুতেই। রক্ত নেবারও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে শরীর।

মা নিজে উঠতে পারতো না বিছানা থেকে। অতি ক্ষীণকণ্ঠ। কাছে গিয়ে মুখের সামনে কান না পাতলে শোনা যেত না কোন কথা। তবু মায়ের আদেশ ছাত্রীদের যত্ন করবে। ভালো ক'রে শেখাবে। কোথাও ফাঁকফাঁকি যেন একদম না থাকে। ওরা শেখার আগে একটু চা বিস্কুট যেন পায় অন্তত। মাকে এসে পরে খাওয়ালেও চলবে। মা ঠিকই থাকবে।

মা ঠিক রইল কোথায়!

যাবার দিনে ভোরবেলা ফিসফিস করে নিশ্বাসের আওয়াজে বলেছে রোজের মতো—ছাত্রীদের আগে দিয়ে এসে একটু চিনির জল দিয়ো; গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে।

ফিরে এসে মায়ের বেহুঁশ অবস্থা দেখেছে নয়নশোভা। চামচের একটু-একটু জলে গলা ভিজেছে মায়ের বটে, স্বর আর বেরোয় নি। সেই রাতেই সেই অবস্থায় ধীরে ধীরে মায়ের ছেড়ে যাওয়া। আজো মনে হয়, আগে জল দিয়ে গেলে হয়তো এমন হ'ত না। এ জ্বালা আজো যায় নি নয়নশোভার।

নয়নশোভার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

ঠোঁট ফুটো বেশি। টানাটানা বড় বড় চোখের কানায় কানায় জল টইটুম্বুর। বড় বড় ফোঁটা ঝরে পড়ছে গাল বেয়ে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে গলার ভেতর। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। দাঁড়াতে আর পারছে না। পড়ে যাচ্ছে। ঝাপটে ধরে ফেলেছে ভানুকিরণ। শুইয়ে দিয়েছে সোফায়। দু'আঙুলে ঠোঁট ফাঁক ক'রে, ফোঁটা-ফোঁটা জল ঢালছে সাহেবা নয়নশোভার মুখে। নীরজ-রূপলেখা দাঁড়িয়ে চুপচাপ।

একটু সুস্থবোধ করেই উঠে বসেছে নয়নশোভা।

চলে যাবে। আর নয়। তার খুব হয়েছে। মেয়ে বোলেছে, ওর সুখ সইতে পারে না নয়নশোভা। ওর সর্বনাশ কোরবে। স্বামী মেয়েকে সমর্থনই করেনি শুধু, বাড়তিও কিছু বোলেছে। মায়ের রোগ পেয়েছে। চরম হয়েছে তার। এর ওপর আর কিছু নেই বলার।

গায়ের গহনা, খালি মায়ের দেয়া হাতের বালা ছাড়া হার চুরি কানের ফুল পান্নার আংটি—সমস্ত খুলে রেখেছে টেবিলের ওপর। দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছে, নীরজের ড্রাইভার এসে হাজির।

ঘড়ি পাওয়া গেছে। গাড়ির ভেতর পড়েছিল। ঘড়ি চুরির হাঙ্গামা শুনে, ড্রাইভারের কি মনে হয়েছে। গাড়িতে খুঁজেছে। দরজা খুলে দেখে—ভেতরে দাদাবাবুর সিটের নিচে পা-রাখার জায়গায় পড়ে রয়েছে।

বড় দরজা দিয়ে এককাপড়েই বেরিয়ে যাচ্ছে নয়নশোভা। সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছ'হাতে আগলেছে দরজা ভানুকিরণ। যেতে দেবে না। ক্ষমা চাইছে। এসেছে এগিয়ে রূপলেখা, এসেছে নীরজ। নীরজ স্বীকার করেছে নিজের অন্যায়। রূপলেখাও যা বলেছে তার জন্যে অনুতপ্ত। মানুষেরই তো ভুল হয়, নীরজের ভুলের জন্যে ক্ষমা চেয়েছে নয়নশোভার কাছে।

নয়নশোভা নিজের সিদ্ধান্তে অচল-অটল।

বলেছে, এখন যাই একবার। পরে দেখা যাবে'খন।

নয়নশোভার জিদ—ধনুকভাঙা পণ, এ বাড়ির সব্বাইয়ের জানা। বাধা দিলে বিপদ। যাক, একটু শান্ত হয়ে আসুক। মনে কিছু হলেই ও চলে যায় এমন। নয়নশোভা নিজের গাড়িতেও ওঠেনি। ট্যাক্সি ডেকে চলে গেছে।

এসেছে মায়ের বাড়িতে—মাসিমার কাছে। মায়ের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থেকেছে খানিক মায়ের ফোটোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

পরে উঠে গেছে ধ্যানের ঘরে।

আগেরবারের তৈরি করা জিনিস সব ঠিক সেইরকম সাজানো

রয়েছে। একটুও নড়চড় হয়নি।

নিচে চারকোণা তামার মাটিভরাট করা কুণ্ড। তার ওপর তিন-পায়ার গোল, জলে ভর্তি। বোধ হয় শুকিয়ে গেলে মাসিমা ঢালে। এতদিনে ভর্তি থাকার কথা নয়। জলের ওপর তিনকোণা কুণ্ড। কর্পূর জ্বালানোর কালো দাগটা মুছে যায়নি এখনো। তার ওপর তিনপায়ার ছ'কোণের তাম্রকুণ্ড। মধ্যিখানে একটা বিন্দু এনগ্রেভ করা।

সামনে আসন পাতা।

পায়ের ওপর পা তুলে সুখাসনে—সহজাসনে বসেছে নয়নশোভা। ব্রহ্মতান্ত্রিক অনন্তদেবের নির্দেশ স্মরণ করছে।

সংসার ক্ষেত্রে—জগতে অশান্তি লেগে থাকবেই। মানুষও এই অশান্তির দাস। ভোগ কোরতে হবে মানুষকেও। একমাত্র ভোগ থেকে রেহাই পাবার শ্রেষ্ঠ পথ—আসক্তিশূন্য। নিজের ভেতরের শান্তি নিজেকেই তৈরি কোরে নিতে হবে ধ্যানধারণায়। সবের মধ্যে থেকেও আমি সবার ওপরে। আমি প্রবৃত্তির মধ্যে থেকেও আমি প্রবৃত্তি নই। আমি শরীরের মধ্যে থেকেও আমি শরীর নই। আমি মনের মধ্যে থেকেও আমি মন নই। আমি আমিই। মাটির শক্তি জলের শক্তি। তেজের বাতাসের শব্দের। আমি প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা।

আমি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে, স্ত্রী-পুরুষ নই। আমি—আমি অণুপরমাণু বিন্দুর মধ্যে, ওসব আমি নই কিন্তু। জীবজন্তু পশুপক্ষী নদী-সমুদ্র পাহাড় মরুভূমি গ্রহনক্ষত্র আকাশ—সবেতে আমি। আমি ওসব নই। আমি দর্শক। জরাব্যাধি রোগ-সুখ-শোক-মৃত্যুর ওপরে। আমি নির্বিকার নির্লিপ্ত আসক্তিশূন্য। আসক্তিশূন্য আসক্তিশূন্য।

ব্রহ্মতন্ত্রের গোপনসাধনা। একমাত্র এই চিন্তাতেই শান্তি। আমি শান্তি আমি আনন্দ। পাখীকে পড়ানোর মতো মনকে রোজ নিয়ম কোরে পড়ালে, কোন কিছুতেই কাতর হয়ে পড়ে না মানুষ। মানুষ জীবনে সর্বজয়ী, অসীম মানসিক শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে।

ভেবে দেখতে গেলে, এসব ভাবচিন্তায় মনকে আটকে রাখতে

পারলে, অনেক দুষ্কর্ম থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বাস্তবে সে সকলের আপনার হয়ে ওঠে। সকলেও তার আপনার। একটা কোন বিশেষ লোকের সে নয়। বিশেষ লোকও তার নিজের একার নয়।

চিন্তায় অশান্ত মন শান্ত হয়ে আসছে নয়নশোভার। ত্রিকোণকুণ্ডুর মাঝখানে কর্পূর জ্বেলেছে।

মাটি জল তেজের ওপরে মন।

তিনকুণ্ডের ওপর ষট্‌কোণের কুণ্ডুর মধ্যিখানে বিন্দুর ওপর দৃষ্টি এবার। বিন্দুরও ওপরে অবিনাশী শক্তি সে—চির-আনন্দ। চৈতন্য-আনন্দ।

নয়নশোভা মগ্ন হয়ে যাচ্ছে। তার শরীর থেকেও নেই শরীরের কোন অনুভূতি। নিজেকে ভুলে যাচ্ছে, সবকিছু ভুলে যাচ্ছে। হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। একটা অজানা আনন্দের আবেশ আসছে না! অন্তহীন আনন্দের সাগরে ডুবছে নয়নশোভা। ডুবছে ডুবছে ডুবছে।



একই সময়ে দু'জনে চলে গেছে দুদিকে।

একজন বিদেয় নিয়েছে স্বেচ্ছায়। নয়নশোভা।

আর একজনের বিদেয় হয়েছে ভর্ৎসনায়। নীরজের।

নয়নশোভা চলে যাবার পর কি উগ্রমূর্তি রূপলেখার। পরিষ্কার বলে দিয়েছে নীরজকে। কোন সম্পর্ক আর নেই তার সঙ্গে। এবাড়ির ত্রিসীমানায় জীবনে যেন আর কোনদিন না আসে। তার মুখ দর্শন করতে চায় না রূপলেখা। বেহায়া-নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে বিদেয় হ'ক এখুনি এখুনি। আর একদণ্ড দেরী নয়। একদণ্ড নয় আর।

রূপলেখা ওপরে উঠে গেছে হাঁপাতে হাঁপাতে।

পরদিন থেকেই প্রায় রোজই গেছে ওরা নয়নশোভার বাড়ি।

বাপ-মেয়ে। ভানুকিরণ-রূপলেখা। অপরাধী মুখে গিয়ে হাজির ওরা। বিষণ্ণ মন নিয়ে ফিরে আসা। এই পর্বই চলছে। নয়নশোভার ফেরবার নাম নেই। হতাশা আর দীর্ঘনিশ্বাস সম্বল এখন ওদের।

বাড়িতে এসে মন টেকে না কারো। প্রাণহীন বাড়ি। দুঃখে-কান্নায় ভরে আছে নির্জীব বাড়িটা। সাহেবার চোখে জল। শোভানের চোখে জল। এমন কি নাজিরের চোখেও। ওরা প্রতিদিনই ভাবে সায়েবের সঙ্গে লেখা বহিনের সঙ্গে আম্মা মেমসায়েব ফিরে আসবেই আসবে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে সাহেবা-শোভান। ওদের আর একপল মন বসছে না। আম্মা না এলে, ওরা থাকবে ন এবাড়িতে।

রূপলেখা-ভানুকিরণেরও কেমন-কেমন ঠেকছে নয়নশোভাকে। যত দিন যাচ্ছে, তত পরিবর্তন। তত নির্লিপ্ত নির্বিকার। কথাবার্তার ধরনও পাল্টেছে। ওর কাছে এরা যেন একেবারে অচেনা-অজানা। কালে-ভদ্রেও দেখাসাক্ষাৎ হয়নি বুঝি কখনো।

আজকাল আবার অর্ধেকদিন একেবারে অদেখা। ধ্যানঘরে আছে নয়নশোভা। কখন বেরোবে, আদৌ বেরোবে কি না, কোন ঠিকঠিকানা নেই। শুধু যাওয়া-আসাই সার। সেদিন দেখা হ'ল বটে, কতক্ষণ? চকিতদর্শন যাকে বলে। 'আম্মা' বলে রূপলেখা গলা ফাটিয়ে ডেকেই চলেছে। বারান্দা দিয়ে চলে যাচ্ছে আনমনে। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মুখে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছাপ নেই।

দৌড়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে রূপলেখা-ভানুকিরণ পথ আগলে। বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে নয়নশোভা। কে? কে তোমরা? যেতে দাও আমায়!

আমি তোমার লেখা আম্মা! নিজের মুখখানা উঁচু কোরেছে রূপলেখা। যাতে নজরে পড়ে। আর নজরে পড়ে!

নয়নশোভার দু'চোখে বিস্ময়!

ভানুকিরণ বলেছে কাতরস্বরে, আমি নয়ন। আমি—আমি তোমার কিরণ!

ইতরবিশেষ কিছু হয়নি দৃষ্টির। সেই একই চাউনি। মনে হ'চ্ছে এদের উপস্থিতি ওর সইছে না মোটে। অস্বস্তিতে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। খুব দ্রুত বলেছে, তোমরা এসো এখন! বলেই, পেছন ফিরে না তাকিয়ে হনহন ক'রে চলে গেছে পাশ কাটিয়ে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে বাপ-মেয়ে। নয়নশোভার চেহারার মধ্যে একটা স্নিগ্ধজ্যোতির আভা মাখামাখি হ'য়ে রয়েছে ওর ফর্সা রঙের সঙ্গে মিলেমিশে। কথা না বলুক, উত্তর না দিক, আকর্ষণ বেড়েছে অনেক। নয়নভোলানো নয়ন দ্বিগুণ মাধুর্যে ভরপুর হ'য়ে উঠেছে।

বারে বারে যেতে ইচ্ছে করে। দেখতে ইচ্ছে করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা ক'রে একবার দর্শনের আশায় বসে থাকতে ইচ্ছে করে। পিঠছড়ানো এলো রুখু চুলে সোনালী ছটা। ধ্যানঘরে যাবার মুখে বা বেরিয়ে আসার পর চেনাই যায় না নয়নশোভাকে। এ নয়নশোভা অন্য জগতের অন্য প্রাণের। স্বর্গের দেবী বুঝি। নিরাভরণা। পরনে সিল্কের শাড়ি। পাড় ছাড়া। অপূর্ব দেখায়। বলতে ইচ্ছে করে ভানুকিরণের, হাঁটু গেড়ে বসে জোড়হাতে, অয়ি, ভুবন-মনমোহিনী···!

দেখলে একদম মনে হয় না, ভানুকিরণ আর রূপলেখার ওপর কোন রাগ-অভিমান আছে বা হয়েছিল কখনো। নীরজকে বার ক'রে দিয়ে, পরের দিনই তো গিয়ে রূপলেখা বার বার নিজের দোষ স্বীকার ক'রে নীরজ বিদেয় পর্ব শুনিয়েছে। ফল কিছু হয়নি। ভেবেছিল, এবার নিশ্চয় আসবে। খুশি হবে। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। বরং যদিও বা বসেছিল একটু ভাগ্যক্রমে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। কথা কানে গেছে কি না গেছে, বোঝাই গেল না।

ঘড়ির কাঁটা ধরে, নিয়ম ক'রে বাপ-মেয়ের যাতায়াত চলছে প্রতিদিন নয়নশোভার বাড়িতে। সন্ধের মুখোমুখি। এখন এমন অবস্থা যে, ফিরে যাবার কথা বলার সাহসও নেই ওদের।

কি করা যায়, কাকে দিয়ে নয়নশোভাকে বলালে, ওর মন গলে। পূর্বের মতো হ'য়ে যায় আবার। কাউকেই খুঁজে পায় না ওরা। কি করা যায়, কি করা যায়—অহর্নিশি চিন্তা ভানুকিরণের মাথায়। সদাই

উদাস-উদাস ভাব।

বাপের মন ঘোরাবার জন্যে ভানুকিরণের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় রূপলেখা অর্গ্যানের সামনে। মেয়ের মনের ঝড় শান্ত করবার জন্যে অর্গ্যানের কালো-সাদা রিডে আঙুলের টুংটাং আওয়াজ তুলেই, নিজেকে সামলাতে পারেনি একদম। কান্নায় ভেঙে পড়েছে। মেয়েরও একই অবস্থা। বাপ মেয়ের চোখ মোছায় পকেটের রুমাল বার ক'রে; মেয়ে বাপের মোছায় নিজের শাড়ির আঁচলে। কি করুণ দৃশ্য: শার্টের হাতায় চোখ মুছছে শোভান। সাহেবার চোখে-মুখে রঙিন শাড়ির আঁচল চাপা। ফোঁপাচ্ছে।

আচমকা দিব্যমন এসে পড়েছে ভেতরে।

আমেরিকা থেকে ফিরেছে সবে কাল। মনটা বড্ড ছটফট করছে; দু'দিন বাদে আসবে ভেবেও, থাকতে পারেনি বাড়িতে। ছুটে চলে এসেছে।

হতভম্ব হতবাক দিব্যমন।

এরকম দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হবে, কল্পনাও করেনি সে। একটা সংশয় একটা আশঙ্কা মনের কোণে উঁকি মারছে। মাসিমাকে দেখছে না। আলো করে বৈঠকখানায় বসে থাকতো, তবে কি—

ছুটে গেছে সাহেবার কাছে।

ঘরে নিয়ে গিয়ে আদ্যপান্ত—সমস্ত ঘটনাই শুনিয়েছে দিব্যমনকে সাহেবা। কোন বিষয়ের বাদসাদ দেয়নি, ছাটকাট করে নি একটুও একেবারে হুবহু। শুনে স্তব্ধ-পাথর দিব্যমন।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় কেমন ক'রে, কি উপায়ে? পথ খুঁজছে দিব্যমন মৌনমুখে একলা ঘরে। অতিথি বসার ঘরে। গালে হাত দিয়ে বসে: আকাশ-পাতাল চিন্তা।

ছ'মাস ধরে যে ঘন-নীরেট অন্ধকার-কালো মেঘ বাড়ির আকাশে জমে আছে, তার ভেতর থেকে একবারের জন্যেও, আলোর সরু রেখাটা পর্যন্ত উঁকি মারেনি। আজ যেন মেঘ চিরে বিদ্যুতের আলো ঠিকরে এসে পড়েছে ঘরে। আশার পথ দেখতে পাচ্ছে বোধ হয় ওরা

দিব্যমনকে দেখে। দিব্যমনকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে নয়নশোভা।

ওকে দেখে খুব খুশি হবে।

একমাত্র দিব্যমনই ফিরিয়ে আনতে পারে এবাড়িতে নয়নশোভাকে। ওর কথা ঠেলতে পারবে না নয়নশোভা। মানুষের জীবনে অনেক ঘটনাই ঘটে এমন যার হদিশ পাওয়া মুশকিল। ঘটনা আসে আচমকা। পথ খুঁজে পাওয়া যায় হঠাৎ। আর বিপদভঞ্জন কাণ্ডারীও কেউ না কেউ এসে পড়ে। জানা হ'ক, অজানা হ'ক—অলৌকিক মানুষ হিসেবে আসে সে—যার দ্বারা দুরূহ সমস্যার সমাধান। অনায়াসে বিপদ-মুক্ত।

দিব্যমনকে নিয়ে গেছে ওরা নয়নশোভার কাছে। গাড়িতে বারে বারে রূপলেখা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেছে, এবারে আম্মা আসবেই আসবে। পাপা আমাকে কি উপহার দেবে, আগে থেকে ভেবেচিন্তে ঠিকঠাক কোরে রেখে দাও বোলছি।

কি চাস্? তুইও আগেভাগে বোলে রাখ তাহ'লে। একগাল হেসে বোলেছে ভানুকিরণ।

আমাকে কি দেবে তুমি? রূপলেখাকে বোলেছে দিব্যমন।

তোমাকে? তোমার জন্যেই তো চাইছি পাপার কাছ থেকে আমি। হায় কপাল! এটাও বুঝতে পারলে না তুমি? বাইরে থেকে তুমি যেন কি হ'য়ে গেছো!

তুমিও তো কি হ'য়ে গেছো। আগে কথা বেরোত না মুখে, এখন খই ফুটছে।

প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠেছে তিনজনে।

ভানুকিরণের কানে কানে বলেছে রূপলেখা। আংটি। চারধারে গোল কোরে ছোট-ছোট নীলপাথর, তারপরে রুবি গোল কোরে। ছোট-ছোট। আর মাঝিখানে একটা ইংলিশ কাট হীরে। বড়।

হেসে ভানুকিরণ বলেছে, তুই-ই প্রথমে দিবি?

হ্যাঁ। তোমরা যা দেবার দিয়ো। আমি আঙুলে পরিয়ে দোব ওটা নিজে হাতে। অনেকদিনের ইচ্ছে। অমন সুন্দর গড়ন!

পেছনের সিটে ওদের হাসি-কথা শুনে, নাজিরেরও চোখে-মুখে হাসি। মেমসাহেব আজ আসছে।

হাসতে হাসতেই বাড়িতে ঢুকেছে ওরা।

ভানুকিরণকে পেছনে রেখে ওরা দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে ওপরে উঠেছে। রূপলেখা-দিব্যমন। দাঁড়িয়েছে এসে নয়নশোভার সামনে। নয়নশোভা ধ্যানঘরের দিকে যাবে বলে চৌকাঠের বাইরে পা রেখেছে সবে।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে দিব্যমন।

মাসিমা! আমি আপনার দিব্য।

নয়নশোভা দেখছে একদৃষ্টে। একটু চনমনে হ'য়ে উঠছে। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটেছে। খুব আস্তে আস্তে বলেছে, ভালো থাকো!

যাক, দিব্যমনের আসা সার্থক। চিনেছে, কথা কয়েছে নয়ন। ভানুকিরণের ভেতরে যে কি আনন্দের ঢেউ, কাকে বলবে। মনে হচ্ছে, ওর হাত ধরে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় এখুনি।

রূপলেখার তো কথাই নেই। আম্মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আদর খেতে ইচ্ছে করছে। আদর করতে ইচ্ছে করছে।

নয়নশোভা বারান্দায় বেরিয়ে ধ্যানঘরমুখো হয়েছে। ওখানে যাবে এবার।

মাসিমা!

দাঁড়িয়ে পড়েছে নয়নশোভা।

আমি কথা দিয়েছিলুম আপনাকে, লেখাকে বিয়ে কোরবো। মত দিন এবার। ফিরে চলুন আমাদের সঙ্গে।

বিয়ের কথাটা কানে যেতে নড়ে উঠেছে নয়নশোভা। শিউরে উঠেছে। অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে 'বিয়ে'! নয়নশোভার মুখের রক্ত নিমেষে সরে গেছে। সাদা ফ্যাকাশে। ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠেছে স্রেফ। 'হাঁ-না' বলতে পারে নি। ছুটে চলে গেছে ধ্যানঘরে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ভেতর থেকে। আসনের ওপর আছড়ে পড়ে কেঁদে ভাসিয়েছে।

মনে মনে বলেছে কেবল—

'শোক-সুখ-দুঃখং বর্জিতং অহং।
শান্তি-আনন্দং চৈতন্যং অহম্।'

আমার ভেতর সেই অমর, চৈতন্য-আনন্দ জেগে থাক, যাতে শোক সুখ-দুঃখের ভালোমন্দ তাপ-উত্তাপ স্পর্শ কোরতে না পারে যেন কখনো। পারবে না, পারবে না। কোন সময়ের জন্যেও না। সে আসক্তিশূন্য সে মোহ-আকর্ষণ শূন্য। সে সর্বজয়ী শক্তি।

বারান্দার দক্ষিণ কোণে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সমস্তই দেখেছে, সব শুনেছে নয়নশোভার মাসিমা।

এগিয়ে এসেছে আস্তে আস্তে ওদের কাছে।

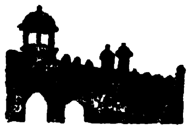
ওদের বিস্ময়ের ঘোর কেটেও কাটতে চাইছে না। এরকম একটা পরিস্থিতির জন্যে সত্যিই তৈরি ছিল না কেউ। আশ্চর্য হয়ে গেছে বেশি দিব্যমন। তিন-চার বছরে মাসিমার মনের অদ্ভুত পরিবর্তন। ভাবা যায় না। আগের শরীরের মানুষের ভেতর এখন অন্যমনের মানুষ বাস করছে বুঝি। ছলছলে চোখে দাঁড়িয়ে দিব্যমন। মাসিমার শেষের ব্যবহারটা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকছে। মাসিমা প্রকৃত কি চায়, সেটাও খুলে বলে গেল না তো!

রূপলেখার দু'চোখের নীরব ধারা ঝরেই চলেছে। আম্মার মন বোঝা ভার। কত সাধ-আহ্লাদের প্রাসাদ বানাতে-বানাতে এলো তারা! কি করে রূপলেখা! কেনদিকে কোথায় যায়!

ভানুকিরণ ওদের পেছনে একইভাবে মাথা নিচু ক'রে রয়েছে। অপরাধ তার। মুখে কি দুষ্টু-সরস্বতী চাপল সেসময়, সোনার লক্ষ্মীকে হারাতে হ'ল। নয়নের আর ফিরে যাওয়ার কোন আশাই দেখছে না। শেষ আশার প্রদীপ ধিকধিক করে যেটুকু জ্বলে উঠেছিল দিব্যমনকে নিয়ে, তাও নিভে গেল চিরজন্মের মতো। এ যে মরে বেঁচে রইল ভানুকিরণ।

নয়নশোভার মাসিমারও চোখে জল ওদের ম্লানমুখ দেখে, ওদের অবস্থা দেখে। মাসিমাই বা আর কি করবে। সহানুভূতি ছাড়া কি-ই

বা সম্বল আছে তার। এতে কি এসমস্যার সমাধান হবে কিছু? এ যে মাটিতে দাঁড়িয়ে, খালি চোখে আকাশের নক্ষত্র গোনা। তবু মাসিমা একটু শান্তি দেবার জন্যে, একটু শান্ত করার জন্যে, সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছে।



দিব্যমন-রূপলেখার শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হয়েছে নির্বিঘ্নে। মাসিমাকে এনেছে ভানুকিরণ। তার বিয়েতেও এসেছে মাসিমা।

বাড়ি ভর্তি আনন্দের ভেতরও একটা নিরানন্দের অন্তঃসলিলা বয়ে চলেছে সকলের ভেতর। নয়নশোভার অভাবটা প্রতি পদে পদে টের পাচ্ছে প্রত্যেকে। ভানুকিরণ মেয়ের কোন ইচ্ছে পূরণ করতেই বাকি রাখেনি। মেয়েকে দিয়েই মেয়ের মনোমতো আংটি—নীলা-রুবি-হীরে বসানো পরিয়েছে দিব্যমনের আঙুলে। সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা সফল বৈকি দিব্যমন। একটু দাঁড়িয়েই, একটু হেসেছে, একটা কথা কয়েছে। এসবও তো তাদের ভাগ্যে জোটেনি দিব্যমনকে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। মেয়েকে বুঝিয়েছে ভানুকিরণ। মেয়ের আপত্তি নাকচ করার জন্যে। ফল হয়নি যখন, পুরস্কার দিতে হবে না আর পাপাকে।

মাসিমার সঙ্গেই এসেছে দিব্যমন-রূপলেখা। মাকে প্রণাম করবে। এবারেও ভানুকিরণ পেছনে। নয়নশোভা ওদের দেখে, কি মন হয়েছে, নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

চেয়ে চেয়ে দেখেছে দু'জনের আপাদমস্তক। বিয়ের বর-কনের সাজেই এসেছে ওরা। একটু হেসেছে। বিষাদের হাসি। আনন্দের নয়। মনে মনে বলেছে, আটকাতে পারলো কই! আটকানো গেল না। আটকানো যায় না। ফোঁপাচ্ছে নয়নশোভা। সত্যিই যদি বিধাতা বলে কেউ থাকে, নিয়তি বলে কোন ছায়া মায়া বা অদৃষ্ট-ভবিতব্য থাকে, তাহলে কি নিষ্ঠুর কি নির্দয় ওরা! কি নির্মম পরিহাস

ওদের পৃথিবীর মানুষের ওপর।

কানে বাজছে অনন্তদেবজীর সাবধান বাণী।—ওপরে মনকে ওঠাতে গিয়ে নিচের দিকে তাকালে বড় কষ্ট। আবার তুলতে দ্বিগুণ কষ্ট, সময়ও অনেক নষ্ট। এতে অশান্তির আগুন ছাড়া শান্তির শান্তিবারি নেই একবিন্দু। এবিষয়ে লক্ষ্য রাখবে সদাসর্বদা। মন বড় দুষ্টু। বাচ্চা ছেলের মতো। সুযোগ-সুবিধে পেলেই দৌড়বে যেখানে-সেখানে। একটা না একটা অনাসৃষ্টি কোরে ছাড়বে। নিজেকে সংযত কোরতে চেষ্টা কোরবে। তুমি জানবে, তুমি শোকদুঃখের অতীত। ···শোক-দুঃখং বর্জিতং ত্বং। নিজেকে নিজে বোলবে মনের জোর আনার জন্যে, তখন 'ত্বং'য়ের বদলে 'অহং' বোলবে।

ছোটবেলা থেকে কি সুখটাই বা পেল জীবনে নয়ন। মাসিমা বলছে আর কাঁদছে। কাঁদছে আর বলছে। জ্ঞান হওয়া থেকে চোখের সামনে অসহায়-নিরুপায় শিশু একটা মায়ের দুঃসহ নির্যাতন দেখে এসেছে। মা ওর বাবাকে নিয়ে সুখী হয়নি। মায়ের তাই নয়নের বিয়ে দিতে প্রচণ্ড ভয় ছিল। মা দেয়নি। বিয়ে দিয়েছে এই মাসিমা লুকিয়ে। তারপর তো সে মেনে নিয়েছে কিরণের আদরযত্ন দেখে, সুখী হ'তে।

কিন্তু—কিন্তু কিরণই বা শেষ রক্ষে কোরতে পারলো কই। মায়ের মতো নয়নও—আগের এত সুখ সত্ত্বেও, যে তিমিরে, সে তিমিরেই ফিরে এসেছে আবার। এই একই জায়গায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে। কাজে কাজেই লেখার ব্যাপারে একটা আতঙ্ক হওয়া, ওর পক্ষে স্বাভাবিক। মাসিমার ধারণা এটা। সব ভুলে, ও যদি নিজেকেও ভুলে থাকতে চায়, থাকুক না। কোনদিন তো শান্তি পেলো না। নিজের সঙ্গে খেলা কোরে যদি একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে থাকতে পারে ধ্যানধারণা নিয়ে, থাক না।

কিরণকে কি বলেনি মাসিমা—ওর মনটা বুঝো তোমরা, ওকে একটু বোঝার চেষ্টা কোরো। হ'ল না। সবই বোধ হয় ভবিতব্য। কিরণ-লেখারই বা দোষ দেয় কি করে। এমনই যে হবে ওর, মাসিমা

নয়নের এখানে মাঝে মাঝে আসা দেখে, একটা আঁচ পাচ্ছিল যেন।

মাসিমা আশীর্বাদ ক'রেছে দিব্যমন আর রূপলেখাকে নতুন জীবন যাত্রায়। তোমরা সুখী হও। আমি মত দিচ্ছি। তোমরা শুভ কাজে তাড়াতাড়ি এগোও। নয়ন হয়তো বুঝবে যখন, নিশ্চয় খুশি মনে মেনে নেবে। নয়নের মন জানা আছে ভালোরকম। লোকে ভাবলেও, ওর বাইরেটা দেখে, সত্যিসত্যিই ও একেবারে অবুঝ নয় মোটে। দয়া-মায়া ভালোবাসা সত্যের জন্যে লড়াই—সমস্ত গুণই ওর মধ্যে বর্তমান। ওর মন আকাশের মতন।

মাসিমার ভয়। যা-ও বা এখানে স্থির হ'য়ে রয়েছে, বেশী বিরক্ত হ'য়ে উঠলে, কোথাও যদি চলে যায়, যদি নিজের ওপর—

আর কিছু বলতে পারেনি মাসিমা। কথা আটকে গেছে। একটু থেমে থেকে বলেছে, নয়নকে কোনকিছু না জানানোই ভালো আর।

মাসিমার একটা কথাই মনে গেঁথে গেছে ওদের। খুব বেশী ক'রে। পরে নয়ন মেনে নেবে। কথাটা অযৌক্তিক নয় মোটেই। এই আশায় বুক বেঁধে ওরাও শুভ-পরিণয়ের দিনক্ষণের দরজায় এগিয়ে পড়েছে তাড়াতাড়ি। মনে মনে জপের মতো বলছে নয়নশোভা।

চোখের জল আর ঝরেনি। শুকিয়ে এসেছে। রূপলেখার মুখ দেখে যে আতঙ্ক জেগে উঠেছিল ভেতরে, মুছে যাচ্ছে।

প্রণাম ক'রতে ক'রতে বলেছে দিব্যমন, মাসিমা। আপনি ভয় পাবেন না, ভাববেন না। আমি প্রাণ দিয়ে সুখী কোরতে চেষ্টা কোরবো রূপলেখাকে। আশীর্বাদ করুন আমাদের।

কি আশীর্বাদ ক'রবে নয়নশোভা।

'সুখে থাকো। দীর্ঘজীবী হও তোমরা।' না বলে, বলেছে, জরা-ব্যাধি-মরণশোকের নির্দয় ব্যথা-বেদনা যেন তোমাদের মনকে স্পর্শ না কোরতে পারে। তোমরা এসবের ওপরে। তোমরা শান্তি-চৈতন্য-আনন্দ। জরাব্যাধিশোকং মরণং বর্জিত ত্বম…। শান্তি-আনন্দং চৈতন্যং ত্বম…।

একথার অর্থ তখন কেউ বোঝেনি। না বুঝেছে, যাদের উদ্দেশ্যে বলা, তারা—রূপলেখা-দিব্যমন, না বুঝেছে ভানুকিরণ। এরাই যখন কেউ বোঝেনি, তখন মাসিমাই বা বুঝবে কেমন ক'রে! বুঝেছে সকলেই বছরখানেক পর।

বিয়ের পর প্রায়, বলতে গেলে, প্রতিদিনই এসেছে ভানুকিরণ রূপলেখা দিব্যমন। মাসিমার ঘরে বসেই সময় কাটে অনেক। মাসিমার যত্ন-আত্তিতে ওরা মুগ্ধ। মাসিমা থালা সাজিয়ে—শ্বেতপাথরের ছোট-ছোট রেকাবি ভর্তি ফল নিয়ে কাছে বসিয়ে, খেতে পারবো না বললেও, জোর ক'রে খাওয়ায়। বড় বড় মিষ্টি আঙুর ফলসারঙের কালোরঙের। আতা লেবু আপেল ন্যাশপাতি আর ক্ষীরের পেঁড়া। সবই হয়, কিন্তু নয়নশোভার মন ঘোরে না। বরং যা-ও বা চোখের দেখাই হ'ত, সেটাও কমেছে। ক্ষণিকের দেখাটাও এখন হপ্তায় একটা দিন হয় কিনা সন্দেহ। কথাবার্তা সংবাদ নেয়ানিয়ির বালাই নেই কোন। এরা সকলে অপরিচিত যেন।

মাসের পর মাস কেটেছে এইভাবে।

বর্ষা গেছে। শরৎ-বসন্ত-শীত-হেমন্ত এসেছে, চলেও গেছে। গ্রীষ্মও এলো। আবার গেলও। আবার বর্ষা। এবার প্রকোপটা অন্যবারের চেয়ে অনেক—অনেক বেশী। ঝড়বৃষ্টি লেগেই আছে। জল সরবরাহের জন্যে আধশুকনো ওসমান সাগরের জল কানায় কানায়। রাস্তা ভাসাবে এবার বোধ হয়।

রূপলেখার বিবাহবার্ষিকী পালন হবার দিন পনেরোর মধ্যেই সন্তান লাভ ক'রেছে। পুত্র সন্তান। মাসিমা খুশি। তাদের মেয়ের ঘরের ছেলে নেই তার মায়ের আমল থেকেই। এমনকি নয়নশোভারও মেয়ে। এবারেই ছেলের মুখ দেখা গেছে। কি সৌভাগ্য। মাসিকে সুসংবাদ জানাতে আর এক বিপত্তি। এসেছে মেঠাই-ফলের টুকরি নিয়ে। ভানুকিরণ আর দিব্যমন। মাসিমা-নয়নশোভা দু'হাতে বিতরণ করুক গরীবদুঃখী ভাইবোনদের। এবারে নাতি দেখতে যাবে নিশ্চয় নয়নশোভা আনন্দ ক'রে নিজে হ'তেই।

নয়নশোভা সংবাদ শোনামাত্র আঁতকে উঠেছে।

হাত কেঁপে মেঠাইয়ের কাঁচের প্লেটটা পড়ে গেছে মেঝেয়। ভেঙে খান খান। ছড়িয়ে পড়েছে বারান্দাময়। তখনো প্রণামের হাত ঠেকানো নয়নশোভার পায়ে দিব্যমনের। কাঁচের ধারালো টুকরো ছিটকে সজোরে লেগেছে ওর অনামিকায়। যে আঙুলে নিজে হাতে নিজের পছন্দসই আংটি যত্ন ক'রে পরিয়ে দিয়েছে রূপলেখা। কেটে রক্তারক্তি। সেদিকেও কোন নজর পড়তেই ছুটে পালিয়ে গেছে নয়নশোভা। অদ্ভুত লেগেছে দিব্যমনের। ছেলে শুনে এমন হবার কি আছে! থালা-ভর্তি মেঠাই হাতে দিয়ে, প্রণাম করতে করতে শুভখবর দিতেই একি কাণ্ড! ভূভারতে এমন কাণ্ড কেউ দেখেছে, না শুনেছে —দিব্যমনের তো জানা নেই আজ অবধি।

হাঁপাতে-হাঁপাতে ধ্যানের ঘরে প্রবেশ ক'রেছে নয়নশোভা। থপাস ক'রে বসে পড়েছে আসনে। এবারে আর কান্নার বন্যা বয়নি চোখের কিনারা ছাপিয়ে। নিজের মনকেই আদেশ ক'রেছে কেবল। তুমি শোক-মরণের স্পর্শের ওপরে। তুমি স্বতন্ত্র। তুমি তুমিই।

মাসিমা তো অপ্রস্তুতের একশেষ!

নয়নের মাথাটা দেখা যাচ্ছে, বিগড়েছে ঠিকই। এখন লোকসমাজে বার করা দায় ওকে। যা কেলেঙ্কারী কোরেছে, ভোলার নয়। সুস্থ-স্বাভাবিক কেউ করে এমন? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কাকেই বা বোলবে মাসিমা! কাকেই বা বোঝাবে। বোধ যার চলে গেছে, তাকে নিয়ে হাজারো সমস্যা। আহা! দুঃখুও হয়। মেয়েটা আঘাত সইতে না পেরে পাগল হ'য়ে গেল গা শেষে! মরি মরি! কি অদৃষ্ট। এসব চোখের সামনে দেখলে, কার আর সুখ-শান্তি আসে মনে। কারো মন না পেয়ে, নিজের মন নিয়ে খেলছিল, ভালো ছিল। মাসিমার ভাবনা-চিন্তার বালাই ছিল না কোন। এ একেবারে উন্মাদের লক্ষ্মণ! জ্ঞান-হারা। হায়, হায়! কপাল চাপড়ে কেঁদেছে মাসিমা! কাঁদতে-কাঁদতেই দিব্যমনকে বলেছে কিছু মনে কোরো না সোনামণি আমার। চলো! আমি গিয়ে দেখে আসি আমার দাদুর মুখ।

সোনার গিনি দিয়ে বোনঝির ঘরের নাতির মুখ দেখেছে মাসিমা। আহা-হা! মামুখী সদাসুখী! এখন ঠিক বুঝতে না পারলেও কতকটা তো আঁচ কোরতে পারা যায়। বেঁচে থাকুক মায়ের কোলজোড়া হ'য়ে।

মা আসতে পারলো না? বড্ড দেখার ইচ্ছে কোরছে বড় দিদিমা! রূপলেখা অনুনয়ের সুরে বলেছে। নয়নশোভার ব্যাপারটা ইশারায় বারণ করেছে মাসিমাকে দিব্যমন। শুনে মন খারাপ কোরবে।

দিব্যমন নিজেই উত্তর দিয়েছে রূপলেখার প্রশ্নের। পাছে মাসিমা কিছু মুখ ফসকে বলে ফেলে।—ঠিক সময়েই আসবেন। তুমি ভেবো না!

বাড়ি ফিরে এসে পর্যন্ত মনটা বড্ড টানছে ছেলেটার দিকে। এমন ভাগ্য, এই সময়েই মাথাটা গেল একদম। অমন রাজপুত্তুর এলো, বেচারী দেখতে পেল না। নয়নশোভাকে দেখে আর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাসিমা!

দিনসাতেকের মধ্যে ওবাড়ি থেকে আর কেউই আসেনি। কোন সংবাদও পাচ্ছে না মাসিমা কারো মুখ থেকে। দুশ্চিন্তায়-দুশ্চিন্তায় চোখেপাতায় এক করতে পারছে নাকো। না আসছে ভানুকিরণ, না আসছে দিব্যমন! দু'জনের একজনও না। সেদিনের ঘটনাটা কি মনে লেগেছে খুব? না, না। তা লাগবে কেন। মাসিমা তো বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলেছে সমস্ত। ওরা অতো বোকা ছেলে নয়। বোঝে, বুঝেছেও। নিজেরাই স্বীকার করে গেছে মাসিমার কাছে।

মাসিমার ভাবনায় ছেদ পড়ে গেছে।

এসেছে দিব্যমন হন্তদন্ত হ'য়ে। উসকোখুসকো চুল। ক'রাত না ঘুমের চোখ। ফর্সামুখে কালচে ছোপ। যেন কতদিনের রুগী ও। মাসিমার বুকের ভেতর ধড়াস ক'রে উঠেছে।

যা শুনিয়েছে দিব্যমন, মাসিমা বসে পড়েছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। বড্ড কাঁপছে পা-দু'টো। রূপলেখাকে জবাব দিয়েছে ডাক্তার। মাসিমাকে বড্ড দেখতে চাইছে ও। শেষ দেখা।

নয়নশোভাকে কে বলবে একথা। কে জানাবে এ দুঃসংবাদ। শুনে ওর কি প্রতিক্রিয়া হবে, তা কে জানে। যেতে চাইবে, কি না চাইবে, তারই বা নিশ্চয় কোথা।

ব'লতে হয়নি কাউকে নয়নশোভাকে ডেকে। নয়নশোভা কখন দিব্যমনকে দেখতে পেয়েছে আসতে, ওই-ই জানে। নিজে হ'তেই পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে। দিব্যমনের সব কথাই কর্ণগোচর হ'য়েছে নয়নশোভার। নিজেই বলেছে, দিব্য! আমাকে নিয়ে চলো! আমি যাবো। ড্রাইভারকে গাড়ি বার কোরতে বোলে দাও এখুনি। এক-মুহূর্ত দেরী নয় আর।

অবাকচোখে তাকিয়েছে মাসিমা আর দিব্যমন। সত্যিসত্যি নয়নশোভা তো! সত্যি নয়নশোভার কথা শুনছে তো!

মাসিমা ডুকরে কেঁদে উঠেছে। বড্ড দেরী কোরে ফেললি রে নয়ন! বড্ড দেরী—

যে অবস্থাতেই ছিল, যে বেশে ছিল নয়নশোভা, সেই অবস্থায় সেই বেশে নেমে গেছে সিঁড়ি বেয়ে তরতর ক'রে। গম্ভীরস্বরে জলদি চালাতে আদেশ ক'রেছে ড্রাইভারকে।

···এসেছে বাড়িতে।

এক একটা সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠেছে।

রূপলেখার ঘরে।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে নয়নশোভা।

এঘটনা ভবিষ্যতে যে ঘটবে রূপলেখার ভাগ্যে, অজানা ছিল না কোনকিছু নয়নশোভার।

ছোটবেলায় বড্ড রুগ্ন ছিল রূপলেখা। জ্বরজ্বালা সর্দিকাশি লেগেই থেকেছে। পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে কি রক্ত! তারপরই ভীষণ দুর্বল! তখুনি ধরা পড়ে অ্যানিমিয়া। আরো ধরা পড়ে সেইসঙ্গে অ্যানিমিয়াকে জিইয়ে রাখার মূল ব্যাধি 'থ্যালিসিমিয়া'। অবিশ্যি মাইনর। হলেও আগুন—আগুনই। ছোটই হ'ক, আর বড়ই হ'ক। এছাড়া আবার হার্ট কমজোর। আর রক্তশূন্যতা ব্যামো তো রয়েই

গেল বাসা বেঁধে শরীরের ভেতর অল্পবিস্তর।

ডাক্তারের মতে ভবিষ্যতে বিয়ে-থা না দেয়াই মঙ্গল। বলা যায় না। সাবধানের মার নেই। নয়নশোভার আর বুঝতে বাকি ছিল না কিছু ডাক্তারের ইঙ্গিতের। রূপলেখা মায়া বাড়াতেই এসেছে শুধু।

ডাক্তারের দু'হাত ধরে অনুনয় করেছে নয়নশোভা, কিরণকে শোনাবেন না দয়া কোরে এসব। মেয়ে ওর প্রাণ। ভেঙে পড়বে।

কত ব্যথা কত যন্ত্রণা বুকে চেপে রেখেছে নয়নশোভা, কেউ জানে না। না পেরেছে মেয়ের বাপকে ব'লতে, না পেরেছে মেয়েকে জানাতে। শুনলেই, চিন্তায়-চিন্তায় মরে যাবে তো এখুনি। বাপেরও সেই দশা। কাকে বলবে নিজের ব্যথা-বেদনার কথা। জানলেই তো একমুখ থেকে শতকানে পৌঁছে যাবে।

দীর্ঘদিন এই যন্ত্রণা ভোগ ক'রে আসছে নয়নশোভা মেয়েকে বাঁচানোর জন্যে। চেষ্টার ত্রুটি করে নি। বিয়েতে বাধা। হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই ছুতো বার ক'রে ক'রে নাকচ ক'রেছে। নাকচ ক'রলেও, দিব্য-মনকে তো ভুলতে পারে নি কোনদিন কোন সময়ের জন্যে। নয়ন-শোভা যদি নিজে মা না হ'ত, বোধ হয় এটা আসতো না। অন্য কোন মেয়ের হৃদয়ের কথা বুঝতে পারতো না। জানতে পারতো না। মেয়ের সংসারী হবার ইচ্ছেটা প্রবল। মাঝে-মাঝে নয়নশোভার মনে হয়েছে ওর ইচ্ছে পূর্ণ হ'ক। বাধা আর দেবে না। তবে সৎপাত্রস্থ হ'ক লেখা। এমন পাত্র, যে লেখাকে বুঝবে। আদর-যত্নে ভুলিয়ে রাখবে দিনরাত। এমন পাত্র একমাত্র দিব্যমন। স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখী হবার সাধ মেয়ের মনেও জাগে। আগে মনের দিক দিয়ে দশ-পা এগিয়ে গেছে লেখার শুভপরিণয়ের জন্যে। পরমুহূর্তে ডাক্তারের সতর্কবাণী বেজে উঠেছে কানে ভীষণ। দেখেছে মৃত্যু-বিভীষিকা। বিশ-পা পেছিয়ে এসেছে অমনি। তবু নাকচ হয় নি! তবু বাঁচাতে পারে নি। পারল না নয়নশোভা রূপলেখাকে।

মেয়ের বিছানায় বসে পড়েছে নয়নশোভা!

মাথায় হাত বুলোচ্ছে আলতোভাবে।

চোখ খুলেছে একটু রূপলেখা। ক্ষীণকণ্ঠে বলেছে, আ-আ-ম-মা। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুখময়। কত শান্তি কত আনন্দের হাসি।

নয়নশোভা তার উচ্চারণের সঙ্গে মনে মনে ব'লতে বলছে রূপলেখাকে। ব'লতে বলছে তার গলায় গলা মিলিয়ে ভানুকিরণকে। দিব্যমনকে।

বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে নয়নশোভা। ওরাও যে যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। জোড়হাত ক'রে স্তোত্রগানের সুরে বলছে নয়নশোভা—

'জরাব্যাধিমরণং বর্জিতং অহং।
আনন্দ-শান্তিং চৈতন্যং অমৃতং অহং।
আমি জরাব্যাধি মরণের অতীত।
আমি শান্তি আনন্দ চৈতন্য-অমৃত।'

চোখবুজে জোড়হাতে নয়নশোভার সঙ্গে বলেই চলেছে ওরা। কারো কোন খেয়াল নেই কোন মুহূর্তে রূপলেখার ঠোঁট-নড়া বন্ধ হ'য়ে গেছে, নিশ্বাস পড়া বন্ধ হ'য়ে গেছে চিরকালের মতো।

ঘরময় ধূপের সুগন্ধ। মৃত্যুপুরী দেবমন্দির হ'য়ে উঠেছে। হয়ে উঠছে মৃত্যুহীন-শোকহীন অমরালোক। এখনো ব'লে চলেছে ওরা— ভানুকিরণ, দিব্যমান আর নয়নশোভা।

'জরাব্যাধিমরণং বর্জিতং অহং...।'

যাদবী।

যাদবী জাওরা পাহাড়ে উঠে যে বিপদে পড়েছে, সে বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে কি? তিনদিকে পাহাড়, একদিকে ঘনজঙ্গল। জঙ্গলের হিংস্র পশুদের চেয়েও মানুষ আরো হিংস্র। যাদবী হিংস্র পশুদের কবলে না পড়ে, পড়েছে হিংস্র মানুষের দৃষ্টিতে।

যাদবী আনাগোনা ক'রেছে এখানে, তার ভয়াবহ-রোমাঞ্চকর রক্ত হিমকরা ঘটনার মধ্যে দিয়ে দিয়ে।

কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত নেমে এসেছে চোখের সামনে।

স্বপ্নে দেখা ভীষণ দৃশ্যেও এমন হঠাৎ ক'রে কিছু ঘটে যাবার উপক্রম বোধ হয় দেখা যায় না। দিন-দুপুরের প্রখর আলোয় বাস্তবের মাটিতে বসে চাক্ষুষ কি দেখছে যাদবী। বিস্ময়ের ঘোরই। যা এসেছে কতটুকু। পলকে এসে, মিলিয়েছে পলকে। তালের বাতাসে হিমেল পরশ। হিম হয়ে বুকের রক্ত জমাট বেঁধে যাবে বুঝি এখুনি।

গুহার পাশে খোন্তা দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে ঘাসের চাবড়া তুলছে যাদবী আপনমনে। পাথুরে যুগের পাথরে তৈরী ছোট-ছোট অস্ত্র মিলছে এক একটা। আনন্দ আর ধরে না। সেই আনন্দে বাধ সেধেছে অনেক নিশ্বাস একসঙ্গে ঝরে পড়ে। ঘন ঘন নিশ্বাস। সামনে-পেছন, দুধার থেকেই কানে এসে বাজছে। প্রথমটায় অত খেয়াল করে নি। খেয়ালে আসতেও তেমন গ্রাহ্য করে নি। গুরুত্ব দেয় নি বিশেষ। ভেবেছে, নির্জন নিঝ্‌ঝুম পাহাড়-জঙ্গলে এমনি মনে হয় বুঝি। কিন্তু তা নয়। পায়ের শব্দে ধারণা বদলেছে সঙ্গে সঙ্গে।

কারা যেন এগিয়ে এগিয়ে আসছে। উত্তর-দক্ষিণ—দু'দিক থেকেই। মাটি থেকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখেছে, ছ'ছজন ষণ্ডামার্ক জওয়ান তাকে লক্ষ্য করেই আসছে পায়ে পায়ে। পেছনে ঘাড় ফেরাতেই আর এক দৃশ্য। চারজন আদিবাসী মরদ। এদের লক্ষ্য জওয়ানদের ওপর। যাদবীর ওপর নয়। কি ঘটবে, কি ঘটতে যাচ্ছে, কিছু বুঝে ওঠার আগে যাদবী পাহাড়-মাটি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

বুকের তলায় কাঁপন ধরেছে যাদবীর।

চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিয়েছে। সঙ্গী-সাথীরা কেউ কোথাও নেই। সে একা। সম্পূর্ণ একা। দু'পক্ষের চোখের মণিতে উন্মত্ত ভাণ্ডারের আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। ধক ধক ক'রে। হিংস্র বন্যের দৃষ্টি এদের দৃষ্টিতে। দু'পক্ষের মাঝে দাঁড়িয়ে যাদবী। পালাবার পথ নেই কোনখানে। এখানের চিৎকার মানুষের কানেও পৌঁছুবে না। তিনদিকে পাহাড়। একদিকে ঘনজঙ্গল। জাওরা-পাহাড়ের ওপরের ঘটনা নিচে গাঁয়ের লোকের অজানা হয়েই থাকবে চিরকাল।

যাদবী শুনেছে আগে, জন্তুজানোয়ারের উপদ্রবে দিনেও জঙ্গলের ধারে আসতে ভয় পায় মানুষ। মধ্যপ্রদেশের এজায়গাটা এমনি ভয়ের জায়গা নাকি। কিন্তু যাদবী এসে অবধি এখনো পর্যন্ত কোন ভয়াবহ জন্তুজানোয়ারের উপদ্রব দেখে নি। চোখে তো পড়ে নি। পড়লে বরং ভালো হোত। এমন একটা অজানা দমবন্ধ পরিবেশে পড়তে হোত না তাকে। কোন মানুষজন এ ত্রিসীমানায় আসতো না তাহলে।

যাদবী স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে চুপচাপ। নিস্পন্দ পাথর একখানা। এরকম হয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি যাদবীর। এগোনো যাবে না পেছোনোও যাবে না। নিয়তির ওপর নির্ভর ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। নসিবে কি আছে—নসিবই জানে ভালোরকম। দু'দলের সম্মুখসমরের মাঝে পড়ে, ওদের পায়ের চাপে পিষেদলে না মাটি নিতে হয় শেষে যাদবীর।

এদেরই বা নিরস্ত করা যায় কেমন ক'রে! কিসের দাবি, কি কারণে রণং দেহি মূর্তি, কিচ্ছু জানা নেই। সামনের সারির মধ্যিখানের

লোককে দেখা-দেখা মনে হচ্ছে। ওবেহুল্লাগঞ্জের বাজারের কাছে। চোখাচোখি হতে ভালো লাগে নি খুব। মিটমিটে চোখে তাকিয়ে একদৃষ্টে। গালভরা চাপদাড়িতেও অসভ্যের মতো হাসিটা চাপা পড়ে নি! বরং বেশী ক'রে ভেসে উঠেছে বিচ্ছিরি রকমে।

পশ্চিমের রাস্তা ধরে—চড়াপড়া রাসনান্দীর সেতু পেরোনোর পর—চলতে চলতেও দু'একবার যে নজরে না পড়েছে তা নয়। পড়েছে। অবিশ্যি ঠিক পেছু পেছু বা পাশাপাশি নয়। পেছন দিকে, অনেক দূরে দূরে। পেছনের সঙ্গীদের লক্ষ্য করতেই লক্ষ্য পড়েছে লোকটাকে। মুখে আর হাসির লেশমাত্র নেই এতটুকু! তার জায়গায় ভার ভার। ভীষণ গম্ভীর।

পর পর দুটো পাহাড়ি ঝরনা। গানকুদ আরে সাপওয়ানি। ঝরনা দুটো ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়েছে সবে, আবার দেখা। এবার ক'টা মরদের সঙ্গে ও যেন প্রাণখোলা কথাবার্তায় মত্ত। এরপর এতখানি পথ হেঁটে হেঁটে এসেছে যাদবীরা। এটা তো দূরের কথা, অন্য জনপ্রাণী নজরে পড়ে নি।

নিচের দিকে জাওরা গাঁওয়ে আদিবাসীদের খাপরাছাওয়া ঝুপড়ির কাছে এসেও ওদের একজনকেও দেখে নি আর। আদিবাসী গোন্দদের সঙ্গে আলাপ করেছে যেচে যাদবী। শুনেছে এক জঙ্গলে শিকারে বেরোচ্ছে। এদের নিয়ম পাহাড়ের গুহায় আঁকা শিকারের ছবির সামনে মোরগ বলি দিয়ে শিকারের শুভযাত্রা শুরু করা।

কৌতূহলী হয়ে উঠেছে যাদবী। ওদের পেছু পেছু পাহাড়ে উঠবে। দেখার বড় সাধ। কঠিন চড়াই-উতরাই পথ। পথ ভেঙে ভেঙে উঠেছে নেমেছে। নেমেছে উঠেছে। সত্যিই না এলে দেখা বাকি থেকে যেত এমন বিচিত্র ধরনের ছবির গুহা। এক এক গুহায় এক এক রকমের। কোথাও যুদ্ধ, কোথাও বাঘ, সিংহ-হরিণ। কোথাও মানুষপ্রমাণ বুনোমোষ। হরিণ, বুনোশুয়োর। লাল নীল হলুদ আর সাদায় রাঙানো জন্তুজানোয়ার আর মানুষ-রথ-ঘোড়া।

একটা গুহায় শিকারীর বর্শার ফলকে গাঁথা হরিণ শিকারের দৃশ্য।

কোন যুগে এঁকেছে গুহাবাসী এক শিল্পীমনের মানুষ। মাথা নিচু ক'রে মনে মনে অজ্ঞাত-অখ্যাত শিল্পীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা-প্রণাম জানিয়েছে যাদবী। গোন্দ আদিবাসীদের মোরগ বলি দেখেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সত্যিই ওদের মনস্কামনা পূর্ণের নিখাদ ভক্তির উৎসর্গ। শিকারীর শিকার সার্থক হোক। অসময়ের রসদ ঘরে উঠুক ওদের।

যাদবী শুনেছে ওদেরই একজনের মুখে। রাজগোন্দদের জাত এরা। এদের জাতের রাজত্ব রাজপ্রাসাদ ছিল নাকি এককালে পাহাড়ে। কালের গতিকে হারিয়ে যায় অনেক কিছু। অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণও থাকে না তার কণামাত্র।

সহজ সরল গোন্দদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যাদবী খুশি। একটু-আধটু নয়, সম্পূর্ণ। ওরাই জানিয়েছে, ঘাসের চাপড়ার তলায়, পুরু শ্যাওলার তলায় এখনো জমা আছে কত না, ছোট ছোট পাথরের অস্ত্রশস্ত্র। অনেকেই খুঁড়ে-খুঁড়ে পেয়েছে।

যাদবী অস্ত্র দেখার লোভ সামলাতে পারে নি।

খুঁড়ে-খুঁড়ে ঘাসের চাপড়া তুলে তুলে বার করছে। প্রতিবেশী সঙ্গীসাথীরা ফিরে যাবার তাগাদা দিয়েছে।—আর দেরী করা উচিত নয় একদম। শিকারীরাও চলে যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বলেছে যাদবী, যাক! *তোমরা চলে যেতে পারো। ঠিক সময়ে ঠিক নেমে যাবো আমি।* আমার জন্যে কারো দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই।

যাদবীকে জানে ওরা সকলে। একেবারে কাঠগোঁয়ার যাকে বলে। ওর ইচ্ছেয় চলতে হবে সবাইকে। অন্যের মতে চলা ওর ধাতের বাইরে। ওরা আস্তে আস্তে নিজেদের বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নেমে গেছে পাহাড়ের উঁচু থেকে। নিচে অপেক্ষা করলেই চলবে'খন।

যাদবী ওদের দিকে মুখ-চোখ না তুলেই, যা বলার বলে দিয়ে নিশ্চিন্ত। সত্যিসত্যিই ওরা চলে গেছে, না দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে-সবে কোন হুঁশই ছিল না তার। অস্ত্র বার করা আর খোঁড়ার ধ্যানেই মগ্ন সে।

ধ্যানভঙ্গ হয়েছে মানুষের ঘন ঘন নিশ্বাস ঝরে পড়ার শব্দে। খুব

কাছ থেকে। মুখ তুলতে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে যাদবী। তার লোকেরা কেউ নেই তার পাশে। বাবা থাকলে এমন ছেড়ে চলে যেত না কখনো। যায়নিও তো কোনদিন। যে জিনিস দেখতে ভালো লেগেছে যেখানে, যাদবীর স্বভাবে বসে পড়েছে থপাস করে। যাবে না যেন। কই, বাবা তো কাছ ছাড়া করেনি তার কথা শুনে। বাবা, বাবাই। বাবার স্নেহ-ভালোবাসা অন্যের মধ্যে পেতে চাওয়া বোকামি ছাড়া কিছু নয়। স্রেফ বোকামি। বাবাই তার বনজঙ্গলের পাহাড়-পর্বতের নেশা জাগিয়ে তুলেছে, বাড়িয়ে তুলেছে সঙ্গে করে করে ঘুরে বেড়িয়ে। বাবা চলে যাবার পর এই প্রথম অন্যদের সঙ্গে বাইরে বেরনো যাদবীর। সাহারা হবার পর পাখীর ডানা দিয়ে আগলানোর মতো কিভাবে আগলে আগলে রেখেছে বাবা, আজ মর্মে-মর্মে অনুভব করছে যাদবী।

যাদবী চমকে উঠেছে।

একটা বজ্র-গম্ভীর স্বরে জাওরা পাহাড়ের আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠেছে থর থর করে।—হুঁশিয়ার! হট্ যাও! হট্ যাও!

যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে পড়েছে। যতখানি এগিয়েছে ওরা তার একচুল বেশী আর এগোয় নি। আদিবাসীদের পেছনের দিক থেকে দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসী ঘুরে এসে যাদবীর পাশে দাঁড়িয়েছে। সেই কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলছে পাহাড়ে-পাহাড়ে। এবারে কিন্তু সন্ন্যাসী কোন পক্ষকেই কোন আদেশ করছে না। শুধু যাদবীকেই অভয়বাণী শোনাল।—ওরো মত মেরী বেটী, ডরো মত্।

হাতের-চোখের ইশারায় দু'দলকেই চলে যেতে বলেছে সন্ন্যাসী একদণ্ড দেরী না করে। সামনের দু'জনের কিন্তু চলে যাবার কোন লক্ষণই নেই। দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। পেছনের ওরা প্রস্তুত হচ্ছিল। চলার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছে, সামনের ওরা এগিয়ে এসেছে। একেবারে সন্ন্যাসীর মুখোমুখি। প্রথমটায় হঠাৎ একজন এসে পড়ে ধমকানোর সুরে আদেশ করতে হয়তো ভড়কে গেছল ওরা। এখন সামলে নিয়ে আগের বেপরোয়াপনায় ফিরে এসেছে আবার।

ওদের মধ্যিখানের মধ্যমণির গালের হাড় শক্ত হয়ে উঠেছে বেশ। চোখ দুটো লাল করমচা। ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কি বিকৃত কণ্ঠস্বর। —ম্যায় হটনেওয়ালে নহী। দুনিয়া পহচানতে মুঝে। ম্যায় বীররাজ হুঁ। বীর বীর!

ঘুষি পাকিয়েছে বীররাজ। সন্ন্যাসীকে মেরে ধরাশায়ী ক'রে যাদবীকে নিয়ে সরে পড়বে। ওর সাকরেদরাও ওর গায়ে গায়ে দাঁড়িয়েছে এসে। প্রত্যেকের ট্যাঁকের ছোরা হাতে হাজির। রোদ্দুরে ঝকঝক ক'রে উঠছে। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। পেছনের শিকারীরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। বল্লম উঁচু ক'রে ধরেছে।

যাদবীর বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস ক'রে উঠেছে।

রুদ্ধশ্বাসে মরণক্ষণ গুনে চলেছে। কালের করালগ্রাস নেমে এসেছে জাওরা পাহাড়ে। তার জন্যে না সন্ন্যাসীর প্রাণ যায়!

সন্ন্যাসী দু'হাত উর্ধ্বে তুলে হয়ত নেড়ে নেড়ে দু'পক্ষকে শান্ত হোতে ইঙ্গিত করেছে। ওরা শোনে নি কেউ। 'মাভৈ' চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে লাফিয়ে উঠেছে। বীররাজরা ঘন ঘন ছোরা ঘোরাচ্ছে। কাকে তাক ক'রে ছুঁড়বে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এদের হাতের নিশানা যদি অব্যর্থ হয়, তবে কারো না কারো হৃৎপিণ্ডে আমূল বসে যাবে। এফোঁড়-ওফোঁড় নিশ্চিত। অন্যপক্ষও এমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে নেই আর। নিজেদের মধ্যে তফাৎ-তফাৎ সরে গিয়ে জায়গা করে নিয়ে, লাঠি ঘোরানোর মতো বল্লম ঘুরিয়ে চলেছে।

সন্ন্যাসী একবার দু'দলের সকলেরই ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। গম্ভীর গলায় বলেছে, আসানি সে হটে গা নহী কোই, আচ্ছা!

সন্ন্যাসীর মুখের কথা শেষ হোতে না হোতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল চোখের নিমেষে। দু'পক্ষের কেউই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। পায়ের জোর হারিয়ে ফেলেছে। বসে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সব। আস্ফালন-দম্ভ—সমস্ত নস্যাৎ। শক্তির হম্বিতম্বি শূন্যে মিলিয়েছে। প্রায় সকলেরই মুখে কুলুপ আঁটা। দু'একজনের মুখ দিয়ে গোঙানি শব্দ বেরোচ্ছে।

যাদবীর সারা শরীর কাঁপছে ঠক ঠক করে।

একি দেখছে! সন্ন্যাসী নেই। সন্ন্যাসীর জায়গায় একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে। চতুর্দিকে অন্ধকার দেখছে। নিজেকেও দেখতে পাচ্ছে না। কোথায়, কোন্ গহিন আঁধারের অতল তলে যে ডুবে যাচ্ছে সে। ডুবে গেল। তলিয়ে গেল।

...যাদবীর জ্ঞান ফিরতে দেখেছে পাহাড়ের গুহার মধ্যে একটা পাতা কালো কম্বলের ওপর শুয়ে। ভালো ক'রে চাইতে দেখে, তার দিকেই চেয়ে বসে রয়েছে বাঘছালের ওপর সেই সন্ন্যাসী! যাদবীর বুক ঢিবঢিব ক'রে উঠেছে। সর্বনাশ! এ সন্ন্যাসী, না কঙ্কাল? কঙ্কাল, কঙ্কাল, কঙ্কাল...।

ছ'চোখ বুজে ফেলেছে যাদবী। জড়ানো কথায় মুখ দিয়ে এই একটিমাত্র শব্দই বেরিয়ে আসছে কেবল।

সন্ন্যাসী কাছে এসে, মাথায় হাত রেখে শান্তস্বরে বলেছে, বেটী! কঙ্কাল নই আমি। কঙ্কাল নই। তুমি বিশ্বাস কর। তুমি বিশ্বাস কর।

তবে এরকম দেখল কেন? ভুল, সম্মোহন, না অন্য কিছু?

না ভুলও না, সম্মোহনও না। অন্য কিছুও না!

একটু সুস্থ বোধ করতে, স্বাভাবিক মনোবল ফিরে পেতে যাদবীর হাত ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে গেছে গুহার আরো ভেতরে। ধুনির আগুনে খুব স্পষ্ট না হলেও, পথ দেখে নিতে অসুবিধে হচ্ছে না কোন।

ধুনির কাছাকাছি আসতে পরিষ্কার দেখেছে, একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর ঘোমটা ঢাকা লালশাড়ী-পরা স্ত্রীলোক বসে।

সন্ন্যাসী বলেছে, আমার স্ত্রী। আমার জীবনসঙ্গী। আমার ধর্ম আমার কর্ম আমার সাধনা আমার ক্রিয়াকলাপ। ধুনির সামনে বসেছে সন্ন্যাসী।

যাদবীও সন্ন্যাসীর আদেশে বসে। এ যেন কোন নতুন ছনিয়ার রহস্যপুরীতে এসে পড়েছে যাদবী। ভেতরে এসে মনে হচ্ছে, বাইরের জগৎ থেকে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাইরের সুরে সুর মেলানো মনের তার

ছিন্ন হয়ে গেছে। এখানে নেই আকাশ, নেই সূর্য, নেই মাটি। আছে নিরস-কর্কশ পাথরে গড়া পাহাড়ের গুহা। আর আছে ধুনির আগুন। গুহার আলো তাপ আর প্রাণ। আর আছে দুটি প্রাণ। সন্ন্যাসী আর তার স্ত্রী।

এখানে সন্ন্যাসীর অন্যভাব।

ঘোমটা ঢাকা স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি সন্ন্যাসীর। অপলকে দেখছে তো দেখছেই। কি এত দেখছে, সন্ন্যাসী নিজেই জানে। দেখে দেখেও তৃপ্তি পাচ্ছে না বুঝি।

সন্ন্যাসীর চোখের কিনারা বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

হঠাৎ সন্ন্যাসী আনমনা হয়ে উঠেছে। ধরা গলায় বলেছে যাদবীকে. আমার স্ত্রীকে দেখবি বেটী? আমার স্ত্রী তিলোত্তমা। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর থেকে তিল তিল নিয়ে নিজে অপূর্ব সুন্দরী।

স্ত্রীর ঘোমটা খুলতেই আবার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে যাদবীর। আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। জ্ঞান হোতে আগের কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়েছে আবার।—কঙ্কাল কঙ্কাল কঙ্কাল···।

সন্ন্যাসী বলেছে, হ্যাঁ কঙ্কাল। তবে তোমার কোন ভয় নেই মা। মাতৃনামে শপথ ক'রে বলছি আমি। এ কঙ্কাল মানুষকে শুদ্ধ মুক্ত ক'রে তোলে মা। সংযত ক'রে তোলে। বিপথে যেতে দেয় না। বিপথ থেকে টেনে আনে।

যাদবীর আর ভালো লাগছে না সন্ন্যাসীর কোন কথা শুনতে। এক বিপদ পেরিয়ে আর এক বিপদের রাজ্যে এসে পড়েছে সে। কি ক'রে উদ্ধার পাবে এখান থেকে। এ কঙ্কালের রাজ্য থেকে।

দিনের আলোয় খোলা চোখে দেখেছে সন্ন্যাসীর জায়গায় কঙ্কাল। এখানে সুন্দরী স্ত্রীর জায়গায় কঙ্কাল। যাদবীর মাথাটা কেমন করছে। বিগড়ে যায়নি তো! মির্জাপুরের বাড়িতে বিছানায় প্রায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছে না তো। আসলে এসবের কোনটাই সত্যি নয়। ঘুম ভাঙলেই, সমস্ত শেষ। রাতের স্বপ্ন ভোরে থাকে কি?

সন্ন্যাসীর হাতের স্পর্শে শিউরে উঠেছে যাদবী। কঙ্কালের আঙুল

নাকি! না, এ যে রক্তমাংসের মানুষেরই আঙুল সত্যিসত্যি।

সন্ন্যাসী যাদবীর হাত ধরে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে বলেছে, মা, তোমার ভয় ভাঙানোর জন্যে অনেক কথা বলার আছে। নিজের বুকে হাত রেখে বলেছে, এই রন্তিদেও সন্ন্যাসী। আজ অবধি তো জানে না কেউ। এ কাহিনী পাঁকে ডোবা এক তরুণের! সেই তরুণই প্রতাপগড়ের—উত্তরপ্রদেশের ছেলে রন্তিদেও।

রন্তিদেও নিজের জগতেই নেচেকুঁদে জীবন কাটাতে চেয়েছে। তার সীমার বাইরে পা রাখতে চায় নি একদম। নিজের সুখে বাধা পড়ে যাবে, তাই সংসারের কোন দায়দায়িত্বই নেয় নি কখনো। নিতেও চায় নি। নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত, আত্মসুখে এত মগ্ন যে, স্ত্রীর মনের পাঠ জানার বোঝার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি। স্ত্রীকে একটা মানুষের মধ্যেও গণ্য করে নি কোনদিন।

একটু চুপ ক'রে থেকেছে সন্ন্যাসী রন্তিদেও। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছে, স্ত্রী মায়াবতী কিন্তু নেপথ্য থেকে রন্তিদেওয়ের ওপর লক্ষ্য রেখেছে অনবরত। রন্তিদেওয়ের মনের পাঠ তার নখদর্পণে এসে গেছে পুরোপুরি। স্বামী কি চায়, কি না চায়—অজ্ঞাত নেই তার কাছে কোন কিছু। অবহেলা পেয়েও ফেলনা ভাবে নি স্বামীকে কোন সময়।

পুরাণের কাহিনীতে শোনা যায় অগ্নির স্ত্রী স্বাহার কীর্তি-কলাপের কথা। কামনাজর্জর অগ্নিদেবের মন বুঝেও স্বামীকে ঘেন্নার চোখে দেখে নি স্বাহা। ত্যাগ করেও যায় নি। অরুন্ধতী ছাড়া কণ্ঠঋষির ভাবধারায় নিজেকে তৈরী ক'রে ক'রে এক একদিন উপস্থিত হয়েছে অগ্নিদেবের কামনাতৃপ্তির বাসরে। আচারে-ব্যবহারে ধরনধারণে মোহ-ভ্রমের ঠুলি দু'চোখে এঁটে দিয়েছে স্বাহা অগ্নিদেবের। যে ভাবের জন্যে ঋষির স্ত্রীর ওপর আকাঙ্ক্ষা অগ্নিদেবের, সেই ভাব নিজের হৃদয়ের কাছা-কাছি পেয়ে অগ্নিদেব মহাখুশি। ভেবেছে ঋষিপত্নীর সত্যি আগমন।

মায়াবতী রন্তিদেওয়ের কাছে স্বাহার দ্বিতীয় রূপ একেবারে। রন্তি-দেওয়ের একথা মনগড়া নয়, প্রকৃতই।

বাড়ির বারমহলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নিত্য-নতুন রমণী এসেছে—রাতে

অভিসারে রন্তিদেওয়ের ঘরে। রন্তিদেওয়ের কামনার আগুন কিন্তু নেভে নি তাতে। দিন দিন বেড়েই চলেছে বরং। তৃপ্তির পরিধি কি অসীম? পাচ্ছে না তো রন্তিদেও।

সময়-সময় বারমহল থেকে ছুটে চলে এসেছে অন্দরমহলে—শোবার ঘরে। অবাক হয়ে চেয়ে থেকেছে একদৃষ্টে। একি মায়াবতী! না অন্য কেউ! সাজসজ্জা হাবভাব যে তারই মনোমতো। মায়াবতী এত সুন্দর!

একদিনের ধারা দ্বিতীয় দিনে নয়।

প্রতিদিন নতুন নতুন ধারায়, নতুন সাজে নতুন মনে স্বামীর মনোরঞ্জন করেছে মায়াবতী। তবু কি স্বামীর মনকে নিজের ক'রে আটকে রাখতে পেরেছে? না পারে নি।

নিজের মনের কোন গোপন কথাই স্ত্রীর কাছে আর লুকোয় নি রন্তিদেও, লুকোতে ইচ্ছেও করে নি। এমনি স্ত্রী এ, সব কিছু খোলাখুলি বলা যায়। ক্ষতির কোন ভয় নেই।

বলেছে, মন আমার অনেক বশে এসে গেছে, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ নয়। যতক্ষণ তোমার সামনে, ততক্ষণ অন্যমানুষ। তোমার অনুপস্থিতিতে যত বিভ্রাট। মুখ তোমার ভেসে ওঠে ঠিকই, কিন্তু আগের অভ্যেসের দোষে অন্য মুখ এসে সরিয়ে দিতে চায় বারে বারে তোমার মুখ। আমি তো ঠিক রাখার কোন কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি একটা কিছু বিহিত বার কর যত শীগগির। ভেতরটা আমার জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে যায়।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে শুধু মায়াবতী। কিছুক্ষণ। শিশুর সরল সত্যি কথা শুনেছে কানে। দেখেছে চোখে শিশুর পবিত্র চাউনি। মায়ের মন এসে গেছে মনে। রন্তিদেওয়ের মাথা কোলে নিয়ে চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করছে। বলতে ইচ্ছে করছে, ভয় নেই। তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। নিশ্চয় হবে।

অনেক সময় দেখা যায় মনের প্রবল ইচ্ছে তখুনি-তখুনি কাজ দেয়। মায়াবতীর বেলায়ও ঘটেছে তাই। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে খাটের

একপাশে রন্তিদেও বসেছে। তারপর মায়াবতীর কোলে, মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছে সটান হয়ে। দু'চোখ বুজে আস্তে আস্তে বলে চলেছে গুজরাটের কথা। যেন ঘুমন্ত মানুষের মুখ দিয়ে ঘুম-জড়ানো কথায় কত কি শুনে যাচ্ছে মায়াবতী।

নিস্তব্ধ রাতে ভারী-মিষ্টি গলার স্বর বুঝি ভেসে ভেসে আসছে বাতাসে ভর করে। অনেক—অনেক দূর থেকে।

তখন আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ। নবরাত্রি উৎসবের ধুম পড়ে গেছে প্রতি ঘরে ঘরে। মেয়েরা দেবীভবানী অম্বাদেবীর ধ্যানধারণায় ব্যস্ত। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে নাচছে সবাই। কখনো হাত ধরাধরি ক'রে, কখনো ঘুরে ঘুরে ঘাগরার পদ্মপাপড়ি ফুটিয়ে তুলে। মনোরম দৃশ্য। মধ্যিখানে শতছিদ্র রঙিন মাটির হাঁড়ির ভেতর মাটির প্রদীপ জ্বলছে। এই মঙ্গল হাঁড়িকে ঘিরে গোল হয়ে নাচ আর মুখে মুখে সুরেলা কিন্নরীকণ্ঠের মাতৃ-গান। আবার মাথায় হাঁড়ি নিয়ে নাচতে-নাচতে ঘুরছে। গরবাউৎসব।

সোনা গয়না শিরে,
অম্বে মা চলে ধীরে ধীরে।
লটকে মটকে রাশ রয়েছে
দক্ষিণী না তীরে।...
মা-ই কল্যাণী ধ্যান ধরেছে
নেই ভরিয়াছে নীরে।
অম্বে মা চলে ধীরে ধীরে।

মেয়েরা শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে মা-কল্যাণীর ধ্যান করছে, আর রন্তিদেও! রন্তিদেও এমন পাষণ্ড যে মেয়েদের রূপে মুগ্ধ হয়ে পাগল একেবারে। আসক্তি এত বেড়ে উঠছে যে, নিজেকে সামলানো দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অগত্যা কালবিলম্ব না করে, বন্ধুকে না জানিয়ে চুপিচুপি পালিয়ে এসেছে।

এসে অবধি শান্তি নেই স্বস্তি নেই। এমন নরাধম, দেবতার সম্মান দিতেও পারল না। অপবিত্র লোক পবিত্র আবহাওয়ায় গেলে

সেখানকার আবহাওয়াকেও অপবিত্র করে তোলে নিজের কুচিন্তায়। কম দুর্ভাগ্য নয় রন্তিদেওয়ের। পবিত্র আবহাওয়ার বিশুদ্ধ আনন্দের নিশ্বাসটুকুও বুক ভরে টেনে নিতে পারে নি। ধূপধুনোর গন্ধ সহ্য করতে পারে নি। বাঁশী মৃদঙ্গ বীণার সুর কানে প্রবেশ করতে পারে নি। তালা লেগে বন্ধ দু'কান। কামনার মাকড়সার জালে চোখের মণি ঢাকা। মেয়েদের মায়ের শ্রদ্ধা-মাখানো স্নেহস্নিগ্ধ রূপ চোখে পড়ে নি।

অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে রন্তিদেও।

মনের এই অধঃপতন থেকে উত্থান কি হবে না, হতে পারে না আর কখনো কোনদিন? কে তুলবে, কে পারবে?

বোজা চোখের দু'কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে রন্তিদেওয়ের।

চোখের পাতা জলে ভিজে উঠেছে মায়াবতীরও। মায়াবতী কান্নাভেজা গলায় বলেছে, নিরাশ হবার কিছু নেই। কোন ভয় নেই। আমিই তোমাকে তুলবো, আমিই পারবো। নিশ্চয় পারবো। তুমি উঠবেই। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়।

জোরগলায় বলতেই হবে এরকম স্ত্রী সবার ভাগ্যে মেলে না। এখানেই আসে নিজের নিজের সুকৃতির কথা। দুষ্টমনের রন্তিদেওয়ের এমন কোন সুকৃতি ছিল যার জোরে মায়াবতীকে পাওয়া। সে মায়াবতীর যোগ্য স্বামী নয় একদম। একথা ছোট-বড় সকলের সামনে একবাক্যে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই রন্তিদেওয়ের।

আশ্চর্য লাগে ভাবতে। মায়াবতীর মনের জোর কি প্রবল। কি তীব্র ইচ্ছে-শক্তি। অসাধ্য সাধনের যোগাযোগ এনে দিয়েছে তড়িঘড়ি। গাঁয়ে এসেই তাঁবু ফেলেছে পরিব্রাজক সাধু শতানন্দ। শতানন্দের কাছে গিয়ে ধন্না দিয়েছে মায়াবতী। মহারাজ! কৃপা করে একটা পথ বাতলে দিতেই হবে। না পাওয়া পর্যন্ত মায়াবতী অন্নজল গ্রহণ করবে না কোনমতেই। প্রাণ যায়, যাক।

হেসেছে শতানন্দ।

মায়াবতীর আনা আপেল থেকে একটা আপেল তুলে নিয়ে, ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে দেখেছে আর মায়াবতীকে আড়চোখে-চোখে লক্ষ্য করেছে।

মায়াবতীর কেমন মনে হয়েছে, নিশ্চয় তাকে খেতে বলবে মহারাজ। তাড়াতাড়ি শতানন্দের পায়ে মাথা গুঁজে বলেছে কাঁদতে কাঁদতে, না মহারাজ, না না। দোহাই আদেশ করবেন না।

শতানন্দ মাথায় হাত রেখে বলেছে, আদেশ নয় রে পাগলী, আদেশ নয়। এটা আমার আশীর্বাদ। তোকে আর স্বামীকে। কথা দিচ্ছি তোর আর তোর স্বামীর ইচ্ছে পূর্ণ হবে। আপেলটা মায়াবতীর হাতে দিয়ে বলেছে, নিয়ে যা। কাল সন্ধ্যের পর তোর স্বামীকে নিয়ে অতি-অবিশ্যি আসবিই!

পরের দিন শতানন্দের কথামতো ঠিক সময়েই হসে হাজির হয়েছে ওরা তুজনে। রন্তিদেও আর মায়াবতী।

শুনেছে মহারাজের নির্দেশ-উপদেশ। জেনেছে মন-চরিত্র গঠনের অজানা ক্রিয়াকলাপ। মহামুদ্রাসাধনার। ভৈরবীতন্ত্রের সাধনমাহাত্ম্যও শুনেছে মন দিয়ে।

প্রাণ-মন-দেহ এক ক'রে নিষ্ঠা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী তু'জনে মিলে সাধনা করে গেছে। স্ত্রীলোকের মাতৃজ্ঞানের ধ্যানধারণার আসক্তির অনেকটাই কমেছে। বাকিটুকু গেছে বাইরের দেহে দৃষ্টি না দিয়ে ভেতরের কঙ্কালটাকে মনের চোখে দেখার অভ্যেসে। নিজের আকর্ষণ থেকে অন্যকে নিবৃত্ত করার জন্যে, নিজের ভেতরের কঙ্কাল ধ্যানেও সফল হয়েছে। ইচ্ছের সঙ্গে শতানন্দের বলা মন্ত্র মিলেমিশে এক হ'য়ে যায়। ...কঙ্কালরূপং মম্ শরীরং...। লোকে তার দেহের রূপ দেখে না তখন। দেখে একটা কঙ্কাল।

মায়াবতীকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরেছে রন্তিদেও সুস্থমনের হয়ে যেতে। ওর বাইরে বাইরে ঘোরার সখ মেটাতে কোন ত্রুটি করে নি মায়াবতী। পাহাড়ে সমুদ্রে তীর্থে—কোথায় না সঙ্গে নিয়ে গেছে। মায়াবতীর নিজস্ব শান্তি সুখ-তুঃখ বলতে কিছু ছিল না। মায়াবতীর সুখ বলতে রন্তিদেওয়ের সুখ। রন্তিদেওয়ের তুঃখ তার তুঃখ, রন্তিদেওয়ের শান্তি, তারই শান্তি।

একেবারে প্রকৃত আত্মসমর্পণ যাকে বলে, তাই। মায়াবতীর আত্মা-প্রাণ—রন্তিদেও। মায়াবতীর দেহটা নিজের। বাকি সমস্ত, মায় অনুভূতিটা পর্যন্ত রন্তিদেওয়ের।

সাধনা অভ্যেসের সময় কি না করেছে! বারে বারে মন নীচে নেমে গেছে রন্তিদেওয়ের। ওকে বাঁচাবার জন্যে আবার নিজে সেজে-গুজে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। যখন দেখেছে, হিতে বিপরীত হ'তে শুরু করেছে, রন্তিদেও তাকে নিয়েই উন্মত্ত, সাধন-ভজনের অন্তর্জলি হ'তে বসেছে, তখন সাজগোজ ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিজের ভেতরের কঙ্কালের ধ্যানে মগ্ন হয়েছে। নিজেকে শুধরে নিয়েছে রন্তিদেও। দেহের মোহ-আকর্ষণ কেটেছে।

এমন স্ত্রীকেও ধরে রাখতে পারে নি বেশীদিন রন্তিদেও।

নিজের দেহ নিজের মন নিজের সুখসুবিধেকে বরাবর বড় ক'রে দেখেছে রন্তিদেও। অন্য কারো ওপর কোন নজর দেয় নি। মায়াবতীর ওপরও কোন লক্ষ্য ছিল না তার। ফলে—মায়াবতীর শরীরে-মনে যথেষ্ট ধকল পড়েছে রন্তিদেওয়ের খেয়াল-খুশি মতো যখন-তখন এ-জায়গা ওজায়গা ঘুরে ঘুরে। নাওয়া-খাওয়া শোয়া-বিশ্রাম-ঘুম—কিছুরই সময় নেই। কেবল অনিয়ম আর অনিয়ম!

এত যা হবার তাই হয়েছে। অতিরিক্ত দুর্বল। হঠাৎই একদিন মাথা ঘুরে পড়ে যায়। আর উঠতে পারে নি। এই গুহার সামনেই এই ঘটনা ঘটে। এই পাহাড়েই তার নিয়তি লেখা ছিল। শয্যা নিয়ে সেই শয্যায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। শরীরে কিছুই তো ছিল না, কতদিন বাঁচবে—মাসখানেকের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

শয্যাগত অবস্থায় রন্তিদেওকে কিছুই বলতে চাইত না। অনেক পেড়াপীড়ি ধরাধরি করলেও না। কেবল একটি কথা মাঝে-মাঝে বলেছে, আমি চলে গেলে ভেঙে পড়বে না মোটে। মানুষের এটাই অবধারিত জানবে। মৃত্যুকে রোধ করতে পারা সহজ নয়। মৃত্যুর কোন বয়েস নেই জেনো। কেউ আগে আর কেউ পরে। যে যায়, তার জন্যে পাগল হ'লে, দাপাদাপি লাফালাফি করলে, কোন ফল হয়

না। হাজারো বার মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও ফিরে পাওয়া যায় না আর। ফিরে আসে না আর। অবধারিত বিষয়ে যাদের জ্ঞান টনটনে, তাদের শোক তাপ হারানোর ব্যথাবেদনা নেই। আর যাদের ধারণা আত্মা অমর—সত্যিসত্যি হোক আর না হোক—তাদের এতেই মস্ত সান্ত্বনা। কোন শোকের ছায়া ছুঁয়ে যায় না তাদের দেহ-মনের কোন-খানে। বিয়োগ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে তারা নির্লিপ্ত-নির্বিকার উদাসী-সন্ন্যাসী। দু'টো পথের মধ্যে তোমার মনে যেটা সায় দেয়, মন যেটা মেনে নেয়—সেটাই নিও তুমি। শান্তি পাবে। আমিও মরে শান্তি পাবো।

বলে, ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থেকেছে মায়াবতী রন্তিদেওয়ের মুখের দিকে। চাতকিনীর জল চাওয়ার মতো উত্তরের অপেক্ষায়। যে ক'টা দিন কোন উত্তর দেয় নি রন্তিদেও, সে ক'টা দিন তবু কঙ্কালসার মায়াবতীর দেহে প্রাণের সারটুকু ছিল। যেদিন যে মুহূর্তে বলে ফেলেছে রন্তিদেও, তোমার দু'টো উপদেশের মধ্যে প্রথমটাই আমার মনে ধরেছে। তুমি এসব ভাবনাচিন্তা ছেড়ে দাও এবার! তুমি নিশ্চিন্ত হোতে পারো। সম্পূর্ণ ভরসা রাখো আমার ওপর। কথা দিচ্ছি।

ফিক করে হেসেই চোখ বুজেছে মায়াবতী। চিরনিদ্রার শান্ত কোলে পরমশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে মায়াবতী।

মায়াবতী প্রায়ই বলতো রন্তিদেওকে, তুমি ছেড়ে দাও আমায় মন-প্রাণ থেকে। কেন মিছিমিছি আটকে রাখছো আর এ প্রাণসুদ্ধ কঙ্কালটাকে? আর প্রাণের মুক্তি হলে, কঙ্কাল রেখে দিও। কাজে লাগতে পারে। মন আনমনা হয়ে উঠলে।

আজ আপসোসের অন্ত নেই, রন্তিদেও নিজের ভাবনাচিন্তা থেকে মায়াবতীকে মুক্তি দেবার জন্যে কি ভুল করেই না নিশ্চিন্ত হবার আশ্বাস দিচ্ছে। পাকেপ্রকারে তাকে ছেড়ে দেয়ার কথাই তো বলে ফেলেছে সে। যেটা মায়াবতী চেয়ে চেয়ে পেয়েই থাকতো শুধু, হুকুম না পেয়ে হুকুমের অপেক্ষায়। হুকুম মিলতেই ছুটি নিয়েছে তক্ষুনি এক পলক দেরী না ক'রে।

রন্তিদেও জোরে নিশ্বাস ফেলে পেছন ফিরে তাকিয়েছে সযত্নে রাখা

মায়াবতীর কঙ্কালের দিকে। তারপর খুব আস্তে আস্তে যেন কতদূর থেকে ভেসে আসছে কণ্ঠস্বর—বলেছে, ওটিই আমার জীবনের জীবন, আত্মার সাধনা। ওর জন্যেই তুমি আজ রক্ষে পেয়েছো। ওরই জন্যে এদেহে কঙ্কাল দেখেছে দুর্বৃত্তরা, কঙ্কাল দেখেছে শিকারীরা। পালিয়েছে ভয়ে। ওরা আসবে না আর কেউ এখানে কখনো। যতদিন আমি থাকবো ততদিন।

একটু থেমে রন্তিদেও যাদবীর আপাদমস্তক বুলিয়ে নিয়েছে দু'চোখে। বলেছে, শিকারীরা ফলমূল খাবারদাবার দিয়ে যেত। তা আর দেবে না। না দিক। আমি আছি আর মায়াবতী আছে। আমার আর দরকার কি কাউকে!

রন্তিদেওয়ের নিজের মুখে এ যেন নিজেরই স্বীকারোক্তি। নিজের বুকের জমা ব্যথার কাহিনী। ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছে যাদবীর। রন্তিদেওয়ের দুঃখের অংশীদার হয়ে পড়েছে বুঝি শুনতে-শুনতে। বাবাকে বড্ড বেশী মনে পড়ছে এই মুহূর্তে।

বহু পুরনো গল্প।

তবু সত্যি হ'য়ে উঠেছে জাওরা পাহাড়ের এই রন্তিদেও সাধুর মধ্যে। বাবার মেয়ের ওপর নাকি বাড়াবাড়ি আদিখ্যেতা। মা-মরা মেয়ে যেন কারো ঘরে নেই আর। ওনার একাই অনাদরিণী যাদবী—ওই একটাই কেবল ভূভারতে। দ্বিতীয় জন্মায় নি নাকি এখনো। আকাশের ধ্রুব-তারা থেকে নেমে এসেছে একেবারে যাদবী। এ মেয়ের সঙ্গে কার তুলনা!

বাবা তো বিন্ধ্যপর্বত! আর যাদবী? যাদবী? ও বাব্বা। অগস্ত্য-ঋষি। বিন্ধ্যপর্বতের গুরু। গুরুর আদেশে মাথা তুললো না আর কখনো, এ হয়েছে তাই। মেয়ের কাছে সদাসর্বদা মাথা নত।—ও ম্যাগো! ঘেন্নায় মরি ঘেন্নায় মরি। বাড়ির লোকেরা যখন দু'চোখে কেউ দেখতে পারে না, তখন পাড়াপ্রতিবেশীর বড়দের দোসর হোতে কোন ক্ষতি নেই তো। ঘরবারে কান পাতার উপায় নেই।

যাদবীকে দেখলে এদের গায়ে জ্বালা ধরে। যাদবী বুঝি জল-

বিছুটি এদের। বাবা সদাশিব আপনভোলা। যাদবীকে বুঝিয়ে বলে, কে কি বলছে, কানে নেবে না। এতে ওদের লোকসান নয়। লোকসান তোমার। ওদের চিন্তায় তোমারই মন সংকীর্ণ হ'য়ে পড়বে। নিজেকে ছড়িয়ে বিলিয়ে দিতে পারবে না কোন ভালো কাজে।

বাবাকে প্রশ্ন করেছে যাদবী, তোমার মতো মানুষ হয় না কেন ওরা? আরে, মানুষের মতো চেহারা থাকলেই কি সবাই মানুষ নাকি! হেসে ফেলেছে যাদবী।—এমন কথা কোনদিন শুনিনি তো।

ভালো ক'রে শুনে রাখো। ভালো ক'রে মনে রাখো।

বাবা বলেছে, একটা গল্প বলি শোন। মন দিয়ে শুনে বোঝার চেষ্টা করবে। দেখবে মানুষের চেহারা এমন দিনের আলোর মতো তোমার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরিষ্কার হ'লে আর কারো ওপর রাগ-ক্ষোভ-অভিমান আসবে না কখনো। এসবের বদলে ভেতরে খালি শান্তি আর আনন্দ। শান্তি-আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকবে।

এবার গল্প আরম্ভ।

এক গুরুদেবের কাছে এক অনুগত শিষ্য গিয়ে রোজ ধন্না দেয়। বলে, বাবা! বয়েস হ'য়ে গেছে। কবে বলতে কবে চ'লে যাবেন। আমার কি হবে? আমি কি নিয়ে থাকবো! লোকের কাছে মুখ দেখাবো কি ক'রে—গুরুদেব কিছু দিয়ে যায় নি। কিছু দিয়ে না গেলে, আপনারই বা মান থাকবে কেমন ক'রে। হাপুসনয়নে কেঁদে সারা শিষ্য। কোন সান্ত্বনা কোন আদরই ভালো লাগছে না শিষ্যের। শিষ্য বলেছে, এই পাদপদ্মে প্রাণত্যাগ করবো কিন্তু। দেখবেন। দেখবেন একদিন।

শিষ্যের কান্নাকাটিতে গুরুদেবের মন ভিজেছে। ভেজা শুধু নয়, একেবারে গলা যাকে বলে। শিষ্যের চোখের জলে মন গলেছে। 'গুরুদেব অভয় দিয়েছে, নিশ্চয় তোকে দিয়ে যাবো। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

কি গুরুদেব?

কি? শুনবি? তবে শোন!

তোকে দু'টো মোক্ষম জিনিস দোবো। একটা—মানুষ চিনবি।

আর ?

আর একটা—সদগুরু পাবি।

শিষ্য শুনে আর চুপ ক'রে বসে থাকতে পারলো না। আনন্দে উন্মত্ত। দু'বাহু তুলে কি নাচ। একেবারে তাণ্ডবনৃত্য। ঘরের কোণে ঠাকুর-দেবতার ছবি সাজানো। নাচতে নাচতে কার বুকে লাথি কার মাথায় —এসবে হুঁশিবুদ্ধি নেই। শেষে পায়ের তালের ঠোক্করে এদিকের ছবি ওদিকে ছিটকে পড়ে ভেঙে খানখান। ওদিকের ছবির এদিকেও ওই একই অবস্থা। কার হাত কাটলো কার পা। কাটাকুটিতে রক্তারক্তি।

প্রলয়কাণ্ডে ঘরসুদ্ধু সকলে তটস্থ।

সকলে সমস্বরে আবেদন-নিবেদন, অনুনয়-বিনয় করেছে গুরুদেবের দরবারে।—দয়া ক'রে যা দেবার দিয়ে একে বিদেয় করুন গুরুদেব এখুনি। এখুনি এখুনি। দূর হোক আপদ চোখের সামনে থেকে। দেরী হ'লে মহাবিপদ।

গুরুদেব বলেছে ওদের, নিশ্চয়ই। এখুনি, ব্যবস্থা হচ্ছে ওর।

শিষ্যেরা হাততালি দিয়ে চোখ বুজে মাথা নেড়ে নেড়ে গুরুবন্দনা গাইছে।—'গুরুদেব দয়া কর দীনজনে···।'

উন্মত্ত শিষ্যকে জাপটে ধরে শান্ত করেছে বসিয়ে। দেয়ালে ঝোলানো গেরুয়া ঝোলা থেকে একটা পালক বার ক'রে শিষ্যের কানের পাশে গুঁজে দিয়ে বলেছে, যা!

'পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি' বলে আনন্দে দিশেহারা হয়ে, ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে শিষ্য।

শহরের রাস্তায় এসে সে যেন যমের দক্ষিণ দোরে পড়লো। বাপরে বাপ! জীবন সংশয় ব্যাপার একেবারে। মোটর নিয়ে সিংহ কেশর ফুলিয়ে তেড়ে আসছে। ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে বাঘ। রিক্সা নিয়ে ভাল্লুক। লরী নিয়ে ময়াল-অজগর। কি ভীষণ দৃশ্য চতুর্দিকে। যেদিকে চোখ ফেরাচ্ছে, যেদিক দিয়ে পালাতে চেষ্টা করছে, সেই দিকেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখছে। মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু। প্রাণভয়ে কোন লুকোবারও স্থান খুঁজে পাচ্ছে না। এদিকে পেরিয়ে ওদিকে গড়িয়ে

সেদিকে হামাগুড়ি দিয়ে পালাচ্ছে। কোত্থেকে একটা বুনো বানর লাফাতে লাফাতে এসে শিষ্যের দু'গালে কষে চড় বসিয়ে দিয়েছে। হাতের ওপর থেকে নিচে অবধি আঁচড়ে ফালা ফালা ক'রে রক্ত ঝরিয়েছে।

শিষ্য মধুসূদন-মধুসূদন জপ করছে মনে মনে। এর ওপর দিয়েই যেন মৃত্যুযোগ কেটে যায় তার। আর বেশী কিছু না হয় যেন। বিপদে মধুসূদন, বিপদে মধুসূদন।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে কখন অজপাড়াগাঁতে ঢুকে পড়েছে। পায়ে পায়ে একটা ব্যাধের দোকানের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে একটু নিশ্চিন্ত একটু নির্ভয়। কোন ঝামেলা নেই। কোন হিংস্রপশুর উৎপাতের-আক্রমণের কোন ভয়ডর নেই।

এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে মন সরছে না উপস্থিত। ভয় —আবার না মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়ে।···সারাটা দুপুর চলে গেছে শিষ্যের মাথার ওপর দিয়ে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখেছে ব্যাধের এক-ঘেয়েমি কাজ। দায়ে মাংস কাটা আর বেচা আর খদ্দেরের কাছ থেকে পাইপয়সা গুনে নেয়া।

সন্ধে হয়ে এলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে দেবার আগে ব্যাধ বিষ্ণুর ছবির সামনে সারাদিনের হিসেব-নিকেশ জমা রেখে, জোড়হাতে বলেছে, দোষ-অন্যায় কিচ্ছু জানি না প্রভু। তোমার কাজ তুমি করিয়ে নিয়েছো আমার মধ্যে দিয়ে।

ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে ব্যাধ।

এরপর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না একা-একা। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিকে। আলোয় টান ধরছে খুব তাড়াতাড়ি। ওখান থেকে ফেরার পথে পা বাড়িয়েছে শিষ্য।

গুরুদেবের কাছে যখন ফিরেছে, তখন ক্লান্ত-অবসন্ন দেহ। পা টলছে, মাথা ঘুরছে। ধড়াস ক'রে আছড়ে পড়েছে গুরুদেবের পায়ের কাছে।

মুখে জল আছড়ে তালপাতার পাখার বাতাসে হাওয়া ক'রে গরম-

গরম দুধ খাইয়ে গুরুদেব সুস্থ-স্বাভাবিক ক'রে তুলেছে।

হতাশার সুরে বলেছে শিষ্য, কিছুই হ'ল না গুরুদেব। না চিনলুম মানুষ, না পেলুম সদগুরু।

কেন? মানুষ চিনিস নি?

কোথায়! গাড়ি ঘোড়াতে তো সিংহ-বাঘ।

বেশ! মানুষ দেখিস নি?

কই!

কেন—ব্যাধ।

ব্যাধ মানুষ!

হ্যাঁ, ব্যাধকে তো আর ভাল্লুক-বানর মনে হয় নি তোর? মানুষের দেহ মানুষের মন আর মানুষের কথাবার্তাই তো পেয়েছিস ব্যাধের মধ্যে—কেমন, তাই না?

হ্যাঁ। সে না হয় হ'ল। মানুষ। কিন্তু সদ্‌গুরু?

ওই, ওই ব্যাধই। সমস্ত কাজ যে তার কাজ বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস ক'রে, ক'রে যায়—সেই সদ্‌গুরু।

বাবার গল্পটা যাদবীর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে এই নিরালা পাহাড়ের বুকে। দিনদুপুরে। লোভী কামনা-পাগল হিংস্রপ্রকৃতির ভয়াবহ বন্যদের দেখেছে বীররাজের মধ্যে, আর তার প্রিয় সাগদেরদের ভেতর। আবার যাদবীকে রক্ষাকর্তার ভূমিকায় এগিয়ে এসেছে দেবমনের শিকারীরা।

সবার ওপরে, সব দেবের ওপর যে মহাদেব, সে-ও জীবন তুচ্ছ ক'রে দু'জনের অস্ত্রের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। রন্তিদেও। ওরা নড়েনি দেখে, তার সাধনার ফল—কঙ্কাল সাধনার কঙ্কাল চিন্তার প্রভাব প্রয়োগ করতে হয়েছে শেষ অবধি। তার জায়গায় কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে দেখে, পালাতে পথ পায় নি ওরা। রন্তিদেওই যাদবীর দেবাদিদেব মহাদেব জীবনদাতা পিতা।

এই জীবনদাতা পিতার জীবন থাকবে কেমন ক'রে আর! ক'দিন না খেয়ে খেয়ে বাঁচতে পারে মানুষ! যেমন দুর্বৃত্তরা ভয় পেয়েছে,

তেমনি শিকারীরাও। শিকারীরাও কঙ্কাল দেখে, ভূত ভেবে নিয়েছে। ওরা আর রন্তিদেওয়ের ধারেকাছে আসবে না কখনো। রন্তিদেও নিজেই যাদবীকে জানিয়ে দিয়েছে। রন্তিদেওয়ের পেটপূরণের জিনিস ওরাই দিয়ে গেছে বরাবর।

বাবা চলে যাবার পর যাদবীর সব টানই ছিন্ন হয়ে গেছে বাড়ি থেকে। ফিরে আর কি হবে। তার চেয়ে প্রকৃত মানুষের আশ্রয়ে থাকাটাই উচিত যাদবীর। রন্তিদেওকে ছেড়ে যাবে না যাদবী।

এই এক জায়গায়ই জিদ রইল না যাদবীর।

রন্তিদেও রাজী হয় নি। যাদবী থাকবার জন্যে কাতর অনুরোধ করেছে অনেক। ভীষ্মের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রন্তিদেওয়ের। না। না না না।

নিজের অভিজ্ঞতার নিজের সাধনাসিদ্ধির ক্রিয়াকলাপ শিখিয়ে দিয়েছে রন্তিদেও। যাদবীর আত্মরক্ষার—কঙ্কাল ধ্যানের সাধনা।

বলেছে রন্তিদেও, নির্ভয়ে-নিশ্চিন্তে যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও তুমি। আর ভয় নেই কোন।

যাদবী কেঁদে বলেছে, সাধনার চেয়ে অনেক বড় আপনি আমার কাছে মহারাজ। আপনার সঙ্গলাভই আমার সাধনা। তাড়িয়ে দেবেন না আমায়, সরিয়ে দেবেন না আমায়।

পায়ে মাথা রাখতেই যেন শক্ত কি একটা জিনিসের ওপর মাথা রেখেছে মনে হল। মাথা তুলে চাইতেই একটা ধাক্কা খেয়েছে। কঙ্কাল। দেখতে পাচ্ছে না আর রন্তিদেওকে। বসে আছে কঙ্কাল। সব জানলে, সব শুনলেও কে আর চায় রক্তমাংসের মানুষটাকে না দেখে একটা কঙ্কাল দেখতে! কার আর ভালো লাগে!

কাঁদছে আর বলছে যাদবী, মহারাজ! একবারটি দেখতে ইচ্ছে করছে বড্ড।

গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে বেজেছে যাদবীর।—জেদাজেদি করলে এই কঙ্কালই দেখতে হবে তোমাকে। আমাকে দেখতে হবে না আর কখনো, কোনদিন। বিরক্ত না ক'রে আর অপেক্ষা না ক'রে ফিরে যাও। আমার ক্রিয়াকলাপেই আমি থাকবো সঙ্গে সঙ্গে। অভ্যেস ক'রে যেও।

নিজেকে নিজে তৈরী ক'রে যাও! কেউ কারো সম্বল নয়। নিজেই নিজের সম্বল।

উঠে দাঁড়িয়েছে যাদবী।

না, আর থাকবে না। এখুনি চলে যাবে সে। রন্তিদেওকে না দেখে কঙ্কাল দেখতে চায় না, চায় না।

দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে নীরবে নামছে যাদবী আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে। বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা। বাবার কাছ ছাড়া আজ বছর দুয়েক। বুকটা এতখানি খালি হ'য়ে যায় নি তো এতদিন। বরাবর মনে হয়েছে বাবার আদরের আশ্রয়ে আছে সে! আজ প্রকৃত আশ্রয়-হীন হ'য়ে পড়লো বুঝি যাদবী। নিজের আশ্রয় নিজেই হ'য়ে থাকতে হবে।···

চলতে চলতে যাদবী শুনছে রন্তিদেওয়ের বলা কথা।

একনাগাড়ে শুনে যাচ্ছে মনের কানে।

আমার ক্রিয়াকলাপেই আমি থাকবো সঙ্গে সঙ্গে।···থাকবো সঙ্গে সঙ্গে···থাকবো সঙ্গে সঙ্গে···।

স্মৃতিরেখা।

স্মৃতিরেখা অতনু আর প্রকাশসাধু।

এদের তিনজনকে নিয়ে মস্ত বিভীষিকা নেমেছে অমাবস্যার নিশুতি-রাতে—শ্মশানের চিতার আগুনে।

সেই বিভীষিকার মেঘ কেটেছে,—না, না!

এক একটা অধ্যায়ে-অধ্যায়ে সে-করুণ কাহিনীর পথযাত্রা।

এক একটা ঢাকির মূর্তি কি বীভৎস ধরনের হোয়ে উঠছে।

ভয়ে বুক কেঁপে উঠছে স্মৃতিরেখার। মনে হোচ্ছে বাজনার শক্ত-কাঠি ঢাকের চামড়ার ওপর না পড়ে তার বুকের চামড়ায় জোরে জোরে আঘাত হানছে। প্রত্যেকটা পাঁজরা ভেঙে খান খান হোয়ে যাবে বুঝি।

অদ্ভুত অনুভূতি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

দুর্গাপুজো অনেক জায়গায় দেখেছে, এরকম দ্যাখে নি অন্য কোথাও। অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে নয়। মাঝরাতে পুজো-বলি। বলির সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠার চামড়া ছাড়িয়ে টুকরো-টুকরো কোরে কেটে যোগিনীদের নিবেদন। পাটুলীগাঁয়ের মঠবাড়ির পুজোর এইটাই রীতি। মূর্তির গণেশ-কার্তিকও সাধারণ নিয়মে বোসে নেই। দুর্গার ডাইনের জায়গায় বাঁয়ে গণেশ। আর বাঁয়ের জায়গায় ডাইনে কার্তিক। হুগলীর নাম করা গাঁয়ের মধ্যে এই গাঁয়ের শুধু এমন।

ঠাকুর দেখতে এসে পুজো দেখতে এসে কোথা লোকে একটু আনন্দ পাবে, একটু শান্তি পাবে—তা নয়। আনন্দ তো দূরের কথা—বিষন্ন

অবসাদে মন ভার হোয়ে উঠছে। প্রবল অশান্তি দাপাদাপি কোরছে ভেতরে। কিসের অশান্তি, কেন অশান্তি—কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। মোটকথা ভালো লাগছে না কিচ্ছু। কিচ্ছু না।

আকাশ ফাটিয়ে বাতাস চিরে মাটি কাঁপিয়ে আবার কানে তালা-ধরানো ঢাকের বাজনা বেজে উঠলো। ঢাকিরা যেন মহাশ্মশানের প্রেত। প্রেতেরা নৃত্য কোরছে পৈশাচিক উল্লাসে। 'মা-মা' শব্দে বলি হোল। পাঁঠা বলি নয়, নরবলি। রক্তমাংসের নর নয়। পিটুলির তৈরী মানুষ।

এতে চঞ্চল হবার কথা নয়। কিন্তু ভীষণ চঞ্চল হোয়ে উঠেছে স্মৃতিরেখা। একটা ব্যথার মোচড়ের অসহ্য যন্ত্রণা ভেতরে। সমস্ত শরীর অবশ, দেহটা বড্ড হালকা ঠেকছে। সব শক্তি লোপ পেয়ে যাচ্ছে হয়তো তার!

এমন দৃষ্টিভ্রম হোচ্ছে কেন, পিটুলির মানুষটার জায়গায় অতনুকে দেখছে কেন? সকলের 'মা' ডাকে অতনুর কণ্ঠস্বর শুনছে না! সকলের গলার আওয়াজ ছাপিয়ে ওরই তো গলার আওয়াজ কানে এসে বাজছে! আকুল স্বরে ডাকছে অতনু।

পুজো ছাখা হোল না আর স্মৃতিরেখার।

পাগলের মতো ছুটে চলেছে বাড়ির দিকে।

মাথাটা সত্যিসত্যি বিগড়লো নাকি স্মৃতিরেখার?

কখনো পেছনে কখনো সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে পূর্ণপ্রকাশ! অতনুর কাছে পৌঁছুতে দেবে না তাকে কিছুতেই! বাধা সৃষ্টি কোরছে কেবল। বড় বড় চোখে তাকাতেই অদৃশ্য হোয়ে যাচ্ছে। এও কি সম্ভব? রক্তমাংসের মানুষ অদৃশ্য নিমেষে। না না। চোখের ধাঁধা শুধু। সকালের তিক্ত ঘটনার ছবিই মনের গভীরে খোদাই হোয়ে বোসে গেছলো। তারই অগোছাল প্রকাশ এদিক-ওদিকে—কল্পনার রাজ্যে। আবোল-তাবোল ভাবনার বিচ্ছিরি রূপ।

এসব ছাখাশোনা মিথ্যে, মিথ্যে মিথ্যে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেছে স্মৃতিরেখা।

ঘরে এসে স্তব্ধ পাথর।

অতনু ধনুষ্টঙ্কারের মতো বেঁকে যাচ্ছে, গুটিয়ে যাচ্ছে। আর চিৎকার কোরছে, মা! বাঁচাও বাঁচাও। প্রকাশসাধু মেরে ফেলছে, মেরে ফেলছে আমায়।

ঝাঁপিয়ে পড়েছে ছেলের বুকের ওপর মা।

অনেক চেষ্টা কোরেছে সুস্থ কোরে তুলতে। পারে নি। সাধ্যের বাইরে। যন্ত্রণার এতোটুকু লাঘব হয় নি।

কেবল বিভীষিকা দেখে চিৎকার কোরে উঠছে অতনু। আর বোলবো না অমন কথা। আর বোলবো না। আর নয়, আর নয়। সারা শরীর থরথর কোরে উঠছে অতনুর।

গলায় আঁচলের খুঁট জড়িয়ে জোড়হাত কোরে স্মৃতিরেখা তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে প্রার্থনা কোরেছে, ক্ষমা চেয়েছে। মানত মেনেছে সুস্থ কোরে তোলার জন্য অতনুকে।

দেবতারা কেউ কোন কথা শোনে নি। মানতের লোভেও ভোলে নি। যথা পূর্বং তথা পরং। এ যন্ত্রণার শেষ নেই বুঝি। সীমাহীন যন্ত্রণা। চোখে ছ্যাখা যায় না।

সত্যিই দুর্বাক্য বলার কি ফল এটা?

ছেলেকে নিয়ে স্মৃতিরেখা, সাতসকালে গেছলো পূর্ণপ্রকাশের কাছে। বেলা হোলে ভিড় বাড়বে। ব্যস্ত হোয়ে পড়বে। কোন কথাই হবে না আর। তাই সূর্য ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে।

এসে ছ্যাখে, একা-একা বোসে কি চিন্তা কোরছে পূর্ণপ্রকাশ। ঊর্ধ্বদৃষ্টি।

প্রণাম কোরতে চিন্তার সুতোয় টান ধরেছে। নিচের দিকে তাকিয়ে বোলেছে, এটি তোমার ছেলে?

হ্যাঁ, বাবা! এর মুখ চেয়েই বেঁচে আছি। পাঁচে পড়তে না পড়তে বাপ তো সকলের মায়া কাটিয়ে চলে গেলো। ছেলে মানুষ করার দায়-দায়িত্ব পড়ে গেলো এই অভাগিনীর ওপর। স্মৃতিরেখার সিঁথির সিঁদুরের দিকে লক্ষ্য পূর্ণপ্রকাশের। টকটকে লাল, অথচ মায়া কাটিয়ে—

নজর এড়ায় নি স্মৃতিরেখার।

পূর্ণপ্রকাশের বিস্ময়ে ডোবা দু'চোখের তারার দিকে তাকিয়েই বোলেছে, মায়া কাটানো বোলতে—স্ত্রী-পুত্রের দায়িত্ব নেয়ার পথ থেকে সরে দাঁড়ানো। এমন সরে দাঁড়ানো যে একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিয়ে করেছিলো স্ত্রীভাগ্যে ধনরত্ন পাওয়ার আশায়। জুয়ার নেশায় বুদ্ধিভ্রংশে সব খুইয়েছে। যতো দোষ নন্দঘোষ। স্ত্রীর দোষেই তার বিপর্যয়। আর ছেলেটার তো রাহুর দশায় জন্ম। সাক্ষাৎ রাহু। জন্ম থেকে সমস্ত গ্রাস কোরে ফেলছে। এই মায়ার সংসারে থাকা আর যুক্তিযুক্ত নয়।

সংসারে বীতরাগের হেতু নাকি সন্ন্যাস গ্রহণ।

এদিকে শোনা যায় বহু শিষ্যসাবুদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। যেমন সাজসজ্জা, তেমনি খাওয়াদাওয়া। বিলাসে মগ্ন দিনরাত। শিষ্যদের মধ্যে মাহাত্ম্যকীর্তন কতো না। তাদের প্রভু মায়া-মোহের ঊর্ধ্বে। স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ। এতো বড় ত্যাগ কি যার-তার দ্বারা সম্ভব! কতো শক্তি! স্ত্রী-পুত্রের নামে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। চোখ বুজে বিড়বিড় কোরে ইষ্টনাম জপ করে।

মৃদু হেসে ব্যঙ্গের সুরে বোলেছে স্মৃতিরেখা, উনি নাকি দয়ামায়ায় গড়া। ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ—কারো ওপর কমতি নেই। কেবল স্ত্রী-পুত্রের জমার খাতায় একেবারে শূন্য। এটা নাকি ওনার নির্দয়মনের পরিচয় না। মোহমুক্তির প্রমাণ।

স্মৃতিরেখার গলার সুরে বিশেষ অনুনয়।—এবার আপনি কিছু বলুন! কষ্টে-সৃষ্টে বছর দশেক ধরে ছেলেটাকে মানুষ কোরছি। এখন পনেরো। কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু ঘটে আছে বোলে তো মনে হয় না। মায়ের ব্যথা তো বোঝেই না, নিজের ব্যথা বোঝে কি না—সে বিষয়ে সন্দেহ আমার। শুনেছি, আপনি বাকসিদ্ধ পুরুষ। যা বলেন, ফলে। আশীর্বাদ করুন, যেন মানুষ হয়। বাপের ধাত না পায়। বাপকে নিয়ে শান্তি পাই নি। একে নিয়ে অন্তত যেন পাই। এইটুকু চাই।

মাথায় রক্ত উঠেছে অতনুর। কান-কপাল লাল। বেশ জোরেই

বোলেছে, উনি কি কোরবেন ? ওঁরও তো সাজগোজ কম নয়। অপরের দুঃখকষ্ট বুঝবেন কি কোরে! আর উনি বললেই কি সব হোয়ে যাবে নাকি! উনি তো একটা মানুষ। ওর কি ক্ষমতা?

পূর্ণপ্রকাশের মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর হোয়ে উঠেছে।

জিভকেটে নাক-কান ম'লে স্মৃতিরেখা বোলেছে, ও অবোধ বাবা। ক্ষমা কোরবেন।

ভারীগলায় বোলেছে পূর্ণপ্রকাশ, একটু সভ্যতা শেখো ধন! বড়দের এভাবে বলা উচিত নয়। ফল খারাপ হোতে পারে।

পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত বিদ্রোহী মনের ছেলে অতনু ক্ষেপে উঠেছে দ্বিগুণ। —ওসব খারাপটারাপ ভয় করে না অতনু।

গলার স্বরে উত্তেজনা ফেটে পড়েছে পূর্ণপ্রকাশের।

—ঠিক আছে। আমার চোখের সামনে থেকে এখুনি চলে যেতে বোলছি, চলে যাও শীগগির।

মেঝেয় চারকোণা ছোট্ট গদি পাতা। তার ওপর লাল ভেলভেটের আসন। দু'পাশে-পেছনে লাল ভেলভেটের তাকিয়া। তাকিয়া ঠেসান দিয়ে আসনে আরামে বোসেছিলো পূর্ণপ্রকাশ। উঠে পড়লো। দশাসই পুরুষ। রাগে সর্বশরীর কাঁপছে।

কি বোলতে যাচ্ছিলো স্মৃতিরেখা, মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো। বলা আর হলো না। মাকে বলতে দেয় নি অতনু। মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হিড়হিড় কোরে টানতে টানতে ঘরের বাইরে বার কোরে নিয়ে এসেছে।

সকালের এই ঘটনা!

রাতে অতনুর সাংঘাতিক অবস্থা। জীবন-মরণ সমস্যা হোয়ে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয় পূর্ণপ্রকাশের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহারের ফল। মনস্থ কোরেছে স্মৃতিরেখা, নিয়ে যাবে অতনুকে পূর্ণপ্রকাশের কাছে। নিয়ে যাবে এই অবস্থায়। দেখবে, পাথুরে বুক গলে কিনা পূর্ণপ্রকাশের। সাধুর এত রাগ! এরা নাকি জ্ঞানীগুণী! একটা বাচ্চার কথায় লঘু পাপে গুরুদণ্ড একেবারে।

এখুনি এই রাতেই নিয়ে যাবে স্মৃতিরেখা।

পূর্ণপ্রকাশের পরমভক্ত স্মৃতিরেখাদের প্রতিবেশী ছেলেটির সাহায্যে নিয়ে গেছে অতনুকে।

বাড়িতে ছাখা মেলে নি।

শ্মশানে নাকি কি ক্রিয়াকলাপ কোরতে গেছে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে পৌঁছেছে ওরা।

নিশুতি রাতে ভয়ঙ্কর দৃশ্য। চিতার শিখা উঠছে লকলক কোরে। মড়াপোড়া আগুনের শিখা নয়। হোমের আগুন জ্বেলেছে চিতায় পূর্ণপ্রকাশ। কি সব মন্ত্রে বিড়বিড় কোরে আহুতি দিচ্ছে। সামনে একটা লাল হ্যাকড়ার পুতুল শোয়ানো মাটিতে। হাত-পা লালসুতোয় বাঁধা চারকোণের চারটে পোঁতা খোঁটায়।

অতনুকে আর কিছুতেই সামলাতে পারলো না সঙ্গের জওয়ান ছেলেটি।

ধড়াস কোরে পড়ে গেছে অতনু।

আশ্চর্য! ঠিক লাল ন্যাকড়ার পুতুলটার পাশে একেবারে। বেহুঁশ।

বুকের ওপর আছড়ে পড়ে চিৎকার কোরে কেঁদে উঠেছে স্মৃতিরেখা। শতমায়ের ব্যথা-বেদনার হাহাকার—সব হারানোর বুকফাটা কান্না এ যে! নিশুতি রাতের বুক চিরে শ্মশানের কোলে ভীষণ আলোড়ন তুলেছে!

পূর্ণপ্রকাশ মুখ ফেরালো।

এগিয়ে গিয়ে পা তু'টো জড়িয়ে ধরেছে স্মৃতিরেখা।—বাবা! এ মেয়ের কোল থেকে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিলে যদি শান্তি পান, নিন, নিন নিন। মা হোয়ে নিজেই হাতে তুলে দিতে এসেছি। এভাবে না মেরে একেবারে মেরে ফেলুন। একেবারে মেরে ফেলুন!

পাষাণ কি গলে? সত্যিসত্যিই কি গললো?

পূর্ণপ্রকাশের চোখের কানায় কানায় জল ভরে উঠলো নিমেষে!

কি দেখছে পূর্ণপ্রকাশ জলভরা চোখে! আবছা-আবছা নয় তো। স্পষ্ট। একদম দিনের আলোর মতো স্পষ্ট-পরিষ্কার দৃশ্য। এই

রাতের মা-ছেলে যে তার অনেক দিনের চেনা। ভুল ? না না। একটুও ভুল নয়। সেদিনের শ্মশান আর এ দিনের শ্মশান। তফাৎ কোথায়। শ্মশান শ্মশানই। খালি জায়গার হেরফের। ক্রিয়াকলাপ ? ক্রিয়াকলাপ একই। সেই আগের রাতের। ভিন্ন মত ভিন্ন পথ ভিন্ন ধরনের নয়।

কুসুমলতা !

হতভাগিনী কুসুমলতা সে-শ্মশানে এসেছে। এসেছে প্রবালকে সঙ্গে নিয়ে। নদীয়ার বেলগাঁয়ের শ্মশানে। অঝোর ঝরে কেঁদেছে কুসুমলতা। মুমূর্ষু প্রবালকে পায়ের কাছে রেখে আকুল আবেদন জানিয়েছে কাতরনয়নে।—দিনের পর দিন যন্ত্রণা পেয়ে পেয়ে শেষ হোয়ে যাবার চেয়ে একেবারে শেষ কোরে দিন বাবা! আমি আর পারছি না দেখতে। আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হোক বাবা! পূর্ণ করুন।

ত্রিগুণসাধু আপাদমস্তক চেয়ে চেয়ে দেখেছে কুসুমলতাকে। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে। তারপর প্রবালের দিকে তাকিয়েছে। দৃষ্টি প্রবালের মাথা থেকে পা, পা থেকে মাথা অবধি ওপর-নিচে কোরেছে বারতিনেক।

কি দোষে প্রবালের ওপর এত কোপ ত্রিগুণসাধুর ?

এ এক রহস্যের মোড়কে মোড়া ঘটনা।

ঘটনার সূত্রপাত কুসুমলতাকে ঘিরেই।

নিশিরঞ্জনের বাড়ির কোন লোকই সুনজরে দেখতো না কোনদিন কোনসময়। একমাত্র নিশিরঞ্জনের মা ছাড়া। মায়ের কুসুমলতার ওপর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিলো। ভালোবাসাও কম ছিলো না। এর জন্য অন্য ছেলে-বৌয়ের কাছে কম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয় নি। তবে দাপটের ওপর চলতো বোলেই কেউ কোন ক্ষতি কোরতে সাহস করে নি কুসুমলতার। অবিশ্যি মা যতোদিন বেঁচেছিলো, ততোদিন অবধি।

পয়সাকড়ি-বাড়িগাড়ি থাকতেও কি যে দুর্মতি চেপেছিলো নিশিরঞ্জনের মাথায়, তা নিশিরঞ্জন নিজেও প্রথমে অতটা খেয়াল কোরে উঠতে পারে নি। সাদাসিধে মানুষ, বড্ড লোককে বিশ্বাস কোরে ফেলতো। বন্ধুবান্ধবকে ভালোবাসতো অতিরিক্ত। বন্ধুবান্ধব সর্বস্ব।

ওদের পরামর্শেই শেষ পর্যন্ত অপদস্ত-অপমান হোতে হয় নি কম। এক বন্ধুর দেনা শোধ করতে গিয়ে যতো অনাসৃষ্টি। যতোই দেয়া যাক। যেমন দেনা তেমনিই থাকছে। শোধ আর হচ্ছে না। কি কোরে হবে! যা দেয়া হচ্ছে, সে তো কেবল সুদের সুদ। আসল আর আসলের সুদ পূরণ হয়েছে কোথায়!

মায়ের কাছে আরজি পেশ কোরেছে নিশিরঞ্জন। ঋণমুক্তি কর বন্ধুর।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মা বেঁকে বোসেছে একদম। স্নেহে যেমন নরম, তেমনি শাসনে দারুণ শক্ত মা। মা বোলেছে, ওটা হতচ্ছাড়া। জীবনে ওর দেনাপত্তর শোধ হবে নাকো। মানা কোরেছে নিশিরঞ্জনকে ওর সঙ্গে মেলামেশা কোরতে। সমস্ত বিষয়-আশয় বিকিয়ে দিলেও ওই ঋণের বোঝা লাঘব হবে না কখনো।

মায়ের কাছ থেকে বিমুখ হবার পর, যতো শলাপরামর্শ করেছে নিশিরঞ্জনের বন্ধুদের সঙ্গে। ওদের সিদ্ধান্ত শুনে আঁতকে উঠেছে কুসুমলতা।—এ পথে যেও না। পদে পদে বিপদ। বংশের মান-মর্যাদা সমস্ত নষ্ট হোয়ে যাবে।

কান্না নিষেধ অনুরোধ, সব বৃথা হোয়ে গেছে কুসুমলতার।

বন্ধুদের প্ররোচনায় সুপুরুষ নিশিরঞ্জন রাজার ভূমিকায় অভিনয় শুরু কোরে দিলো। দেশে নয় কলকাতা শহরে গিয়ে। বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে চললো মানুষকে ফাঁদে ফেলে সম্পত্তি হাতানোর ফন্দি। বন্ধুরা বেছে-বেছে রহিসদের নিয়ে আসছে রাজাদর্শনে।

রাজার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ প্রত্যেকে।

উদার মেজাজি রাজার সঙ্গে বাজি রেখে তাসের জুয়ায়।

জিতেছে অনেকে। বিজয়ীরা খুব খুশি।

ওদের কেউ-কেউ বোলেছে, রাজা বড় বোকাগোছের লোক। গাঁও-ঘরের রাজা তো! খেলায় মেতে টাকা ওড়ানোর নেশা এটা স্রেফ। আখেরে বুঝবে'খন। যখন সব ফুটকড়াই হোয়ে যাবে। বাছাধন কেঁদে কূলকিনারা পাবে না।

যারা বোলেছিলো নিজেদের মধ্যে, তারাই দিনকয়েক যেতে না যেতেই হেরে ভূত একদম। এ ব্যবসা চলছিলো ভালো, কিন্তু কাল হোল, যাকে টাকা দেবার কথা, তাকে নিয়ে। যা আসছে সমস্ত তার। অন্যেরা অসন্তুষ্ট হোয়ে উঠেছে। তাদেরও দিতে হবে। চতুর্দিকে ঘিরে হাত সাফাইয়ে সাহায্য করে কারা! তাদের জন্যই তো জেতা।

মতান্তর হোতে হোতে নিজের স্বার্থটাই প্রবল হোয়ে উঠেছে ওদের। লোভ হিংসে ক্রোধ। তিনটের দাপট বেড়ে উঠলো। বাড়লে, যা হবার—তাই হোয়েছে। প্রবঞ্চণা রাজ্যের হদিশ বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ হোয়ে পড়েছে।

ধরা পড়ে গেছে সকলে।

নিশিরঞ্জনকে কয়েদবাস কোরতে হোয়েছে বেশ কিছুদিন।

সে-সময় মা-ই কিন্তু দেখেছে কুসুমলতাকে। প্রবাল তখন এসে গেছে ওর দেহে। কাজের লোকদের পাঠিয়ে পাঠিয়ে সকাল দুপুর রাত্তির—খবর নিয়েছে মা। প্রতিটি দিন জলখাবার থেকে শুরু কোরে সমস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে। কোন ত্রুটি রাখেনি কোনখানে।

নিজের পুত্রবধূর মতোই কুসুমলতাকে মা স্নেহের চোখে দেখেছে।

যতোদিন মা বেঁচে ছিলে, ততোদিন কারো সাধ্যি হয় নি কুসুমলতার নামে কোন অপবাদ রটাতে। সাহস করে নি। চলে যাবার পরই চতুর্দিক থেকে কলঙ্ক-অপযশের মুষলধারা নেমেছে তার ওপর। মায়ের আগেই নিশিরঞ্জন চলে গেছে। কয়েদখানা থেকেই শরীর ভাঙতে শুরু কোরেছিলো। বাড়িতে আসার পর আরো খারাপের দিকে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে শেষ হোয়ে গেছে, শেষ হোয়ে গেছে না বোলে, অনুশোচনায় দগ্ধে দগ্ধে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ কোরে নিজেকে

নিজেই শেষ কোরেছে বলা যায়। নিশিরঞ্জন থাকলেও বোধ হয় কুসুমলতার গায়ে এতো কালিমাখানো কেন, একবিন্দুও ছিটোতে পারতো না কেউ। সে আপনই হোক আর পরই হোক।

নিশিরঞ্জনের ভায়েদের কারোই বিবেকের উদয় হয়নি। তাদেরই এক ভায়ের স্ত্রী যে কুসুমলতা—এ স্বীকৃতিও দেয়নি ওরা। দিতে চায় নি। এমনকি বাপের মুখের পুরো আদল থাকা সত্ত্বেও, ভায়ের ছেলে বোলে মেনে নিতে চায় নি। মা কিন্তু স্বীকৃতি দিয়ে গেছলো। এদের মনোভাব জানতে পেরেই প্রবালকে সম্পত্তির কিছু অংশ দিয়েছে মা।

যত ঝামেলা সেই অংশটুকু নিয়েই।

এক একটা অস্ত্রপ্রয়োগ হোতে লাগলো কুসুমলতা ওপর।

প্রথম অস্ত্রে কুসুমলতা কেঁদে সারা। এ-ও শুনে যেতে হোল তাকে জীবদ্দশায়।

নিশিরঞ্জন ছাড়া ধ্যানে-জ্ঞানে অন্য কোন পুরুষের চিন্তা আসে নি কুসুমলতার মনে কোনদিন কোন সময় ঈশ্বর যদি সত্যিসত্যি থাকে কেউ, তবে এমন কথা বোলে বেড়ানোর বুকের হয় পাটা কি কোরে লোকের। এতোদিন বাদে কুসুমলতা নিশিরঞ্জনের রক্ষিতার পর্যায়ে পড়লো শেষে।

হ্যাঁ, অস্বীকার কোরছে না কুসুমলতাযে, সে নিশিরঞ্জনের বিয়ে করা বৌ নয়। কিন্তু—কিন্তু ওদের বাড়ির গুরুদেবই তো বোলেছে, বাইরে বিয়ে মাসীমারদের প্রমাণ রাখা। তাই অতো জাঁকজমক, অতো অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি। জ্ঞাতিগুষ্টি আর বামুন-পুরোহিতকে নিয়ে এসে ঘনঘটা। আসল বিয়ে মনে। একজন একজনকে স্বামী হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে মন থেকে মেনে নেয়াটাই আসল বিয়ে।

গুরুদেব স্পষ্ট শুনিয়েছে নিশিরঞ্জনকে। নিশিরঞ্জনের মাকে, কুসুমলতাকে। কুসুমলতার বাড়িতেও এসেছে গুরুদেব শুভ-আশীর্বাদ কোরতে।

গল্পটা অনেকে বলে মহাভারতে পরে হয়তো যোগ করা হোয়ে থাকতে পারে। অনেকের নিজের মতে ছাপানোর দরুন। সে যাই

হোক, গল্পটিতে মন নিয়ে যা উদাহরণ দেখানো হয়েছে, তা চিরকালের মানুষেরই মনের ছবি, মনের প্রকৃত রূপেরই গল্প। মহাভারতে সংযোজন করার ইচ্ছে যে মানুষটিরই মাথায় এসে থাকুক প্রথমে, তিনি যা-তা নন। তাঁর মন অন্য মনে গিয়ে খবরাখবর আনার ক্ষমতা ধরবে নিশ্চয়। এটা কোন অংশে ভুল নয়। গুরুদেব বলেছে অন্তত তার ধারণা তো তা-ই।

সতীর পরীক্ষা পরিচালনা করেছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

গাছের ডালে টসটসে পাকা আম একটা ঝুলছে। এমন অবস্থা সেটা খসে পড়ে পড়ে। একটু জোরে হাওয়া লাগলেই পড়ে যাবে বুঝি এখুনি। সতী এলে কিন্তু পড়বে না।

অবাক কাণ্ড, অদ্ভুত পরীক্ষা।

কৌতূহলী মেয়েরা জড়ো হয়েছে গাছ তলায়।

কুন্তী এসে দাঁড়ালো খানিক গাছের তলায়। আমের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। বাতাসে দুলছে আম। রুদ্ধশ্বাসে দেখছে সবাই। পড়লো পড়লো—এই বুঝি পড়লো।

আশ্চর্য! খসেনি বোঁটা, ঝরেনি পাতা, পড়েনি আম।

ঈর্ষাকাতর মানুষদের মাথা নিচু। শুভাকাঙ্ক্ষীদের উল্লাস। কুন্তী-সতীর জয়ধ্বনি!

কুন্তীর পরে কৃষ্ণা, যাজ্ঞসেনী-দ্রৌপদীর আগমন। হাসিমুখে সদর্পে পা ফেলে এসে দাঁড়িয়েছে! শাশুড়ী যখন পরীক্ষায় সহজে উত্তীর্ণ হয়ে গেলো তার তো কথাই নেই। এমনিতেই তার সতী বলে খ্যাতি চারদিকে।

কিন্তু একি হোল! বাতাস স্তব্ধ। তবুও গাছ ছাড়া হয়েছে আম। পড়েছে মাটির বুকে। দ্রৌপদী ঠিক হোয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই এই কাণ্ড। বিস্ময়ে বিমূঢ় সকলে।

অপমানে লজ্জায় মাথা নত করেছে দ্রৌপদী। আর একতিল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। চতুর্দিকে গুঞ্জন—এ কি অসম্ভব ব্যাপার একি অসম্ভব ব্যাপার!

ঘরে এসে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে দ্রৌপদী।

পালঙ্কের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দরজায় টকটক আওয়াজ। ওড়নায় চোখমুখ মুছে নেমেছে পালঙ্ক থেকে। আস্তে আস্তে খুলেছে বন্ধ দরজা। সামনে শ্রীকৃষ্ণ একা দাঁড়িয়ে। মিটিমিটি হাসছে।

সখি। আমার ওপর তোমার অভিমান হয়েছে ?

তুমি থাকতে আমার সম্মান রক্ষে হোল না সখা এটাই বড় দুঃখ।

তুমি বলো সখি, পঞ্চপাণ্ডব ছাড়া কি তাঁর কাউকে মনেপ্রাণে ভাবো নি কোনদিন ?

একটু চুপ কোরে রইলো দ্রৌপদী। তারপর আস্তে আস্তে বললো, হ্যাঁ। কর্ণকে ! বীর স্বামীর পত্নী হোতে পারলে কতোই না ভাগ্যের কথা হোত জীবনে।

গল্প শেষ কোরে গুরুদেব বোলেছে কুসুমলতাকে তোমার আর নিশিরঞ্জনের—দু'জনের মন এক হোয়ে থাকুক বরাবর।

নিশিরঞ্জন কুষ্ঠির লেখা মানতে চায় নি। মাকে বোলেছে কুসুমলতার সঙ্গে সামাজিক বিয়ে দিতে। মা বারে বারে কুষ্ঠির ফলাফলের কথা শুনিয়েছে। জ্যোতিষী আর কুল-পুরোহিত—দু'জনেরই একমত। বিবাহে মৃত্যুযোগ এ ছেলের। শাস্ত্র-অনুষ্ঠানে বিয়ে নিষিদ্ধ।

প্রিয়জনের মৃত্যুযোগ শুনলে, কার না বুক কেঁপে ওঠে। কুসুমলতা বিয়ের জিদ ছাড়তে অনুনয় কোরেছে নিশিরঞ্জনকে। গুরুদেবের কথাই শিরোধার্য। তুমি-আমি ঠিক আছি। এটাই তো মস্ত জিনিস।

নিশিরঞ্জনের ভায়েদের এসব অবিদিত নেই কিছু।

মায়ের অবর্তমানে কুসুমলতাকে উৎখাত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে ভায়েরা। যে-বাড়িতে কুসুমলতা বসবাস কোরছে, ছাড়তে হবে। ভায়ের কলঙ্ক—একটা দগদগে ঘায়ের মতো বুকের ওপর বোসে থাকবে চিরকাল, অসহ্য। এরকম হোতে দেয়া কোনমতেই উচিত নয়। কিছু না হয় টাকা দেয়া হোচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে চলে যাক

ভিটে ছেড়ে। ভায়ের পাপের ফসল—ছেলেটাকে নিয়ে বিদেয় হোক যতো শীগগির।

প্রবালের বয়স তখন কতো আর হবে, ছয় চলছে।

একা মেয়েমানুষ, এই বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় যাবে কুসুমলতা!

কুসুমলতা ভায়েদের অনুনয় বিনয় কোরে বোলেছে, ছেলেটা তো তোমাদেরই বংশের, তোমাদেরই ভাইপো একটু মানুষ হোক। ওকে মানুষ হোতে সাহায্য কর আমায়। মা তো ওর সব ব্যবস্থাই কোরে গেছে।

তিনভায়ের মধ্যে এতো রেষারেষি যে, ভাবা যায় না। কিন্তু বিষয় ব্যাপারে—বিশেষ কোরে কুসুমলতার বিষয়ে তিনজনে একেবারে হরিহর আত্মা। এখন কেউ কাউকে দেখলে আর মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় না, সাতহাত তফাতে। তিনজনের একজনও আবেদন-নিবেদন গ্রাহ্য করে নি। উল্টে হিতেবিপরীত। যতজন বোলেছে যতো বড় মুখ নয়, ততো বড় কথা। আমাদের ছেলের সঙ্গে ওই কলঙ্কা-প্রবালের তুলনা। স্পর্দ্ধা আর কাকে বলে?

মেজোজন বোলেছে, দাদা! কুসুম মামলা করার ভয় দেখাচ্ছে? তুমিও যেমন, কথার ভাবে বুঝলে না! মা নাকি ব্যবস্থা কোরে গেছে কুলাঙ্গারের।

সেজো বোলেছে, বেশ তো! কোমরের জোর করে দেখা যাক্! মামলার ভয় দেখানো। যাও না বড়দা মেজদাকে বোলে কয়ে রাজি করিয়েছিলুম কিছু দিতে, আর নয়! একটা কানাকড়িও নয়। কি কোরে আদায় করে আর কি কোরে বাড়ি দখল কোরে বোসে থাকে কদিন—দেখিয়ে দিচ্ছি।

চোখের জল ফেলতে-ফেলতে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে কুসুমলতা প্রবালকে নিয়ে। শিশু প্রবাল সমস্তই শুনেছে মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে। কিইবা বোঝে সে, কিইবা করার আছে তার! মায়ের চোখের জলে সে-ও কেঁদে ভাসিয়েছে খালি। ছোট্ট জামার বুকের কাছটা ভিজে উঠেছে।

বাড়িতে ফিরে এসেও কান্না থামে নি কুসুমলতার।

ছেলেটা না থাকলে এখুনি কোথাও চলে যেতো সে। কিন্তু প্রবালের কি হবে! কে দেখবে! কে রাখবে, কে ওর ভার নেবে! পাগলের মতো পায়চারি কোরেছে সারারাত ঘরে। ঘুমন্ত প্রবালের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে একবার কোরে। মুখখানা দেখছে একদৃষ্টে। আবার পায়চারি।

দেয়ালে দেয়ালে যতো ঠাকুর-দেবতার ছবি টাঙানো, কাছে গিয়ে গিয়ে মাথা ঠুকে ঠুকে প্রার্থনা জানিয়েছে, তোমরা আমার কোন কথা শোনো নি কোনদিন। একথাটা শোন অন্তত। দোষটা তোমাদের। নির্দোষ ছেলেটার ব্যবস্থা কোরে দাও একটা। আমায় না হয় পথের ভিখিরী কোরে দাও। মৃত্যু দাও! কোন দুঃখ নেই, কোন অভিমান খেদ নেই আমার। শুধু একটাই ভিক্ষে—ওকে ছাখো তোমরা, ওকে বাঁচাও!

নিরাশার আঁধারে ঘুরে ঘুরে যখন ক্লান্ত-অবসন্ন দেহমন যখন আলোর কোন নিশানা—একবিন্দুরও সন্ধান পাচ্ছে না কোথাও, তখন একটা আলোর চমকেরই মতো এক সন্ন্যাসী এসে হাজির বাড়িতে। দীর্ঘ জটা বোধ হয় না অবধি। মাথার ওপর মন্দিরচুড়ো কোরে বাঁধা। চেহারায় সৌম্যভাবের দেখা মাত্র নেই। চাপা রঙ, লম্বা। খুব রোগাও নয় খুব মোটাও নয়। দোহারা চেহারা। টকটকে লাল শালু জড়ানো সারা দেহে। পায়ে খড়ম।

মুখে হাসি নেই, রুক্ষ রুক্ষ ভাব। গলার স্বরও মিষ্টি নয়। যেমন রাখে। কটমট কোরে এমন তাকালো কুসুমলতার দিকে, কুসুমলতা যেন অপরাধী সাধুর কাছে। প্রবালের দিকের চাউনিটা বুঝি আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে ওর সর্বাঙ্গে। প্রবাল ভীষণ ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরেছে কুসুমলতাকে:

ভাঙাচোরা গলায় বোলেছে সাধু, আমি বাঘ না ভাল্লুক? এতে ভয় পাবার কি আছে! নেহাৎ অতি মাত্রায় দয়া মায়ার শরীর বোলেই তোর কাছে এসেছি সাবধান কোরে দিতে। এ বাড়ির মাটি

আঁকড়ে পড়ে থাকবার চেষ্টা কোরবি না মোটে। যতো শীগগির পারিস ছেড়ে চলে যা। না হোলে সমূহ বিপদ! ছেলেটাকে নিয়ে মুশকিলে পড়বি শেষে।

আর দাঁড়ায় নি সাধু। ও বাড়ির রাস্তা ধরে হনহন করে এগিয়ে গেল। দোতলার বারান্দায় বুক-ঝুলিয়ে দেখেছে সাধুকে সেজোজন। নিশিরঞ্জনের সেজো ভাই। তরতর কোরে নেমে এসেছে ওপর থেকে! সেই এসে হাজির। সাধুকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেছে হাসতে হাসতে।

ঘরে প্রবেশ কোরে এক একটা ছবি লক্ষ্য কোরে বোলেছে কুসুমলতা, ভালো পরিহাস বটে! চাওয়া হোল এক, পাওয়া হোল এক, দেবতাদের করুণাকে বলিহারি যাই! ছেলেটাকে বাঁচাও, না ছেলেটাকে নিয়ে মুশকিলে পড়তে হবে। হাতে হাতে মোক্ষম ফল!

দিনসাতেক বাদে সাধু আবার এসেছে।

এবারে মূর্তি খুব সুবিধের নয়। ভীষণ উগ্র। চোখে চোখ রাখা যায় না। দুটো আগুনের ভাঁটা জ্বলছে। গলা সপ্তগ্রামে চড়িয়ে ফেলেছে, গ্রাহ্য হোল না, না—? দুর্ভোগ আছে কপালে। ভালো কথা ভালো লাগলো না। মন্দ হোলে বুঝবি তখন। অন্ধ হোয়ে কোথায় মরবি, পথ খুঁজে পাবি না। এটাই তোর হওয়া দরকার।

প্রবালকে ধমকে বোলেছে, এই বাচ্ছা! চেয়ে থাক, চেয়ে থাক বোলছি। খানিকক্ষণ প্রবালের চোখের তারার ওপর দৃষ্টি দিয়ে সাধুর।

সাধু চলে যাবার পর প্রবাল কেমন হোয়ে গেছে।

যেদিকে তাকাচ্ছে, 'সাধু' গেলে ভয়ে ভীষণ চিৎকার কোরে উঠেছে। তার চোখে সাধু সর্বত্র দাঁড়িয়ে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিয়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চিৎকার কোরে উঠেছে—সাধু সাধু, সাধু!

সাধু কিন্তু সশরীরে কুসুমলতার বাড়িতে আসে নি আর।

এদিকে ছেলে ত্রাসে ত্রাসে খাওয়া ত্যাগ কোরেছে, শুকিয়েই যাচ্ছে। সাতদিনে সাত হাল। কি উপায়, ভেবে ভেবে সারা কুসুমলতা।

লোকমুখে শুনেছে কুসুমলতা, সাধু কিন্তু যা-তা সাধু নয়। সবাই ভয় পায় খুব। ত্রিগুণ সাধু নামে বাইরে খুব খ্যাতি আছে। ওর দুনিয়ায় আসাধ্যকর্ম বোলে কিছু নেই। ষট্‌ক্রিয়া বিশারদ। মারণ উচ্চাটন স্তম্ভন বশীকরণ আকর্ষণ বিদ্বেষণ এই ছটির ক্রিয়াকলাপে ত্রিগুণ। হয় কে লয়, লয়কে হয় কোরতে পারে সাধু।

সাধুকে আনিয়েছে ও বাড়ির ভায়েরা। সাধুর কথা অমান্য কোরলে, তার আর রক্ষে নেই। যাদের পুরোমাত্রায় সহানুভূতি কুসুমলতার ওপর তারা পরামর্শ দিয়েছে সাধুর কাছে ক্ষমা চেয়ে কুসুমলতা যেন এদেশ ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি। যদি ছেলেটার প্রাণ রক্ষে কোরতে চায়। রোজ রাতেই শ্মশানের দিকে যেতে দেখেছে অনেকে আড়ালে আবডালে থেকে। ছেলেটা এমন হোয়ে যাচ্ছে, নিশ্চয় মারণক্রিয়া কোরছে ত্রিগুণসাধু।

শুনে খুব ভয় ধরেছে কুসুমলতার।

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আগলে শুয়ে থাকে। কিন্তু তবু প্রবালের সাধুআতঙ্ক যায় না। চমকে চমকে ওঠে। চিৎকার কোরে ওঠে, মেরে ফেললে, মেরে ফেললে, মেরে ফেললে। এতটুকু স্বস্তি-শান্তি পাচ্ছে না প্রবাল, পায় না।

অমাবস্যার রাতে সহস্রগুণ বেড়ে উঠলো।

যন্ত্রণা আর দেখা যায় না। হাত-পা ছোঁড়ার ক্ষমতাটাও হারিয়ে ফেলছে, স্বর ক্ষীণ হোয়ে আসছে। বুকে হাত রেখে দেখছে কুসুমলতা। কি হোচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছে না। মনে হোচ্ছে, মাঝে-মাঝে ওর দম আটকে যাচ্ছে বুঝি।

কুসুমলতা পাগলের মতো হোয়ে গেছে।

প্রবালকে বুকে চেপে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে।

চলেছে ত্রিগুণসাধুর কাছে।

এসেছে শ্মশানে কুসুমলতা।

ত্রিগুণসাধু যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকলাপে মগ্ন।

চিতাহোমে আহুতি মন্ত্র পুরো কানে আসছে না, একটু একটু শোনা

যাচ্ছে। তাও তার স্পষ্ট নয়।...মারণক্রিয়া সফলং কুরু কুরু স্বাহা।

প্রবালকে আস্তে আস্তে পায়ের কাছে শুইয়ে দিয়ে, দু'হাত জোড় কোরে কেঁদে ফেলেছে কুসুমলতা, ক্ষমা করুন! ছেলেটাকে এভাবে না মেরে একেবারে শেষ কোরে দিন। আমি আর দেখতে পারছি না। যা ভালো বোঝেন করুন! রইলো আপনার চরণে। আপনার কথা রাখছি আমি।

ত্রিগুণসাধু একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে।

খেলো এই প্রথম। তার ক্রিয়াকলাপের ফল ফলে কেমন, এতোদিনে চাক্ষুষ দ্যাখে নি কখনো। এরকম কেউ কখনো তার কাছে আনে নি কাউকে।

ত্রিগুণসাধু হতভম্ব হতবাক।

এতো যন্ত্রণা এতো কষ্ট। অবোধ শিশুর! না-না—একে বাঁচাতেই হবে। বাঁচাতেই হবে।

কোলে তুলে নিয়েছে প্রবালকে।

ফিরে তাকিয়ে দ্যাখে কুসুমলতা নেই! চলে গেছে কখন।

পরে এই প্রবালকে ছেলের মতো মানুষ কোরে তুলেছে ত্রিগুণসাধু। প্রবালই তার পায়ের বেড়ি হোয়ে দাঁড়িয়েছে। ওকে ছেড়ে যেতে পারে নি কোথাও। আর মনও চায় নি যেতে। মায়ের ছেলে মায়ের হাতে তুলে দেবার কতোই না চেষ্টা কোরেছে। খুঁজে খুঁজে পায় নি কোথাও। সেই রাতের পর কেউ দ্যাখে নিও আর কুসুমলতাকে।

ত্রিগুণসাধুর সাধনার যা যা সঞ্চয় ছিলো, সবকিছু ঢেলে দিয়েছে প্রবালকে। প্রবালের সাধক নাম পূর্ণপ্রকাশ। ত্রিগুণসাধুরই দেয়া। প্রকাশ সাধু নামেই প্রচার। প্রকাশ সাধু আজ নিজেকেই দেখছে বুঝি অতনুর মধ্যে। অতনুর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। অতি সন্তর্পণে।

দু'হাতে কোলের ওপর তুলে নিয়েছে আস্তে আস্তে অতনুকে। ফিরে তাকিয়েছে। স্মৃতিরেখা বোসে রোয়েছে ধীরস্থির হোয়ে। চোখের কোণে জল টলমল কোরছে।

অতনুর মাথায় হাত রেখেছে প্রকাশ সাধু। সুস্থ হোয়ে উঠুক। ধীরে ধীরে চোখ খুলেছে অতনু। প্রকাশসাধু তাকিয়ে আছে অপলকে দেখছে স্মৃতিরেখাকে। কুসুমলতাই বোসে আছে না বড়প্রবালের— প্রকাশসাধুর সামনে।

প্রকাশসাধুর চোখের কানায় কানায় জল ভরে উঠেছে। উপচে পড়ে পড়ে অবস্থা। উপচে পড়ছে। ঝরে পড়ছে টসটস কোরে দু'গাল বেয়ে—অতনুর বুকের ওপর।

পিয়াল।

পিয়াল হরকুমার ব্রজমোহন।

হরকুমার ব্রজমোহনও মরণের পথে যেতে বসেছে।

সত্যিসত্যিই কি পিয়ালের জন্যে ?

এদের দুর্ভোগের জন্যে কি পিয়াল দায়ী ? পিয়াল দোষী ?

কথার ছবিতে পিয়ালের উত্তর প্রতি পদে পদে।

কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কোনদিকে খেয়াল নেই।

হনহন ক'রে চলেছে পিয়াল! কে দেখছে, কে কি ভাবছে— সেসব ভাবার সময়ও নেই, আর মনও নেই। মন শুধু একজনের ঘরে, একজনের ওপর। হরকুমারের।

রতনমণি মেয়েকে, যাকে বলে পাখী পড়ানোর মতো কতো না বুঝিয়ে-বুঝিয়ে বলেছে, এটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু। অতো উতলা হ'লে চলবে কেন! সব কিছুতে অমন বেঠিক হ'লে চলে না, মাথার ঠিক রেখে চলতে হয়। সমাজ আছে, আত্মীয়স্বজন আছে। নানা কথা উঠবে। আর তাছাড়া গাঁওগঞ্জের ব্যাপার। ওত পেতে তো বসে রয়েছে জ্ঞাতি শত্রুরা। ছুতো পেলে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন গুজব রটাবে যে, কানপাতা দায় হবে। গাঁয়ে টেকা ভার হবে। উনি থাকলে অতো ভাবনার কিছু ছিল না। বরাত দোষে হারিয়ে ফেলেছে রতনমণি। সেই জন্যই আরো সব দিকে চোখ-কান খুলে রেখে চলতে হয়, চলতে হ'চ্ছে।

আশ্চর্য! যে মেয়ে কতো সাবধানী ছিল, মায়ের চেয়েও ঢের

বেশী। সে আজ বেপরোয়া। কলঙ্কের কালি ছিটে আসতে কতোক্ষণ! কোন ন্যায়-যুক্তি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। মায়ের দুঃখে কাতর, কি সহানুভূতিই না ছিল! কর্পূরের মতো সহজেই উবে গেল!

পিয়াল হৃদয়হীন হ'য়ে গেল শেষে!

ভাবতেও কষ্ট রতনমণির। নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দেয়। না, না। সে যা ভাবছে, ভুল ভুল। তারই পেটের মেয়ে তো পিয়াল অন্যের মতো হয় নাকি! তা কেন হবে। হবে না, হ'তে পারে না।

কিন্তু—কিন্তু কার্যগতিকে সব বিপরীত। তার ধারণাকে উল্টে-পাল্টে তছনছ ক'রে দিচ্ছে পিয়াল। তারই চোখের সামনে বেরিয়ে যাচ্ছে। একদিন-আধদিন নয়, প্রতিদিন। নিয়ম ক'রে রোজ ভর-সন্ধ্যেয়। ঠিক একই সময়ে নিয়ম করে।

সন্ধের মুখোমুখি হ'লেই পিয়াল যেন কেমন হ'য়ে যায়। এতো অন্যমনস্ক কখনো কেউ দেখে নি ওকে! অদ্ভুত লাগে। কতো কারণ দেখিয়ে কতো আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কোন বাঁধা কোন ওজরআপত্তি মানে নি।

ব্রজমোহনের জন্য কি অস্থিরই হ'ত, হয়েছে। আর একটু দেরী হ'লে, ঘর বার ক'রে সারা। একেবারে পাগল যাকে বলে। সেই ব্রজমোহন সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও কোন নজর নেই। সুনজর তো দূরের কথা উল্টে বিরক্তির একশেষ ওকে দেখলেই ঘৃণা বিদ্বেষের ছাপ ফুটে ওঠে মুখে বেশী ক'রে।

পিয়ালের কথার ঝাঁঝে রতনমণি একদণ্ড তিষ্ঠোতে পারে না ঘরে। ব্রজমোহন কিন্তু চুপচাপ। অসাধারণ সহ্যশক্তি বলতে হবে। ধৈর্যই বা কি কম! অন্য পুরুষ হ'লে ত্রিসীমানায় আর আসতো না। জীবনে মুখ দর্শন করতো না আর। এতো হেনস্থা হয়েও কি ফল পাচ্ছে বেচারা! অমৃত তো নয়ই, বিষ বিষ। সেঁকো বিষ।

বিষে জর্জর ব্রজমোহন নীলকণ্ঠ শিব।

এ যুগে এমন সোনার চাঁদ এমন সৎপাত্র মেলা ভার। কতো মেয়ের বাবারা ওর দরজায় ধন্না দিচ্ছে দু'বেলা। সকাল-সন্ধ্যেয়।

হিসেবের বেলায়—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা যাকে বলে! ছেলেটার চোখের দিকে চাইতে পারে না রতনমণি। লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে আসে। বড় দুঃখ হয় ছেলেটার জন্য।

ব্রজমোহন কি দেবতা, না মানুষ!

কোন রাগ-ক্ষোভ নেই শরীরে। বলতে গেলে পিয়ালকে স্ত্রী বলা যায়। মনেপ্রাণে স্ত্রী বলেই মেনে নিয়েছে! খালি অনুষ্ঠান বাকি। এই যা! একটা পরপুরুষের জন্য উন্মত্ত স্ত্রী, অথচ একটু শাসন করবে না ব্রজমোহন। বললে বলে, একগ্রামে জন্ম—মানুষ দু'জনে। হরকুমারের কাছে যায়, যাক না। ক্ষতি কি! লুকিয়ে চুরিয়ে তো আর যায় না। সকলের চোখের সামনে দিয়েই তো যায়। পরিষ্কারই বলে পিয়াল, হরকুমারের জন্য তার মন বড় অস্থির-অস্থির করে। ঘর ভালো লাগে না। কাউকে ভালো লাগে না। ওকে দেখার ইচ্ছে হয় যখন ভেতরে। সকলে তখন দু'বক্ষের বিষ হ'য়ে ওঠে ওর কাছে।

যাক না। একটু শান্তির জন্যই যায় ও!

মেয়ের ওপরের রাগটা ব্রজমোহনের ওপর গিয়ে পড়েছে রতনমণির। একটু জোরেই বলেছে, স্বাভাবিকের চেয়ে গলা চড়িয়ে, তোমার নীতি কথা ঝোলায় পুরে রাখো তো। আমার ভালো লাগে না শুনতে। কেমনতর ব্যাটাছেলে তুমি! তোমার মেসোমশাই বেঁচে থাকলে, তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করলে, আমাকে আর আস্ত রাখতো না। ভালোবাসবে বলে কি জাহান্নামে যেতে ছেড়ে দিতে হবে!

বলে ফেলেই সচেতন হয়ে উঠেছে রতনমণি। জিভ কেটে বলেছে, মনে কিছু কোরো না বাবা! তোমাকে বকা মানে, নিজেই যন্ত্রণা পাওয়া। মেয়েটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। নিজেকে সামলাতে পারছি না আর। মাথার ঠিক রাখতে পারছি না।

কি ক'রে ঠিক রাখে রতনমণি?

রতনমণির চেয়ে আর কে বেশী জানে পিয়ালের মন। পিয়ালের সহানুভূতি ছিল হরকুমারের ওপর—একথা সত্যি। তা'র কারণও

কিনা যথেষ্ঠ। ছেলেটা ছেলেবেলায় কথা কইতে পারতো না ভালো-রকম। অনেক দেরীতে কথা ফোটে। তার জন্যই শিক্ষাদীক্ষা—সবেতেই ও পিছিয়ে পড়ে।

রতনমণির কাছে এসে হরকুমার তার শিশু মনের দুঃখের ফিরিস্তি দিতো। গালে হাত দিয়ে বসে বসে শুনতো পিয়াল। হরকুমারের চোখের জলে ওরও দু'চোখ ছলছল ক'রে উঠেছে। তাজ্জব ব্যাপার। দশ বারো বছর বয়েস থেকে ওই ছেলে মুখর হয়ে উঠেছে। অতো দিনের আধো অস্পষ্ট কথা একেবারে যেন অলৌকিক কোন যাদুকাঠির স্পর্শে স্পষ্ট-পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। শুধু পরিষ্কারই নয়, গলায় একেবারে হরবোলার স্বর। হেন্ পশুপক্ষী নেই যে যার আওয়াজ অবিকল গলায় তুলে হরকুমার না শুনিয়েছে।

পিয়ালের ওর গলায় মিষ্টি পাখীর স্বর শুনতে ভালো লাগতো—কোয়েল—দোয়েলের। কাক-ভেড়ার ডাক ভালো লাগতো না। বলেছে, হরকুমার জন্তুজানোয়ারের কথা নিয়েই মত্ত। মানুষের মনের কথা বোঝবার চেষ্টা ক'রে না। কোরবে না-ও কোনদিন। তখন দুজনেই বেশ বড়সড়। পিয়াল পনেরো, হরকুমার ষোলো-সতেরো।

পিয়ালের ওই বদ্ধমূল ধারণাই ওর মনের কাছ থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে হরকুমারকে। সহানুভূতির ভিত ভেঙে চুরে গিয়ে সাংঘাতিক ভিতের মানুষ তৈরী হয়ে উঠেছে হরকুমার পিয়ালের মনে। আগেকার মতো ওর হরবোলার ডাক আর শুনতে চায় নি। জোর করে বসালেও, বসে থাকতে পারে নি। উঠে চলে গেছে তখুনি। হরকুমারকে এড়িয়ে-এড়িয়েই চলেছে। হরকুমার যদি থাকে একহাত দূরে, পিয়াল থাকবে শতহাত দূরে। কিংবা একদম সে জায়গা থেকে অদৃশ্য। হরকুমারের চোখের বাইরে, ওর নিজেই চোখাচোখি হবার বাইরে।

একজনের অবহেলায় আর একজনের ভাগ্য সুপ্রন্ন হ'ল।

বোড়ালের ত্রিপুরা-সুন্দরীর উৎসব চলছে।

শ্রীপঞ্চমীতে শুরু। মোটমাট শুরু থেকে তিনদিন চলবে। অনেক

লোক সমাগম হচ্ছে নিত্য। মায়ের খিচুড়ি ভোগ বিতরণ চলছে। মজাবোজা সেনদীঘি ডোবা যেন। ওপারে ত্রিপুরাদেবীর ভৈরবের মন্দির। বড়বাবার।

মন্দিরের ধারে বসে বসেই হরবোলার সুরে নানাপাখীর ডাক ডাকছে হরকুমার।

এধার থেকে মায়ের জৈনভক্ত দেওতলাল কান খাড়া ক'রে শুনেছে একমনে। ভালো লেগেছে খুব। হরকুমারকেও খুব ভালো লগেছে। কখন কাকে কার নজরে ধরে যায়, কে জানে! দেওতলালের দৌলতেই ব্যবসা-বাণিজ্যে হাতে খড়ি হরকুমারের। ছোট ব্যবসা থেকে বড় ব্যবসায় প্রবেশ। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। সত্যিসত্যিই জীবনের মোড় ঘুরে গেছে হরকুমারের কাপড়-কম্বলের ব্যবসায়।

হরকুমার রহিস আদমি বলে খ্যাত ব্যবসায়ী মহলে।

বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে হরকুমার রতনমণির কাছে। পিয়ালকে বিয়ে করতে চায় সে। পিয়ালের অমত হবার কোন কারণ নেই। তার ঘরে পিয়াল সুখেই থাকবে। সুখ বলতে সুখ, একেবারে ঘরণী-রানী। এখন আর হরকুমার দীনগরীব নেই। হরকুমার দেরী করতে একদম রাজী নয়। জষ্টিমাসেই করবে। বড় ছেলে হলেও, বাধা নেই। পুরোহিতমশাই বিধান দিয়েছেন কিছু দক্ষিণা ধরে দিতে হবে বেশী ক'রে। আর মাসের প্রথম—দশ-বারোদিন বাদ দিয়ে দিলেই চলবে।

রতনমণি খুব খুশি।

এখন নিশ্চয় পিয়ালের মন ঘুরবে। নিজের চোখে দেখছে, নিজের কানে শুনছে তো সব। পনেরোর ধারণা কি আজ কুড়ি-বাইশে আছে! থাকা উচিতও নয়।

মেয়ের কানে কথা তুলতেই মাথায়, বজ্রাঘাত রতনমণির।

মন বলে, হৃদয় বলে কি কোন বস্তু আছে হরকুমারের ভেতর? ওর মনটাই তো ছোটবেলা থেকে পশুপাখীর। বড় হলেও অভ্যেস বদলায় না সহজে। মানুষের মর্ম ও বুঝবে কেমন করে! একে

কানা বৌ তায় মুলো বামুন। একে পশুর মন, তার সঙ্গে আবার ব্যবসাদার। দিনরাত তো হিসেবের কড়ি মেলাতে মেলাত সময় কাবার। অবসরে পেঁচা-কাকের ডাক। ওর বিয়ে না করাই উচিত। কোন মেয়েই শান্তি-সুখ পাবে না ওর ঘরে।

হো-হো ক'রে জোরে হেসে উঠেছে পিয়াল।

গলা নামিয়ে বলেছে মাকে, আচ্ছা মা, সত্যি কথা একটা বলবে আমায় ?

রতনমণি মেয়ের এহেন আচরণে হতভম্ব, হতবাক।

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছে পিয়ালের দিকে। মন পরিবর্তন হয় নি এতটুকু। যেমন তেমনিই আছে। দেহের বয়েস বাড়লে কি হবে, মনের বয়েস বাড়ে নি, বাড়ে নি !

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে রতনমণি। সবই, ভাগ্য।

চমকে উঠেছে রতনমণি মেয়ের কথায়। শুধু চমকানো নয়, কেঁপেও ওঠেছে সারা শরীর।

পিয়াল বলছে, আমাকে নিয়ে যদি তোমার ভারবোঝা হয়ে থাকে, খোলাখুলি বলে দাও। রেখে ঢেকে বলার কোন মানে হয় নাকো। আমার পথ আমিই বেছে নোবো।

কি বলতে চাইছে পিয়াল, কি পথে বেছে নেবে !

হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছে রতনমণি। কান্না-ভেজা গলায় হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে বলেছে। বলতে-বলতে কথা আটকে-আটকে গেছে।—তোর বাপী চলে যাবার পর তোকে বুকে নিয়ে, তোর জন্যেই যে বেঁচে ছিলুম পিয়াল। মরতে তো চেয়েছিলুম। তোর মুখের দিকে তাকিয়েই মরতে ইচ্ছে করে নি আর। বাঁচতে চেয়েছি, বেঁচে আছি আজো। তুই একি মুখ দিয়ে বার করলি পিয়াল! আমার ভারবোঝা তুই ! পথ বেছে নিবি ! তার আগে মৃত্যু হোক আমার মৃত্যু হোক ! কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মা।

দৌড়ে এসে জাপটে ধরেছে পিয়াল ?

বুকের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মা ! অন্য

ভেবে বলি নি আমি। তুমি চুপ কর। যাতে শান্তি পাও, তাই কর, তাই কর মা।

নিজের আঁচলে চোখমুখ মুছিয়ে দিয়েছে রতনমণি পিয়ালের। বলেছে, না তা হবে না। হরকুমারের সঙ্গে বিয়ে হবে না। তুই ঠিকই বলেছিস। সত্যিই মানুষের স্বভাব যায় না মলে, ময়লা যায় না ধুলে। বাইরে ধোপদুরস্ত হলেই মন পরিষ্কার হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। তোর ভালো ঘরেই বিয়ে হবে। হরকুমারের চেয়েও বড় ঘর। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়েছে ত্রিপুরাসুন্দরীকে। —মাগো। অপরাধ নিও না। নাক-কান মুলে বলেছে। মাগো, ক্ষমা করবে! ক্ষমা কর অবোধদের। মঙ্গল কর মা। যাতে পিয়ালের মঙ্গল হয়, তাই কোরো মা। তাই কোরো।

মায়ের চোখের জলে হাসির ঝলক উপচে পড়তে দেখছে পিয়াল। মা আনমনা হয়ে পড়ছে যেন। কিছু একটা ভাবছে যেন। নিজেই মাথা নেড়ে নিজের মনের সঙ্গে কিছু একটা বোঝাপড়া করছে বুঝি। নিজের মনেই নিজে হাসছে রতনমণি। মনের হাসি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে ঠোঁটের ফাঁকে। মুখে বলেছে রতনমণি।—ঠিক আছে ঠিক আছে। নিজেকেই কি শোনাবার জন্য বলছে রতনমণি?

হ্যাঁ, নিজেকেই শোনাবার জন্য বলেছে।

সুরপতি। পাত্র হিসেবে সচ্চরিত্র। ধনীলোক। নাম-ডাকও আছে খুব। পিয়ালকে ওদের খুব পছন্দ। দেনা-পাওনারও কোন দাবিদাবা নেই। ওদের বাড়ির মর্যাদা রক্ষের জন্য মনোমতো ক'রে ওরাই সাজিয়েগুজিয়ে নিয়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে মত দিতে আপত্তি কোরে ছিল রতনমণি, শুধু হরকুমারের প্রস্তাবের জন্য। পাঁচটা নয় দশটা নয় ওই একটা মাত্র মেয়ে সবে। কাছে হলে তবু চোখের দেখা দেখতে পাবে তো রোজ একবার করে। যদিও বেশী দূর নয়, কলকাতা আর বোড়াল। কতবারই না আসা-যাওয়া করা যায় দিনে। সে যাই হোক। পিয়ালের সিদ্ধান্তই রতনমণির। হরকুমারের সঙ্গে নয়।

কথা দিয়েছে সুরপতিদের।

সুরপতি প্রথমটায় একটু গুঁইগাঁই করেছিল। এতো তাড়াতাড়ি কেন? জষ্টিমাসটা বাদ দিলে হয় না। অঘ্রাণে করলে কেমন হয়! ছেলের কথা শোনেনি মা-বাবা। তাদের প্রবল ইচ্ছে এখুনি হয়ে যায়। আজ হ'লে কাল চায় না।

ধুমধড়াক্কা ক'রে বর এসেছে গ্রামে।

দূরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখেছে গাছের আড়াল থেকে হরকুমার। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে। মাঝে মাঝে নিজের বুকে নিজেই ঘুষি মেরেছে দমাদম ক'রে। আবার দাঁতে দাঁত ঘষে বিড়বিড় করে কি সব বলেছে, কে জানে!

রতনমণির সঞ্চয় যা কিছু ছিল, খুদকুঁড়ো পর্যন্ত রাখে নি। নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে মেয়ের বিয়েয়। গ্রামসুদ্ধু নেমতন্ন ক'রে প্রচুর খাইয়েছে-দাইয়েছে সকলকে। ছোটদের শ্রদ্ধা আর বড়দের স্নেহ-আশীর্বাদ কুড়িয়েছে।

রতনমণির ভেতর-বার আনন্দে পরিপূর্ণ।

সকলের মুখে একই কথা। আহা! "বিধবামানুষের মেয়ে। অনেক সাধআহ্লাদের। পিয়াল সুখী হোক।"

পিয়ালকে বিদায় দিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নীরবে কেঁদেছে রতনমণি। স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে মনে মনে বলেছে, তোমার চেয়ে আমার জীবনে আর কোন বড় দেবতা নেই। তুমি যেখানেই থাকো, আশীর্বাদ কর পিয়ালকে। আমার ওপর যে দায় যে দায়িত্ব দিয়ে গেছলে, আমি পালন করেছি পাত্রস্থ ক'রে। পিয়ালকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে তুলে দিয়ে। এবার আমায় ছুটি দাও!

ভুল দেখলো কি ঠিক দেখলো ঠাহর করতে পারলো না রতনমণি। স্বামীর ছবির মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখলো যেন। ছবির মুখখানা ফিক ক'রে হেসে উঠেছে। পলকের জন্য। মিলিয়ে গেছে পলকেই।

ছুটি মেলেনি রতনমণির।

মেয়ের ব্যাপারে আরো জড়িয়ে পড়েছে। বিয়ে দিয়েও নিজেকে

ছাড়ানো গেল না। ছ'মাস যেতে না যেতে পিয়ালের সুখের আকাশে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ ক'রে আসেনি, ধীরে ধীরে এসে জমা হয়েছে মহাকালের ইঙ্গিতে কালের কালো মেঘ।

সমস্ত যখন শুনেছে প্রথমে, তখনই অচৈতন্য হ'য়ে পড়েছে রতনমণি। একি ভাগ্য রতনমণির! মেয়েটারও যে তার ভাগ্য হ'তে চলেছে। তারই দোষে মেয়েরও সাজা। বড্ড দেমাক হয়েছিলো রতনমণির। বিয়ের মতো বিয়ে দিয়েছে রতনমণি মেয়ের। এ গাঁয়ের যা কেউ কখনো করতে পারেনি। বিধবা হয়েও পুরুষের চেয়ে হিম্মত রাখে সে। যা-তা ঘরে নয় আবার। রাজারাজড়াদের মেয়ে পড়ার ঘরে। হরকুমারটা তো ওর ধারেকাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। উনি বেঁচে থাকলেও এমনটা পারতো কিনা সন্দেহ। আর তার মতো এ গাঁয়ে এতো লোকজনই বা কে ক'বে খাওয়াতে পেরেছে ছেলে-মেয়ের বিয়েতে।

নিজের মনের কথা সবচেয়ে বেশি জানে মানুষ নিজেই। মনের কাছে অস্বীকার করতে পারবে না রতনমণি নিজের অহংকারের কথা। দেবতা নিজের অহংকার রাখেনি। চূর্ণবিচূর্ণ করেছে নিজেই। আরও চূর্ণ হবার মুখে। জগদীশ্বরী মা! তোমাকে বলার কিছু নেই আমার। তুমি যা বোঝো কর! আমার কর্মফলে আমাকে সাজা দিও, আমাকে ভুগতে দাও! মেয়েটা নির্দোষ। ওর মঙ্গল কর মঙ্গল কর।

সময় বিশেষে দেবতা পাষাণ হ'য়ে যায়। কানে কথা ঢোকে না। রতনমণির কোন আরজির প্রাণের আকুতির কোন ফলই হয়নি।

কাল তার কোলে নীরবে-নিশ্চিন্তে টেনে তুলে নিয়েছে সুরপতিকে।

সুরপতির অসুখ চেপেই বিয়ে দিয়েছিল বাড়ির লোকেরা সুরপতির প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। সুরপতির ফুসফুস দুর্বল। হৃৎপিণ্ড অতি দুর্বল। বাড়ির লোকের অব্যর্থ বিশ্বাস স্ত্রীর এয়োতির জোরে স্বামী বেঁচে গেছে, বেঁচে যায়।

পিয়ালের শ্বশুরবাড়ির কেউই বিশ্বাস করেনি ছেলের পরমায়ু ফুরনোর দরুন, চলে গেছে। ওদের বিশ্বাস, বৌয়েরই পোড়া ভাগ্যের

জন্য ছেলেটা আরো তাড়াতাড়ি গেল। বিয়ে না হলে বাঁচতো বে
আরো কিছুদিন। বেঁচেও তো ছিল বাপু। বৌয়ের এয়োতির জো
নেই একদম। একদম নেই।

বিয়ের পর সুরপতি পিয়ালকে খুলে বলেছে সমস্ত। বলেছে, এ
তোমায় ডাহা ঠকিয়েছে। তোমার জীবন নষ্ট ক'রে দিয়েছে। যে
যতোই বলুক, আমি জানি আমার কোন আশা নেই বাঁচবার। আমাকে
চলে যেতেই হবে। সেদিন আমার এগিয়ে আসছে। আমি দেখতে
পাচ্ছি, আমি বুঝতে পাচ্ছি। মাঝখান থেকে তুমি নিরপরাধ হয়ে
অপরাধী হয়ে থাকবে জীবনভোর এদের কাছে। সেই দুঃখ সেই ক
বুকে নিয়েই আমাকে যেতে হবে। যেতে হচ্ছে।

বন্ধুবান্ধব এক এক ক'রে সকলেই ত্যাগ করেছে সুরপতিকে
রোগের ভয়ে, মৃত্যুর ভয়ে ও তল্লাটে আর কাউকে দেখা যেতো না
কেবল একজন—একজন ছিলো ব্যতিক্রম। অতি অন্তরঙ্গ ব
সুরপতির। ব্রজমোহন। হেন দিন নেই যে, দেখতে আসেনি
ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত মাথায় ক'রেও এসেছে। ভরদুপুরে পিচগলা রোদ্দুরে
চাঁদি ফাটিয়ে এসেছে। এসেছে রক্ত-হিমকরা হাড়-কনকনে ঠাণ্ডা
রাতেও। সকাল-সন্ধে—একবেলাও বাদ যায়নি একদিনের জন্য।

ব্রজমোহন এলেই নিস্তেজ মানুষটা একটু চনমনে হয়ে উঠেছে
বিষণ্ণমুখে মৃদুমলিন হাসি ফুটে উঠেছে একটু। চোখের নিষ্প্রভ তার
ফুটিয়ে ক্ষণেকের জন্য আলোর ঝিলিক মেরে উঠেই মিলিয়ে গেছে
যাই হোক, আচ্ছন্ন মানুষ যে ব্রজমোহনকে দেখলে পরমশান্তি পায়
যেটা বাড়ির কেউ কাছে এলে পায় না, সেটা দিনের আলোর মতো
পরিষ্কার।

ক্ষীণকণ্ঠে কতোবার ব্রজমোহনকে বলেছে সুরপতি, পিয়ালের জন্য
আমার যতো চিন্তা। তুমি ওকে দেখো। কথা দাও। তুমি কথা
দিলে আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারি। নিশ্চিন্তে ব্রজ! আর
বলতে পারেনি সুরপতি। হাঁপিয়ে উঠেছে।

ব্রজমোহন ধরাগলায় বলেছে, কথা দিচ্ছি সুর। তুমি ভালো

য়ে ওঠো।

আর ভালো হ'য়ে ওঠা। বৃথা সান্ত্বনা। বৃথা—

চলে যাবার দিনতিনেক আগে দু'জনের হাত, ব্রজমোহন আর পিয়ালের, নিজের বুকের ওপর রাখতে বলেছে সুরপতি! নিজের দুর্বল ডানহাতটা ওদের দুজনের হাতের ওপর রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। খুব আস্তে ফিসফিস ক'রে বলেছে, ব্রজ! তুমি পিয়ালকে বিয়ে কোরো। পিয়ালের দিকে তাকিয়ে বলেছে, আমি সুখী হব। আমার আত্মা সুখী হবে। ব্রজর মধ্যেই তুমি আমাকে খুঁজে পাবে। আমরা দুজনে অভিন্ন আত্মা। আমার শেষ ইচ্ছে রেখো তোমরা। পিয়ালের বিধবা নামের অপয়া নামের কলঙ্ক ঘুচিও ব্রজ!

সুরপতির আদেশ আর নিজেদের দেয়া প্রতিশ্রুতি থেকে কেউই নড়েনি একচুল। না ব্রজমোহন না পিয়াল। পিয়াল বাপের বাড়ি —মায়ের কাছে থাকলেও, ব্রজমোহন তার কর্তব্যে অবহেলা করেনি একদিনও। প্রতিদিনই এসেছে। সমস্ত সুবিধে-অসুবিধে দেখেছে নিজে থেকেই। বছর দুয়েকের মধ্যে দু'জনের হৃদ্যতার ভিতে কোন চিড় খায়নি। চিড় খাচ্ছে হালফিল। তাও পিয়ালের তরফ থেকে। ব্রজমোহন এখনো ধীরস্থির।

যখন পিয়াল-ব্রজমোহনের বিয়ের লগ্ন আসি-আসি কোরছে ঠিক সেই সময়ে দেশে এসে হাজির হরকুমার ধুমকেতুর মতো! পিয়ালের বিয়ের কথা শুনে, নিজে এসে মতামত জানিয়েছে। পিয়াল বোঝেনি প্রথমে। তার দাবি নাকচ করার ফলও পেয়েছে অল্প সময়ের ভেতর। এখন মাথা ঠাণ্ডা ক'রে, ব্রজমোহন-ট্রজমোহনের ভূত মাথা থেকে বার ক'রে দিক। চলে আসুক আমার ঘরে। আমারই স্ত্রী হবে বলে এসেছে পৃথিবীতে ও। অন্যের সইবে কেন ওকে। জ্যোতিষী হরকুমারের হাত দেখে স্ত্রীর যা রূপ-প্রকৃতি বর্ণনা করলো, হুবহু মিল একদম পিয়ালের সঙ্গে। সুরপতির ইচ্ছে-আদেশের-উপদেশের কোন মূল্য আছে নাকি! মরণের আগে অনেকে ওরকম বিকারের ঘোরে অনেক কিছু বলে। সেসব ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। পরপারের

যাত্রীকে সাময়িক শান্তি দেবার চেষ্টা বা সন্তুষ্ট করবার চেষ্টায় সকলেই তার কথায় সায় দেয়। এটা কোরতে হয়। এতে প্রতিশ্রুতির কোন কথাই উঠতে পারে না। পাগলরাই নিজের ভাবের ঘোরে এসব নিয়ে নাচানাচি করে। জ্ঞানী বুদ্ধিমানরা কখনো মাথাই ঘামায় না। জঞ্জালের মতো এ চিন্তাভাবনা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সমস্ত শুনে পিয়াল বলেছে। বলেছে বেশ শান্তশিষ্ট গলায়, এতোটুকু উত্তেজনা না এনে।—অপয়াকে ঘরে নিলে আবার তোমার না অমঙ্গল হয়।

ব্রজমোহনের হবে না?

সে-তো জেনেশুনে বরণ ক'রে নিচ্ছে।

আমিও তো জেনেশুনে দেখে নিচ্ছি। তাছাড়া জ্যোতিষীর গণনা আমি অমান্য করতে পারি না। কত পাত্রী ছেড়ে দিচ্ছি। দিনে চার-- পাঁচটা ক'রে ফেরত যাচ্ছে।

কথায় কথা বাড়ে। আর বাদ-প্রতিবাদে যেতে পিয়ালের মন চায়নি মোটে। কপালের মাঝখানে দুটো ছোট হালকা বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ওর বিরক্ত হয়ে ওঠার লক্ষণ ওটা। উঠে চলে গেছে পিয়াল ঘরের ভেতর।

এই পিয়ালের মন সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে এখন আশ্চর্যরকমে।

অবাক হ'য়ে নিরালায় একলা বসে ভাবে রতনমণি। সেই মেয়ে এই-ই। ব্রজমোহনকে দু'চোখে দেখতে পাচ্ছে না একদম। দেখতে পাচ্ছে না রতনমণিকেও। পিয়ালের কাছে বোধ হয় এদের কোন অস্তিত্বই নেই।

এবার নিয়ে পিয়াল দ্বিতীয়বার বিয়ের আবেদন নাকচ কোরেছে হরকুমারের। হরকুমার কিন্তু নাকচকে নাকচ বলে মেনে নেয়নি। ওটা পিয়ালের লজ্জা। না মানেই হ্যাঁ ধরতে হয় জায়গা বিশেষে।

আগের চেয়ে রতনমণিদের বাড়িতে আরো আনাগোনা কোরছে। মাকড়দায় মাকড়চণ্ডীর পঞ্চম দোলের উৎসব-মেলা দেখবার জন্য পেড়াপীড়ি কোরেছে খুব। অমন জাগ্রত দেবী নেই। এভাবেই উৎসবের

রীতিনীতি কোথাও আছে কিনা হরকুমারের তো জানা নেই।

মাহিয়াড়ির জমিদার রামকান্ত কুণ্ডুচৌধুরী মায়ের মন্দির নাটমন্দির শিবের মন্দির ভোগ ঘর সমস্ত করিয়ে দিয়েছে। সে কি আজকের কথা! প্রায় একশো বাষট্টি-তেষট্টি বছরের মন্দির। এই দেখতে কত লোক যায়! উৎসবে তো হাজার-হাজার।

দোলপূর্ণিমার পরে, চতুর্থীর দিন রাত্তিরে চাঁচরে কি বাজি পোড়ানোর ধুম। রঙবেরঙের। দিনে অন্নকূটে পাহাড়প্রমাণ অন্নের ভোগ মায়ের। সেই অন্নপ্রসাদ বিতরণ জনায়-জনায়। ভিড় সামলাতে না পেরে আসল প্রসাদ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে থাকে পূজারীরা।

ঠাকুরদেবতার নামে পিয়াল কোন আপত্তি তোলেনি কখনো। এবারেও তুললো না।

গেছে মা-মেয়ে হরকুমারের সঙ্গে।

হরকুমারের আবার ওটা মামার বাড়ির দেশ। মামাদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলেছে। ওর মামা-মামির যত্নের তুলনা মেলে না। মামা-মামিকে ভালো লেগেছে পিয়ালের। রতনমণির তো লেগেই আছে। মেয়ের ভালো লাগলে তার বেশি ক'রে আরো ভালো লেগে যায়।

মামা-মামি সঙ্গে ক'রে নিয়ে মন্দির দর্শন করিয়েছে। চণ্ডীদেবীর কোন মূর্তি নেই। স্রেফ একখানা পাথরে সিঁদুর মাখানো।

ফিরে এসেই এক গেরুয়াবসন পরনে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা। পিয়ালের চোখে সন্ন্যাসীর চোখ। তাকিয়ে রয়েছে। চোখের কোণ দুটো বেশ লাল। মামার বাড়ির দাওয়ায় একটা লাল কম্বলের আসনের ওপরে বসে।

হরকুমার সন্ন্যাসীর ডানদিকে জোড়হাত ক'রে বসে। মাঝে মাঝে ভাবে গদগদ হয়ে দু'চোখ বুজে থাকছে।

চোখ ফেরালো সন্ন্যাসী হরকুমারের দিকে।

মুখে মৃদুহাসি। ডানহাতটা হরকুমারের মাথায় রেখে আশীর্বাদ কোরেছে। বেটা! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। ইশারায় কাছে ডেকেছে পিয়ালকে। পিয়াল যেতে চায়নি। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। মা কানের কাছে মুখ এনে কানে কানে বলেছে। সাধুসন্ন্যাসী ছিঃ। অমান্য করতে নেই। আশীর্বাদ নে। যা। কাছে যা।

রতনমণি পিয়ালের হাত ধরে নিয়ে এসেছে সন্ন্যাসীর কাছে। রতনমণি পায়ে মাথা নত করে প্রণাম কোরেছে। পিয়াল জোড়হাত করে নমস্কার জানিয়েছে। সন্ন্যাসী নাগকেশর একগাল হেসে পাশে রাখা ঝোলা থেকে একটা পেঁচার হাড় বার করে পিয়ালের মাথায় ঠেকিয়েছে। মুখে বলেছে, তোর জন্মান্তরের বর তো আমার পাশেই বসে রয়েছে রে। বেটি, সুখী হও।

সন্ন্যাসীর হাড় ঠেকানোর সময় কেমন একটা শিহরণে সারা শরীরটা বসে বসেই দুলে উঠেছে। মনে হয়েছে, বসার জায়গাটায় মুহূর্তে ভূমিকম্প হয়ে গেল বুঝি।

পিয়ালের মস্ত পরিবর্তন নাগকেশর সন্ন্যাসীর কাছ থেকেই। হরকুমারের মাকড়দার মামার বাড়ি থেকে।

বোড়ালে নিজের গাঁয়ে ফিরে এসেও এ পরিবর্তনের জোয়ার একই ভাবে বয়ে চলেছে পিয়ালের। কোন তারতম্য ঘটেনি। একটুও উনিশ-বিশ নয়।

রতনমণি সন্ধের মুখে ঘরে আটকাতে পারে না কোনমতে।

রতনমণিকে দেখার কেউ নেই পিয়াল ছাড়া। অসুস্থ। সেধারে খেয়াল নেই। পিয়াল বেরিয়ে যাবেই ঠিক সময়ে। কি টান হরকুমারের ওপর। প্রাণের টান মনের টান হৃদয়ের টান। যতো রাজ্যের টান মিলেমিশে মহাটান হয়ে গেছে হরকুমারের বেলায়।

আজ দৃঢ়পণ কোরেছে রতনমণি, পিয়ালের পেছু নিতেই হবে। কেন যায় অতো পিয়াল। কিসের তাগিদে। মাকড়দা থেকেই সন্দেহ জেগেছে রতমণির মনে। তার ওপর পিয়ালের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে সইদের আলাপ-আলোচনায় রতনমণির চক্ষুস্থির। কাপালিক জাতের তান্ত্রিকরা নাকি অনেক কিছু করে দিতে পারে। এরকম অনেকের জ্ঞাতি-স্বজনের বাড়িতে ঘটেছে অনেক কাণ্ড। তাদের সকলের স্বচক্ষে দেখা। আর চুপ করে বসে না থেকে তাড়াতাড়ি কারণ খুঁজে বার করে

ফেলা উচিত। দেরী হয়ে গেলে সর্বনাশ হ'য়ে পড়তে কতক্ষণ।

ভয় ধরেছে রতনমণির।

রতনমণির জীবন যাক আর থাক, পিয়াল অন্তত বাঁচুক।

গাছের আড়াল দিয়ে দিয়ে অনুসরণ করে চলেছে পিয়ালকে রতনমণি।

পিয়াল হরকুমারের বাড়িতে প্রবেশ কোরেছে।

পূর্বদিকে পোড়োবাড়িটায় আশ্রয় নিয়ে লক্ষ্য রাখবে রতনমণি। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছে। জঙ্গলীগাছ আর বড় বড় উঁচু উঁচু ঘাসভর্তি উঠোনের মধ্যিখানে কনকচাঁপা গাছের তলায় বসে চোখ বুজে কি বিড়বিড় করে বলছে হরকুমার। একটা চুক্তিপত্র নিয়ে কাঠকয়লার আগুনে সেঁকাসেঁকি করছে।

সাপখোপের ভয় না করেই রতনমণি পাশের ভাঙা ঘরটায় ঢুকে পড়েছে। গা ঢাকা দিয়েছে।

হঠাৎ কি হল কে জানে। ধড়মড় করে উঠে পড়েছে হরকুমার। কটমট করে তাকাচ্ছে চারদিকে। ও চোখ রক্তকরমচা। চুক্তিপত্রের লেখাটা তিনবার উচ্চারণ করলো মুখে। চোখের সামনে ধরেছে চুক্তিপত্র উঁচু করে।—ওঁ আদিপুরুষায়···আকর্ষণং কুরু কুরু স্বাহা···।

বুকের রক্ত হিম হয়ে এসেছে রতনমণির।

সর্বনাশ হ'তে আর বাকি কোথায়।

পিয়ালের নাম যে যোগ ক'রে ক'রে দিচ্ছে মন্ত্রের সঙ্গে।

একটু দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখলো খানিক। কি ভাবলো খানিক। তারপর হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল পোড়োবাড়ির উঠোন থেকে হরকুমার।

বাড়িতে গেছে।

ঘর থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসছে রতনমণির কানে। রতন-মণি উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছে। উঠোনে কনকচাঁপা গাছের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। হরকুমার বলছে, তুমি কি জানো না, কত ছটফট করি দেরি হ'লে। রোজই এই দশা আমার। ঘরে টিকতে না পেরে এদিকে-

ওদিকে চলে যাই। শান্তি পাই না স্থির হ'তে পারি না। আবার ছুটে আসি ঘরে। এসেছো বুঝি!

পিয়ালের কণ্ঠস্বর শুনছে রতনমণি।—আমিও কি কম ছটফট করি নাকি!

তারপর গলার আওয়াজ নেমে গেছে। শুনতে পায়নি আর কোন কথা। রতনমণির ইচ্ছে হয়েছে, পাঁচিলটার ধারে গিয়ে কান পেতে শোনে। ভাঙা পাঁচিলের লাগোয়া হরকুমারের জানলা। সাবধানে চলতে গিয়ে অসাবধানী পায়ে মাড়িয়ে ফেলেছে করবীর ডালের কলম। গোরোচনা কালো ধুতরো পাতা রয়েছে ভূর্জপত্রের পাশে। ছোটো ভাঁড়ের গোরোচনা ঢেলেছে আর একটু বড় ভাঁড়ে। মিলিয়েছে কালো ধুতরো পাতার রস। তারপর ভূর্জপত্রে লিখেছে করবীর কলমে। নিখুঁতভাবে পরীক্ষা ক'রে ক'রে দেখেছে রতনমণি। হ্যাঁ, কাঠকয়লার আগুনটা এমনি কাঠের আগুনের নয়। এদিকে ওদিকে ছড়ানো কাঠের টুকরোটাকরা খয়ের কাঠের।

এসব দেখেশুনে ভড়কে গেছে রতনমণি।

আর শোনাশুনিতে কাজ নেই। হরকুমারের এই আকর্ষণ-ক্রিয়া-কলাপ কি ক'রে বন্ধ করা যায়। যে-কোন প্রকারে এই ছলকপটের হাত থেকে পিয়ালকে রক্ষে করতেই হবে। এর কোন বিধি যদি থাকে, রতনমণির জীবনের বিনিময়েও যদি হয়, সে বিহিত কোরতে হবে। এতদিনে স্পষ্ট বোঝা গেল, পিয়াল নিজে হতে আসে না। নিজে হ'তে ছটফট করে না হরকুমারের জন্য। ওকে টেনে আনা হয়, ছটফট করানো হয় আকর্ষণ বিদ্যেয়। বিহিতের জন্য কার দ্বারে ধন্না দেবে রতনমণি। কোথায় পাবে সে বিপদভঞ্জন কাণ্ডারী। কে পথ বাতলে দেবে তাঁকে, কে চিনিয়ে দেবে। কে সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী পাশে পাশে এসে দাঁড়াবে। পরামর্শ দেবে? কে কে কে?

পড়িমরি ক'রে ভাঙা-পোড়োবাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে রতনমণি।

চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। না, বাড়ি ফিরবে না। কোন

লাভ নেই। পিয়ালের ব্যাপারে যে সই জোর দিয়ে জানিয়ে দিলো, এমন ঘটনা ঘটে। তার কি কোন হদিশ জানা নেই। থাকতেও তো পারে! বরাত ঠুকে নলিনীবালার কাছে গিয়ে দেখাই যাক না অদৃষ্ট হাসায়, না কাঁদায়।

রতনমণির বাড়ি থেকে নলিনীবালার বাড়ি খুব বেশি দূর নয়। বড় পুকুরটার শানবাঁধানো ঘাটের কাছাকাছি। একটু ঘুরে যা যেতে হয়। মনের জোর মনের গতি জোরালো হাওয়ার চেয়েও বেশি। মনই দেহকে টেনে নিয়ে গেছে রতনমণির। তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে রতনমণি নলিনীবালার ডেরায়।

বকুলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতে মিশি দিচ্ছে নলিনীবালা।

কাছে এসে নলিনীবালার ছ'হাত ধরে ডুকরে কেঁদে উঠেছে। নলিন রে! বাঁচা পিয়ালকে।

নলিনীবালার চেষ্টাচরিত্রে মেয়েকে নিয়ে রতনমণি কনখলে পালিয়ে এসেছে। কাউকে না বলে-কয়ে—ব্রজমোহনের অজান্তে। পাছে দেরি হয়ে যায়। এখানে রক্ষে পাবে পিয়াল। যার আশ্রয় নিতে নলিনীর স্বামী বলে দিয়েছে, সত্যিই মহাত্মা। চেহারা দেখেই ভক্তি আসে। আপনা থেকেই মাথা নুইয়ে পড়ে। নীরব সন্ন্যাসী এই মহাত্মা শান্তি-স্বরূপ। যতটা পারে লোকজন আর লোকালয় এড়িয়ে চলে।

সবার চোখের আড়ালেই ডেরা।

নিজের ধ্যানধারণা আর সাধন-ভজন নিয়েই মগ্ন। পায়ে পড়ে রতনমণি যখন তার মাহবিপদের কথা কাতর আকুতিতে জানিয়েছে, তখন জোরে হেসে উঠে বলেছে, আরে যা, কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই। কান্নাকাটির কি আছে। সন্ধের আগে এখানে রোজ আসবে।

আসে রতনমণি পিয়ালকে নিয়ে।

বিকেলের দিকে পিয়ালের মন অস্থির-অস্থির করে। মনে হয় পাখীর মতো হ'লে ছুটে গিয়ে দেখে আসে একবার হরকুমারকে। কিন্তু নিরুপায়। ফলে অসুস্থ বোধ করে। ঘুম ঘুম আসে ছ'চোখে।

কোনদিন ঘুমিয়েও পড়ে।

শুনে শান্তস্বরূপ সন্ধের আরো আগে—বিকেলের দিকেই তার কাছে এসে বসে থাকতে বলেছে। বসে থাকলে, আগের ভাবটা আর জ্বালায় না পিয়ালকে।

এখানে এসে পিয়াল মনের দিক দিয়ে শরীরের দিক দিয়ে সুস্থ হয়েই উঠছে। রতনমণি আনন্দে ভরপুর। আগের মতোই মেয়ে 'মা' বলতে অজ্ঞান যাকে বলে। পিয়ালের চোখের আড়াল হবার উপায় নেই একদম রতনমণির। তা হোক, পিয়াল তার পিয়াল হ'য়ে থাকুক।

সকাল-সন্ধেয় মন্দিরে-মন্দিরে দেবতার আরতির বাজনা বেজে ওঠে। জায়গাটার পরিবেশ পাল্টে যায় একেবারে। স্তোত্র-গানে চতুর্দিক মুখর। হিমালয়ের কোলে সব স্বর সব শব্দ মিলিয়ে শুধু একটা অদ্ভুত আওয়াজই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে। এ আওয়াজটা কি, কিচ্ছু বুঝতে পারা যায় না। সময়ে সময়ে মনে হয় বুকের ভেতর থেকেই আওয়াজটা উঠছে বুঝি।

বোঝাবুঝি মনে করাকরি যাই হ'ক না কেন, একটা নতুন ধরনের আনন্দে ভেতর-বার যে মাতোয়ারা হয়ে যায়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না সতিসত্যি। মা-মেয়ের একই অনুভূতি। কথায়-কথায় জানাজানি হয়েছে দু'জনের!

ব্রজমোহনের কথা তুললে, রতনমণিকে বলে পিয়াল, মা এখানে এসে এর-তার কথা শুনতে আর ভালো লাগে না। তুমি বড় বন্ধন ভালোবাসো!

এদেশ মুক্তির দেশ।

দক্ষের দেশ, দক্ষযজ্ঞের দেশ। দক্ষের অহঙ্কার চূর্ণ। অর্থাৎ অহঙ্কার থেকে মুক্তি। সতীরও মুক্তি অহঙ্কারীর দেহের খোলস ত্যাগ ক'রে। অহঙ্কারী দক্ষপিতার কারণে যে দেহ, সে-দেহ বিসর্জনে। মুক্তি শিবেরও। সতীহারা শিব মুক্ত। নিজে যোগযুক্ত যোগী আবার। তাদের ধ্যানী-মৌনী। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

ত্রাসে বুক কেঁপেছে রতনমণির। এসব কি কথাবার্তা পিয়ালের। এক কোরতে এসে আর এক না হ'য়ে যায় শেষে। সন্ন্যাসীদের দেশে এসে পিয়াল কি সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে নাকি!

দু'তিন দিন ধরে চোখের পাতায় একদম ঘুম নামছে না। তিনরাত কেটেছে। ঠায় পা ছড়িয়ে বিছানায়। রতনমণি পাগল হ'য়ে যাবে নাকি! মেয়ের মুখের দিকে একভাবে চেয়ে বসে থাকে। হারাই হারাই ভয়। ঘুমন্ত মেয়ের ঘুম পাতলা হয়ে এলে, পাশ ফিরতে গেলে, চোখ চেয়ে দেখে মায়ের মুখ।—আচ্ছা, মা! তুমি কি রোগে না পড়ে ছাড়বে না নাকি? ধনুকভাঙা পণ কোরেছো দেখছি। ঘুম নেই, নিদ্রা নেই। মহাবিপদ হ'ল দেখছি। চলো, ফিরে চলো। ওই দেশ-ঘরই ভালো তোমার।

শিউরে উঠেছে রতনমণি!

গোঁ ধরেছে পিয়াল আর কিছুতেই থাকা চলবে না।

পিয়ালের গোঁ ভীষণ। হ্যাঁ তো হ্যাঁ, না তো না। চোখের সামনে সেই আকর্ষণ-ক্রিয়ার ছবি ফুটে উঠেছে। হরকুমারের আকর্ষণ-ক্রিয়া। মামার বাড়ির ওখানের—নাগকেশর সন্ন্যাসীর শিক্ষাদীক্ষায়। আর নয়, আর নয়।

রতনমণি শান্তস্বরূপকে কেঁদে অনুরোধ কোরেছে, বাবা! পিয়ালের মন এমন ক'রে দিন যাতে ও আর না হরকুমারের বাড়িতে যায় কখনো। যেতে ইচ্ছেও যেন না করে কখনো। হরকুমারের ক্রিয়া-কলাপের কোন ফল যেন না ফলে আর পিয়ালের ওপর। ওদের কব্জা থেকে মুক্ত করে রাখুন চিরদিনের জন্য।

সন্ন্যাসী শান্তিস্বরূপ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে রতনমণিকে। মৃদু হেসে বলেছে, ঠিক আছে। তোর ইচ্ছেই পূর্ণ হোক!

পূর্ণিমার সন্ধে, বিশেষ পুজোয় থাকতে হবে পিয়ালকে। শান্ত-স্বরূপ আদেশ কোরেছে রতনমণিকে। নির্দেশ ক'রে দিয়েছে, পিয়াল হলুদ শাড়ি জামা পরে আসবে। গেরো দেয়া গেরো দেয়া হলুদ সুতোর মালা গলায়। একটা হলুদ কম্বলের আসন নিয়ে আসবে। এটা

বিশেষ ক'রে পূর্ণিমার দিনে। এখনো দিনচারেক বাকি। এ তিনদিন এমনিই আসবে। যেমন আসছে। একটা দিনও বাদ গেলে চলবে না।

প্রণাম ক'রে ঘরে এসেছে রতনমণি।

সেই রাত থেকে নিশ্চিন্তে অঘোরে ঘুমিয়েছে খুব।

অভ্যেসমতো ঘুম ভেঙে গেলে চেয়ে দেখেছে পিয়াল। উঠে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখেছে, সত্যি না তো। বকুনির ভয়ে মটকা মেরে চোখ বুজে পড়ে রয়েছে এমনি-এমনি। না, এমনি-এমনি নয়। সত্যি।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে ঘুমিয়েছে পিয়াল পরম শান্তিতে— নির্ভয়ে।

···এক এক ক'রে চারদিন কেটে গেল।

জিনিসপত্তর ঠিকঠাক কোরতে সারাটা বেলা কেটেছে রতনমণির। শান্তস্বরূপের আদেশ প্রতি অক্ষরে পালন কোরেছে। হলুদশাড়ীতে মেয়ের রঙটা আরো খুলেছে। দেখাচ্ছে বেশ সরস্বতীঠাকরুন, সরস্বতী-ঠাকরুন। সকলকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করছে রতনমণির। ওরে পূর্ণিমার আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে মর্ত্যে—মাটির বুকে মানুষের মধ্যে। রতনমণির ঘরে। পিয়ালচাঁদ, পিয়ালচাঁদ, পিয়ালচাঁদ।

বিকেলে এসে বসে থাকতে হয়েছে খানিক মা-মেয়েকে শান্তস্বরূপের সাধনঘরে। সন্ধে পেরিয়ে যাবার পরও। পূর্ণিমা লাগতে ক্রিয়াকলাপ শুরু ক'রে দিয়েছে শান্তস্বরূপ একমনে।

ঘরের মধ্যিখানে হলুদকম্বলের আসনে বসে পিয়াল।

ওর কাছ থেকে হাত ছয়েক দূরে দূরে চারকোণে চারটে হোমকুণ্ডু। তামার ত্রিকোণ। হোমের আগুন জ্বলছে। এক এক হোমকুণ্ডে হোম সেরে আহুতি সেরে, এবার মাঝখানের হোমকুণ্ডে হোম কোরতে বসেছে এসে শান্তস্বরূপ। আসন আগে থেকেই পাতা ছিল। পাতা আছে।

এ হোমকুণ্ডু পিয়ালের সামনা-সামনি। মাত্র হাততিনেক দূরে। কোশাতে ঘি-মধু-চিনি মেশানো। কুশিতে ওঠাচ্ছে আর হোমের মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে আগুনে আহুতি দিচ্ছে।—ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি···স্তম্ভয়···

হ্রীঁ ওঁ স্বাহা !···স্বাহা···স্বাহা !

রতনমণি শাড়ির আঁচল গলায় জড়িয়ে জোড়হাত করে দেখছে। আর মনে মনে বলছে, মা গো। রক্ষে কর রক্ষে কর ! পিয়ালের মঙ্গল কর ! মঙ্গল কর !

বগলামুখীর স্তম্ভন ক্রিয়ার হোম শেষ ক'রে, পিয়ালের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছে প্রাণখুলে শান্তস্বরূপ। তুমি মহামায়ার মেয়ে। তিনি তোমায় কোলে করে আছেন।

হোমের বিভূতির তিলক কপালে এঁকে দিয়েছে শান্তস্বরূপ পিয়ালের।

শান্তস্বরূপের কাছ থেকে নির্ভয়-অভয়ের আশ্বাস-আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে গাঁয়ে ফিরেছে আবার মা-মেয়ে খুব খুশি মনে। কিন্তু মনের খুশি মনেই মিলিয়েছে দু'জনের।

এমন অদ্ভুত, শুধু অদ্ভুত নয়, বড় মর্মান্তিক ঘটনার মুখোমুখি হ'তে হবে—এটা কল্পনার অতীত। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, কল্পনার ভয়ঙ্কর দৃশ্যের চেয়েও বাস্তবের দৃশ্য সময় সময় ভীষণ ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে।

দেখেশুনে এ গাঁয়ের আকাশ-বাতাস গাছ-পালা-পুকুর মাটি—পাখী-পশু পর্যন্ত ত্রাসে ধুঁকছে, ভয়ে কাঁপছে। কখন ওপরওলার নিদারুণ-নির্দয় অভিশাপ নেমে আসে কার ওপর।

চোখের সামনে দেখছে সবাই মানুষটার কি ভীষণ পরিণতি। দু'চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে কেবল। দশবছর বয়সের অবস্থায় ফিরে এসেছে আবার আচমকা। কথা না কইতে পারা, অস্পষ্ট ভাঙা-ভাঙা জড়ানো উচ্চারণ। পিয়ালদের বাড়ির দরজায় এসে বসে থাকে প্রতি বিকেলে। পিয়ালকে দেখার আশায়। যাকে পায় উৎসুক হ'য়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, পিয়ালকে দেখেছো কি তোমরা ? কবে আসবে, কোথায় গেছে ? ও না হলে, আমার যে মহাব্রত উদযাপন করা হবে না।

পিয়ালরা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছে শুনেই হরকুমার দিকবিদিক

জ্ঞানশূন্য। দৌড়ে এসেছে এদের বাড়িতে। পায়ে পড়তে গেছে পিয়ালের, পড়তে গেছে রতনমণির। ওরা সরে দাঁড়িয়েছে। জোড়-হাতে ক্ষমা চেয়েছে দু'জনের কাছে বার বার। সে অপরাধটা তার অপরাধের শাস্তিতে পেয়েছে প্রচণ্ড। এখন একটা পাওনাও নাকি। তার জীবনের মোক্ষম পাওনা এটা। এটা পেলে, তবেই না তার মুক্তি তার শান্তি। মৃত্যুতেও তার পরমতৃপ্তি। ক্ষমাভিক্ষা পেলে তবেই।

না জানিয়ে কাউকে পিয়ালরা চলে গেছলো সত্যি, কিন্তু এতে না দমে হরকুমার দ্বিগুণভাবে আকর্ষণবিদ্যা প্রয়োগ ক'রে গেছে প্রতিদিন পিয়ালের ওপর। ফল ফলেনি কোন, বরং মনে হয়েছে, নিজেই কেবল দুর্বল হয়ে পড়ছে দিনকে দিন। তবুও ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করেনি।

চিরদিনের মতো বন্ধ কোরতে হয়েছে একদিন।

পূর্ণিমায়। কাজের সময়। হঠাৎ মনে হল, ঠিক মনে হ'ল বললে, ভুল হবে। এ যেন প্রত্যক্ষ ঘটনা ঘটে গেল হরকুমারকে নিয়ে। মন্ত্র-নাম লেখা ভূর্জপত্রটা খয়ের খয়ের কাঠের কয়লার আগুনের ওপর ধরেছে। ধরে, মন্ত্র উচ্চারণ কোরতে যাচ্ছে মুখে, কাঠকয়লার আগুনের তাপটা হঠাৎ ভীষণ বেড়ে উঠেছে। চোখ-মুখ-দেহ পুড়ে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে। অসহ্য। এতোদিনে এরকম হয়নি। ঝড়ের কোনই চিহ্ন ছিলো না আকাশে বাতাসে। মেঘও নেই। তবু ক্রিয়াকলাপের জায়গাটা ঘিরে কি ঘূর্ণিঝড়। হাতের ভূর্জপত্র উড়ে গেছে কোথায়! উঠে দাঁড়িয়ে চাঁপাগাছের গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরেছে। হাত দিয়ে ধরে থাকতে পারেনি। ঝড়ের দাপটে ছিটকে পড়ে গেছে। আর সেই মুহূর্তে বুকের যন্ত্রণা শুরু হ'য়ে গেছে। একসঙ্গে জনাদশেক লোকের ইস্পাত-কঠিন মুঠোর ঘুষি বুকে দমাদম করে আছড়ে-আছড়ে মারলে যেমন যন্ত্রণা, সেইরকম।

বাঁচবার জন্য চিৎকার কোরতে গিয়ে গলার স্বর বেরোলো না। সেই থেকে কথা কইতে কষ্ট। স্বর ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। কিছুতেই বেরোতে চায় না আর। বড় কষ্ট।

শুনে, হতভম্ব হতবাক দু'জনেই। মা-মেয়ে। রতনমণি আর পিয়াল।

হরকুমারের চোখের জলে মা-মেয়ে কেঁদে সারা। রতনমণি হরকুমারের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়েছে। বলেছে, সুস্থ হয়ে ওঠো বাবা, ভালো হ'য়ে ওঠো।

অনুশোচনার আগুনে দগ্ধে যাচ্ছে রতনমণির ভেতর। এরকম দেখবে, আশা করেনি। হরকুমারের এদশা হ'ক—স্বপ্নেও চায়নি। চেয়েছিলো, মতিগতির পরিবর্তন হ'ক। ঠাকুর! এর মঙ্গল কর!

হরকুমারকে দেখার পর থেকে পিয়ালেরও মনটা বড্ড খারাপ হ'য়ে গেছে! মানুষটার এসবের কারণ—হেতু তো সে-ই! তাকে ঘিরেই না যতো কাণ্ড। মনে মনে প্রার্থনা কোরেছে, ভগবান ওর কষ্ট লাঘব কর। চোখে দেখা যায় না।

একটা ধাক্কা খাবার পর যে আর একটা ধাক্কা খেতে হবে এদের, তার জন্য মা-মেয়ে প্রস্তুত ছিল না! প্রস্তুত থাকুক বা না থাকুক, যে স্রোত দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে আসছে ওদের মনের শান্তি-সুখ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বলে, তাকে কে প্রতিরোধ করবে! তার জগতে ভাসিয়ে দেয়াই কর্তব্য ধর্ম। সে তার কর্তব্য, তার ধর্ম পালন করে যাবেই যাবে। এ ব্যাপারে কোন ভুল-ভ্রান্তি নেই, উল্টে যাবার কোন দুরাশা করবার কিছু নেই। এ যেন নিয়তি এ যেন অবধারিত।

দিশেহারা পথিকের মতো সামনে এসে হাজির হ'য়েছে ব্রজমোহন। শূন্যে দৃষ্টি, ভাবলেশহীন মুখ। কালো হ'য়ে গেছে। শীর্ণও, হরকুমারের মতো অতো না হলেও, ব্রজমোহনের আগের চেহারার তুলনায়। প্রকৃতিতে আর চালচলনে একেবারে উন্মাদ। রোজ নাকি একবার করে আসে এ বাড়িতে পিয়ালকে খুঁজতে। বলে, পিয়াল হারিয়ে গেছে। সুরপতি এসে ওকে নিয়ে গেছে। যা হ'ক, পিয়াল তো আর ফিরে আসবে না, আসবে না।

পিয়াল নিজেই সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ব্রজমোহনকে বলেছে, আমি এসেছি ব্রজ। আমি এসেছি। আমি পিয়াল। পিয়াল, পিয়াল।

কে কাকে দেখবে, কে কার কথা শুনবে।

উদভ্রান্ত দৃষ্টি ব্রজমোহনের। বাইরের কিছুই ও দেখছে না। নিজের মনের কথাই শোনে বোধ হয়। বাইরের কোন কথাই কানে যাচ্ছে না। বাইরের সবটাতেই বুঝি ও বধির।

চিনতে পারলো না পিয়ালকে ব্রজমোহন। চিনতে পারলো না রতনমণিকেও। যেমনভাবে আসে এসেছিলো, তেমনিভাবেই বেরিয়ে গেছে বলতে বলতে—পিয়াল হারিয়ে গেছে। সুরপতি নিয়ে গেছে। আর ফিরে আসবে না। মাথা নাড়তে নাড়তে বলেছে, না না না···।

পৃথিবীতে সব থেকে বেশী আশ্চর্যের বিষয় বোধ হয় মানুষের জীবন। আর জীবন অধ্যায়ের এক এক সময়ে কত না ধ্যানধারনার বাইরে, চিন্তার বাইরে বিচিত্র ধারার বিচিত্র ঘটনা। মানুষ চায় কি? চায় অনেক কিছু, যা ভুল ক'রে চাওয়া। পায় কি? পায়ও অনেক কিছু, যা চায় না।

পিয়ালের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।

রতনমণি তো পিয়াল সুখী হবে বলেই সুরপতির সঙ্গে ঘটা ক'রে বিয়ে দিয়েছে। স্বামীকে স্বামী হিসেবে কোনদিনই নিতে পারে নি। বিয়ে হয়েও ও কুমারী মেয়ে। ব্রজমোহনের সঙ্গে বিয়ের সুখে যতো বাধা বিপত্তির ঝড় হরকুমারকে নিয়ে। ভাগ্য আর কাকে বলে। কারণে-অকারণে কাজ পণ্ড। চূড়ান্ত অশান্তি। এমন যে, মনে দাগ কেটে থাকবার মতো। মেয়েটা এই বয়েসেই ঘা খেয়ে খেয়ে ভেতর বার তছনছ হয়ে গেছে। রতনমণি ভাবে, মেয়েকে সুখী করতে গিয়ে দুঃখী ক'রে তুলেছে সে একা নিজেই। চরম দুঃখী। ঈশ্বরকে প্রার্থনা করে রতনমণি।—সকলের দুঃখ আমায় দাও! মাথা পেতে নেবো। সবার মঙ্গল কর। পিয়ালের মঙ্গল কর। ওকে শান্তি দাও! শান্তি দাও।

পিয়ালের চোখে ভেসে ওঠে সুরপতির মলিন মুখের পাতলা ঠোঁটের বিষণ্ণ হাসি, ভেসে ওঠে জ্যোতিহীন সজল চোখ। ভেসে ওঠে ব্রজ-মোহনের অভয়-আশ্বাসের মুখ। কানে বেজে ওঠে সুরপতির কথা। ব্রজর মধ্যেই তুমি আমাকে খুঁজে পাবে। খুঁজে পেতো পিয়াল।

কিন্তু—কিন্তু সবই হারিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল পিয়ালের বড় তাড়াতাড়ি। আহা, একটুও দেরী কোরতে পারলো না সময়, নিয়তি। এতো নিষ্ঠুর এতো পাষাণ! একজন চলে গেল পিয়ালকে ছেড়ে, আর একজন থেকেও নেই। গভীর ভালোবেসে ফেলার পরিণাম। ব্রজমোহন অতি চাপা, অতি ঠাণ্ডা। নির্বিবাদী মানুষ। বেশ কিছুদিন ধরে পিয়ালের মনের দিক থেকে সাড়া না পাওয়ার ব্যথা বেদনা কাউকে প্রকাশ কোরতে না পারায়, হয়তো নিজের কষ্টের বোঝা লাঘব করবার জন্য ভুলতে চেষ্টা কোরেছে নিজেকে অনবরত। হয়তো সেই জন্যই ব কিছু ভোলার ব্যামো বেঁকে বসেছে মনজুড়ে। অদর্শনে-অদর্শনে ন্মাদই হ'য়ে গেল। পিয়ালেরই বরাত জোরে।

হরকুমার জিদের বশে সমস্ত কিছু কোরেছে, নিজের অহঙ্কারকে-প্রতিষ্ঠা কোরতে চেয়েছে তাকে ঘরে তুলে। সেখানে শূন্যে প্রাসাদ তরীর সাধও তার ধুলিস্মাৎ। আঘাত সইতে পারে নি। ভেঙে খান ান হ'য়ে গেছে। পিয়াল না জন্মালে, পিয়াল দেশে না ফিরে এলে, রপতি চলে যাবার পর, দু'দুটো তরুণ প্রাণ এভাবে অকেজো-পঙ্গু হ'য়ে ড়তো না। তারই জন্য তো এটা হ'তে পারলো!

পিয়ালের দু'চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে।

ভিজে চোখে দেখছে পর পর তিনজনের মুখ। সুরপতি ব্রজমোহন রকুমার। শিউরে উঠেছে পিয়াল। না, না। সুরপতির সঙ্গে এরা াকবে কেন। সুরপতি চলে গেছে, আর নেই। এরা দু'জন বেঁচে াকুক। সুস্থ মনের হয়ে বেঁচে থাকুক। পিয়াল কিচ্ছু চায় না। কচ্ছু নয়। এদের দুর্ভোগ, এদের কর্মফল পিয়ালের ওপর বর্তাক। রা মুক্ত হোক। মুক্ত হোক পিয়ালের রূপের আকর্ষণ থেকে, িয়ালের মোহ থেকে। শান্তির দেবতা, শান্তি কর এদের। শান্তি াও এদের। পিয়ালকে সর্বান্তঃকরণে ভুলে গিয়ে যেন এরা সত্যিকারের খী হয়।

সুরবালা।

সুরবালা নিজের চোখের মাধুর্য নিয়ে যতটা সুখ্যাতি কুড়িয়ে ঠিক ততটাই অখ্যাতি পেয়েছে জীবনে। নয়ন-জীবন থেকে রাক্ষু দর্শন। কোন্‌টা সত্যি?

লেখা কথা কয়েছে।

কথা আর ব্যথা, ব্যথা আর কথা।

ছুচোখে যে কি আছে, যার চোখ সে নিজেই জানলো না, জান পারলো না। জেনেছে অপরে। জানতে পেরেছে আশপাশের লো তার জ্ঞাতিস্বজন আর ঘনিষ্ঠ মহল। তাও খ্যাতি হোলে কথা ছিল তা নয়, নিখাদ বিদ্বেষে ভরপুর বরং।

প্রশংসার চেয়ে অখ্যাতি বদনাম হাওয়ায় হেঁটে বেড়ায় দ্বি গতিতে। দ্বিগুণ বোললেও ঠিক বলা হয় না বোধ হয়। চতু হোলেও হোতে পারে। নিন্দুকের সংখ্যা আর নিন্দে শোনার শ্রো বড় একটা কম নয়। ভালো শোনার দলের চেয়ে ঢের—ঢের বেশি

কানপাতা দায় হোয়ে দাঁড়িয়েছে সুরবালার। না পারছে বাড়ি তিষ্ঠতে, না পারছে পাড়াপড়শীর কাছে মুখ ছাখাতে। চোখ তুলে ক কওয়া, চোখে চোখে তাকিয়ে থাকা, সে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ছুটে পালাবে তখুনি। কি ভয়! সুরবালার চোখ বুঝি সন্থ-সন্থ গি খাবে ওদের মুহূর্তে। চোখ সম্বন্ধে কতো বিশেষণই না ছড়াচ্ছে চতুর্দি আগুনে চোখ। দিনরাত আগুন ছুটছে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ম

ালিয়ে পুড়িয়ে খাক কোরে দেবে। রাক্ষুসে চাউনি। বুকের রক্ত শুষে াবে দৃষ্টিপাতে। বিদ্বেষ উপচে পড়ছে। যে দেখবে, তার ঘরোয়া বচ্ছেদ নিশ্চিত। উন্মাদগ্রস্ত হোয়ে পথে ঘাটে দাপাদাপি কোরে বেড়াতে সময় যাবে না বেশি।

মহা মুশকিলে পড়েছে সুরবালা।

কি করে, কোথায় যায়, কার কাছে যায়! কে এমন সুহৃদ আছে এই বিপদ সাগরের অথৈ জল থেকে উদ্ধার করে। এমন বদনাম কি বরাবর ছিলো?

তা কেন হবে।

ছোটবেলায় তো চোখের গুণাগুণ শুনতে শুনতে লজ্জায় কুঁকড়ে এতোটুকু হোয়ে যেতো। কেবলি মনে হোয়েছে, কি কোরে আড়ালে রাখে নিজেকে। আলমারীর পেছনে গিয়ে লুকিয়েছে, লুকিয়ে থাকার কি উপায় আছে নাকি! ছোঁ মেরে চিলের মতো টেনে বার কোরবে অমনি খুড়তুতো ভাই-বোনেরা বৌদিরা। নতুন অতিথি অভ্যাগতদের সামনে জোর কোরে নিয়ে আসবে। দাঁড় কোরিয়ে রেখে, হেসে গড়িয়ে পড়ে বোলবে, দেখছেন ভুবনভোলানো চোখ। লাখে একজনের চোখে খুঁজে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। বৌদিরা চিবুক ধরে অন্তরে সুরে বোলেছে, সুর আমাদের মৃগনয়নী-মায়াবিনী। বিধাতাপুরুষ তুটি থাকের ঘনপাতায় কাজল টেনে দিয়েছে বুঝি!

বৌদি-ভাইবোনেরা যে মিছিমিছি বোলতো, তা কিন্তু মোটেই নয়। প্রথম ত্থাখায় বিয়ে! শ্বশুর-শাশুড়ী চোখের মাহাত্ম্য প্রকাশে পঞ্চমুখ। বোলতে গেলে, চোখের আকর্ষণেই বিয়ে হোয়ে গ্যাছে সুরোবালার। স্বামীর তো নয়নের মণি যাকে বলে।

চোখের মহিমায় আদরে আদরে ভুঁয়ে পা পড়েনি সুরবালার শ্বশুর-বাড়িতে। লিভার শুকনো ব্যামোয় বিধুভূষণ অকালে কালের কোলে ঢলে পড়েছে যখন, তখনো সুরবালার চোখে চোখ রেখে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে।

এতো ভালো শ্বশুরবাড়ি, এতো ভালোবাসা সকলের, কেউ বলে নি

কখনো মুখ ফসকেও, সুরবালা অপয়া, সুরবালা অলক্ষ্মী। ওর জন্যেই ছেলেটা চলে গ্যালো। বরং উল্টোটাই বলেছে, ছেলেটার কম আয়ু ছিলো নিজের কর্মফল শেষ হোয়ে গ্যালো, চলে গ্যালো। মৃত্যুর তো আর ছোট বড় বয়েস নেই। যার যখন সময় হবে, তাকে তখন যেতে হবে। অনেক আগেই যেতে হোতো বিধুভূষণকে, তবু সুরবালার জন্যই আরো কটাদিন থাকতে পেরেছে তবু।

বিধুভূষণের অবর্তমানে সুরবালার মনের আমূল পরিবর্তন হয়ে গ্যালো হঠাৎ। সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর চওড়া কোরে লাগানো। কপালে বড় টিপ। লাল চওড়া পেড়ে শাড়ি। পায়ে আলতা। একেবারে সাক্ষাৎ ভৈরবী। সুরবালা নিজেও বোলেছে, আমি দেবী অংশ আমি দেবী ভৈরবী। শুধু ভৈরবী নয়, দশমহাবিদ্যার দশটি রূপের সাজে সেজেছে এক একদিন। ধূমাবতীর সাজে সম্পূর্ণ নিরাভরণা। বিধবার বেশ। থানধুতি পরনে।

বাড়ির লোকেরা অবাক!

ভয় ছিলো সুরবালাকে নিয়েই বেশি। অমন সরল-সহজ মেয়েকে বাঁচানো যাবে কি উপায়ে। কেঁদে কেঁদে অতো সুন্দর চোখ দুটো না নষ্ট হোয়ে যায় শেষে। তা হয় নি। চোখে জল ঝরে নি এক ফোঁটা। তার ওপর এই সব কাণ্ড! এ আবার ভয়ের চেয়েও ভয়। মাথাটা খারাপ হোয়ে গ্যালো না তো! কেউ কেউ বোলেছে আবার, ডাক্তার-বদ্যির রোগ নয় এসব। সাধু-সন্ন্যাসী বা ওঝারা ভালো কোরলেও কোরে দিতে পারে। রোগ ধরলেও ধরে ফেলতে পারে ঠিক ঠিক। সারিয়ে তোলা দুঃসাধ্য নয় ওদের কাছে।

শাশুড়ির দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

ধন্যি বরাত কোরেছিলো বটে।

নিশ্চয় অনেক পাপ ছিলো পূর্বজন্মে। ছেলেটা চলে গ্যালো তারই কর্মফলে, বৌটার না আবার কিছু হয়।

গুরুজনরা শাশুড়ির কানে মন্ত্র দিতে শুরু কোরে দিয়েছে, আর একদণ্ড দেরী নয়। গুরুদেবের নাম স্মরণ কোরে গুরুদেবকে পুরী

থেকে আনিয়ে ফ্যালো শীগগির, শীগগির! যতো দিন যাচ্ছে, সমূহ বিপদ এসে আধিপত্য কোরতে আরম্ভ কোরে দিয়েছে। সর্বনাশ হবার আগেই ব্যবস্থা নেয়া ভালো। বিপদ একবার জেঁকে বোসলে, সহজে হটানো দায়।

কি কোরবে না কোরবে—কূল-কিনারা পাচ্ছিলো না কোনো শাশুড়ি। এ যেন অকূলে দাঁড়িয়ে কিনারার রেখা দেখতে পেয়েছে। আশার আলো একটা ঘন অন্ধকারে উঁকি মারছে। উনি সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী। কৃপা হোলে বৌমা আমার মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হোয়ে উঠবে। ওঁর যেরকম দয়া, আশীর্বাদ দিতে কৃপণ নন উনি মোটেই।

কেউ কারো নয়। কেউ আগে আর কেউ পরে যাবে—এই যা তফাৎ। আত্মার মৃত্যু নেই। তোমার আত্মায় সেই আত্মা রোয়েছে। তোমার স্বামী বিধুভূষণের আত্মা। তোমরা—মেয়েরা বোঝো না! তোমাদের কি অসীম শক্তি। দশমহাবিদ্যার প্রত্যেক রূপ ক'টি তোমাদের ভেতর। তাকে এক এক কোরে জাগিয়ে তোলো। তার সাজে নিজেকে সাজিয়ে তুলে। তার ধ্যানে-জ্ঞানে নিজেকে ডুবিয়ে দাও! নিজেকে চিনতে পারবে। দেখবে কি অপার আনন্দে তুমি সাঁতার কেটে চলেছো দিনেরাতে। সে-আনন্দে নেই শোকের ছায়া। নেই দুঃখের কাতর স্পর্শ, নেই বিচ্ছেদের বিরহ।

বিধুভূষণ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যাবার পর সুরবালার বাপের বাড়ির গুরুদেব এই সব উপদেশ শুনিয়েছে শোকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। সুরবালার মনকে শক্ত করার জন্যে।

সুরবালা রাম না হোতে এ রামায়ণ শুনেছে বহুবার বাপের বাড়িতে যাতায়াত করার সময়। আশ্চর্য যোগাযোগ। গুরুদেবও এসে গেছে হঠাৎ কোরে। সুরবালাকে দেখেই, উদ্দেশ্য কোরেই দশমহাবিদ্যাসাধক গৃহী সাগর শর্মা মানুষের অমৃত জীবনের কথা বোলেছেন নানাভাবে, নানা-উপমায়! সুরবালার ভালো লেগেছে। ভেতরে পরতে পরতে দাগ কেটে কেটে বোসেছে কুলগুরুর এক একটা কথা। এক একটা

ছবি হোয়ে ছেপে গেছে।

গোড়ায় অতো বোঝে নি, কেন সাগর শর্মা তাকে দেখলেই 'আত্মা-আত্মা' কোরে এসে শোনান। মৃত্যু নেই অমর। বিধুভূষণের অবর্তমানে প্রকৃত মর্ম বুঝেছে। তার পরের জীবনটা বোধহয় চাক্ষুস দেখতে পেতেন, তাই আগে থেকেই তৈরি কোরে রাখার প্রয়াস ছিলো তাঁর। হয়তো উনি দূরদৃষ্টির মানুষ।

সাগর শর্মার কথামতো চলেছে সুরবালা।

মৃত্যু আছে—ভুলতে গিয়ে, সমস্ত কিছু ভুলেছে। এমন কি আগের সুরবালাকেও। সে যে একজনদের বাড়ির বৌ, একজনদের ঘরের মেয়ে —এটাও। দুবাড়ির কেউকেউ বুঝি সে ছাখে নি কখনো। চেনে না। তার একমাত্র পরিচয়—সে আত্মজ্ঞানী। আত্মাই দুর্গা কালী তারা ভুবনেশ্বরী ধূমাবতী···। সুরবালা নিজেই দশমহাবিদ্যা!

সুরবালা যে স্বয়ং দশমহাবিদ্যা, এ ধারণা বিশ্বাস থেকে একচুল নড়ছে না। কারো কোনো বলাবলির কানে যাচ্ছে না, মাথায় ঢুকছে না। দু'বাড়ির সকলেই প্রমাদ গুনছে সুরবালাকে নিয়ে। দুবাড়িতে তুমুল মানসিক ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই ঝড়ে ধীরস্থির মাত্র দুটি প্রাণী। কোনো ছোঁয়া লাগছে না কোনো বিষয়ের। সুরবালার আর সাগর শর্মার।

সাগর শর্মাকে অনেকেই অনুরোধ কোরেছে, আপনার কথা কিন্তু মন দিয়ে শোনে সুরবালা। শুধু শোনেই না। মানেও। আপনি একটু চেষ্টাচরিত্র করুন না।

সাগর শর্মার একই উত্তর।—বেশ তো আছে। কাউকে জ্বালাচ্ছে না তো ও। আগের অবস্থায় ফিরে এলে মহাবিপদ! মহাবিপদ! বোলতে বোলতে চমকে উঠেছে, শিউরে উঠছে সাগর শর্মা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে জোরে।

পুরী থেকে এসে হাজির হোয়েছেন দেবপ্রিয় মহারাজ। সুরবালার শ্বশুরবাড়ির গুরুদেব। তিনি নিজে আসেন নি। লোক গিয়ে নিয়ে এসেছে। বয়েসের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন। রঙের জেল্লা মরে নি।

গলার জোর কমেনি। চামড়া-মাংস ঝুলে পড়ে নি, কুঁচকে যায় নি। ধবধবে সাদা চুলে বোঝাই মাথা। চোখের তারায় নীল আভা। দৃষ্টি ম্লান হয় নি। বেশ প্রখর। সাতাশি-অষ্টআশির কাছাকাছি বয়েস। চলাফেরার মধ্যে বার্ধক্যের অসমর্থ ভাব নেই। সতেজ সবুজ যৌবন!

দেবপ্রিয় মহারাজ আবাল্য ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসী।

বাড়িময় গুঞ্জন. একটা কোনো বিহিত হবে এবার। মহারাজের যখন জ্ঞানদর্পণ, তখন সুরবালা সুস্থ-স্বাভাবিক না হোয়ে যায় না। অনেক সাধ্যিসাধনা কোরেও ওঁকে আনা যায় না। সুরবালায ব্যাপারটা শোনা মাত্র রাজি হোয়ে গ্যাছেন সঙ্গে সঙ্গে। সকলের মুখেই হাসি-খুশির ঢল।

সুরবালার?

দেবতা ন জানন্তি কুত মানব। যেমন ছিলো, তেমনি। মুখ দেখে আঁচ করার উপায় নেই। নীরব-নির্বিকার।

সমস্ত দেখে শুনে, সুরবালাকে দীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন মহারাজ। বোলেছেন, একটু সময় লাগাব। তবে আস্তে আস্তে সাধারণ হোয়ে উঠবে। একটু ঢোঁক গিলে চোখ বড় বড় কোরে চাপা গলায় বোলে-ছেন, ওকে চোখে চোখে সাবধান কোরে না রাখতে পারলে, একটা অঘটন ঘটে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি। সাধারণ ভাবে ফিরিয়ে আনার ঝুঁকি বড় একটা কম নয়। বিধুভূষণকে মনে পড়লে, মাথা ঠিক রাখতে পারবে কি না—সন্দেহ।

চোখের জলে বুক ভিজিয়ে মহারাজকে অনুরোধ করেছে শাশুড়ি। —এ তো আর এক ফ্যাসাদ! যা হয় একটা ব্যবস্থা কোরে দিয়ে যান বাবা। না হোলে ছাড়ছি না কিছুতেই। আরো কিছুদিন থেকে না হয় করুণা কোরে যান এ অভাগিনীকে। দোহাই বাবা।

খানিক আনমনা হোয়ে রইলেন মহারাজ। তারপর হেসে ফেললেন।—ভাবছি, যেটা ভয় কোরছি, তড়িঘড়ি না এগিয়ে এসে পড়ে সেই ভয়টা। ছাখা যাক।

মহারাজের থাকাকালেই একটু-একটু কোরে সুরবালা স্বাভাবিক

হোয়ে উঠেছে। যতো নিজের মধ্যে নিজে ফিরে এসেছে আগেকার মানুষে, ততো বিধুভূষণের জন্যে অস্থির হোয়ে পড়েছে।

স্নেহ-সহানুভূতি ঝরা কণ্ঠে বোলেছেন মহারাজ, মা। পৃথিবী থেকে কেউ হারিয়ে যায় না। বিধুভূষণ নিজের দেহের মধ্যে আবদ্ধ হোয়েছিলো এতোদিন। এখন সে মুক্ত। সে অনেক বড়। সকলের প্রাণে তার প্রাণ এখন। তুমি ছ্যাখার চেষ্টা কোরলে, দেখতে পাবে। তার কথা শোনার চেষ্টা কোরলে, শুনতে পাবে। তোমর আত্মার-প্রাণেও ও মিশে রয়েছে। তোমার ভেতর থেকেই তার স্বর শুনবে। বৃথা শোক-দুঃখ করা আর মিথ্যে হারানোর ব্যথায় কাতর হওয়া মোটেই ঠিক নয়।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে সুরবালা, হ্যাঁ, মোটেই ঠিক নয়। মহারাজের দিকে অপলক চেয়ে থেকেছে। খুঁজতে চেষ্টা কোরেছে বিধুভূষণকে।

এক ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হোলো বটে সুরবালা। কিন্তু আর এক জব্বর ব্যাধির কবলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খেয়ে চলেছে একনাগাড়ে। যাকে সামনে পাচ্ছে, তাকেই হাঁ কোরে দেখছে একদৃষ্টে। এ ছ্যাখার শেষ হবে না বুঝি সুরবালার জীবনে কখনো। সকলের মধ্যে বিধুভূষণকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। মিলছে না মিলছে না মিলছে না।

হঠাৎ সুরবালার মনে হোলো, একদিন না মিলছে। কমলাপতির ভেতরটা ছ্যাখবার চেষ্টা কোরছে অনেকদিন ধরেই। আর পাঁচজনকে ছ্যাখার মতো। প্রথম-প্রথম কিছুই হদিস পায় নি। কিন্তু যতো দিন যাচ্ছে, ততো পরিষ্কার হোয়ে উঠছে। ওই মানুষের ভেতর বিধুভূষণের আত্মা একটু-আধটু তফাৎ যা ছিলো, সেটাও ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হোয়ে গ্যাছে। কমলাপতির দরদী মনোভাব হুবহু বিধুভূষণের। কথাবার্তা চালচলনও প্রায় একরকমের। এ লোকের মধ্যে নির্ঘাৎ বসবাস কোরছে বিধুভূষণ।

কমলাপতি গুরুভাই।

এক গুরুর শিষ্য ওরা। সুরবালা কমলাপতি, মায় শ্বশুর বাড়ির বামুন চাকর ঝি অবধি। সুরবালাদের বাড়িতে রোজ আসে কমলাপতি

একবার কোরে। সে যে কোনো সময়েই হোক। সকালে, না হয় বিকেলে। গুরুদেবের আদেশ। বড় চিন্তা সুরবালার জন্যে। এক হপ্তার সুরবালার মনের দিনপঞ্জী লিখে গুরুদেবকে জানাতে হবে হপ্তা-শেষে। প্রয়োজন বোধ কোরলে, নির্দেশ লিখে জানাবেন গুরুদেব। নইলে নয়। কিন্তু সুরবালা-সংবাদ নিয়ম কোরে লিখে লিখে জানাতেই হবে। বিশেষ আদেশ। মহাদায়িত্ব কমলাপতির ওপর।

কমলাপতির গরহাজির হবার উপায় নেই এ বাড়িতে। অসুখ-বিসুখ কোরলেও না। সর্দিকাশি জ্বরের জন্যে একদিন যদি না এসেছে, সুরবালা পাগলের মতো হোয়ে উঠবে। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হোয়ে অমনি দৌড়বে কমলাপতিদের বাড়িতে।

লোকলজ্জার মাথা খেয়ে আবোলতাবোল বকবে। কেঁদে আকুল। আমার মুখের দিকে চেয়েই তো তুমি কমলাপতির মধ্যে রয়েছে। আর যেন চলে যেও না। আমি আর বাঁচবো না তাহোলে।

কমলাপতির স্ত্রী মন্দিরার এধরনের কথাবার্তা মোটেই ভালো লাগে না। কমলাপতি তার বিয়ে করা স্বামী। হোমযাগে সাতপাকের বাঁধনে বাঁধা। কমলাপতির অসুখে যতো না মাথাব্যথা মন্দিরার, তার চেয়ে লাখোগুণে বেশি ছাখা যাচ্ছে সুরবালার। অসহ্য। বাড়ি বোয়ে এসে কি আদিখ্যেতাই না ছাখানো।

এমন উদ্ভট কথা কেউ কখনো শোনে নি মন্দিরার তিনপুরুষে। পরের স্বামীর দেহে ওর মরা স্বামী ঢুকেছে। ভদ্রঘরের মেয়ে বৌয়ের মনোমতো পরপুরুষকে নিজের দিকে টেনে রাখার জন্যে কি দুষ্টুমি। কি শয়তানি বুদ্ধি রে বাবা।

কতো আর সওয়া যায়!

সহ্যের সীমা পেরিয়ে গ্যাছে মন্দিরার।

রেগেমেগে সুরবালাকে বোলেছে সেদিন।—আমার স্বামীর দেহে তোমার স্বামী ঢুকে রয়েছে কে বোলেছে বলো দিকিনি?

গুরুদেব।

হতবাক-হতভম্ব মন্দিরা।

সুরবালার মতো সে-ও তো গুরুদেবের কন্যাস্থানীয়। গুরুদেব তার সর্বনাশ কোরতে চেষ্টা কোরবে সুরবালাকে দিয়ে। এ অসম্ভব। বিশ্বাস করা যায় না। সুরবালার চেয়ে কোনো অংশে কম স্নেহ করেন না তাকে দেবপ্রিয় মহারাজ। সবার জন্যেই ওনার প্রাণ কাঁদে।

মন্দিরা ভেবেছে, সুরবালার শ্বশুরবাড়িতে জানাবে একথা। গুরু-দেবের নামে মিথ্যে রটনা রটিয়ে সুরবালা তার ঘরে আগুন লাগাতে চেষ্টা করছে। পরক্ষণেই আবার মত পালাচ্ছে মন্দিরা। সুরবালাকে অতো বাড় বাড়ানোর মূলেই তো ওর শ্বশুরবাড়ি। বৌয়ের চোখে জল দেখলেই অমনি বাড়ি সুদ্ধ লোকের চোখে বন্যা নামবে। আর সুরবালা তো ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞান হোতে থাকবে। একবার কোরে চোখ খুলবে, বোলবে, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়!

এদৃশ্য অনেকবার ত্যাখা মন্দিরার। অবিশ্যি মন্দিরার এব্যাপারে নয়, ওদের তো জানানোই হয় নি এখনো, অন্য ব্যাপারে ওখানে জানালে কোনো ফল হবে না। তার চেয়ে দেবপ্রিয় মহারাজকে পুরী গিয়ে ধরবে। নিশ্চয় তিনি একটা না একটা উপায় বাতলে দেবেন কমলা-পতিকে রক্ষ করার।

বোসেছিলো চেয়ারে মন্দিরা। উঠে পড়েছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছে সুরবালার দিকে। বোলেছে, আমার বাড়িতে তুমি আর দ্বিতীয়বার আসবে না বোলে দিচ্ছি। গুরুদেবের কাছে যাচ্ছি আমি।

বাড়িতে ফিরে এসেছে সুরবালা।

চোখে জল। মানদা ঝি ছুটে এসেছে কাছে। সুরবালাকে ত্যাখা-শোনার ভার মানদার ওপরই বেশি। বাড়ির কর্তা-গিন্নীর হুকুম। কোনোরকমে সুরবালার যেন কোনো কষ্ট না হয়। পুরোনো দিনের লোক মানদা। বয়েস হোয়েছে। সুরবালার ওপর মেয়ের স্নেহ। সুরবালাকে একটু অন্যরকম দেখলে, বড্ড অস্থির হোয়ে পড়ে।

মানদাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে সুরবালা। মন্দিরার ঘটনা জানিয়েছে। নিজের আঁচলে সুরবালার তুচোখ মুছিয়ে দিয়েছে মানদা। রাগে ফুঁসে উঠে বোলেছে, যাক না মন্দিরা গুরুর ওখানে।

আমারও জানা লোক আছে। তুমি কিচ্ছু ভেবো না বৌমণি। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করছি। দেখি, কমলদাদাবাবুকে কি কোরে আটকে রাখে!

হাওড়ার কাসুন্দে।

হাজারহাত কালী বিখ্যাত। ভয়াবহ মূর্তি। ঘরজুড়ে খালি হাত আর হাত। ছোট হোতে হোতে শেষ অবধি হাতের কব্জি থেকে আঙুল পর্যন্ত। বেশ বড়সড় মূর্তি। দেবীর চারহাতের পর থেকে ঘরের ছাদেও হাতের ছাপ। গোনা যায় না চোখ কেমন করে। মাথা ঘুরে ওঠে। মানদা হাজারহাত কালী দর্শনে নিয়ে এসেছে বৌমনিকে। প্রণাম কোরে বোলেছে, বৌমণির মনস্কামনা পূর্ণ কর মা! জোড়া পাঁঠা বলি দেবো মা!

ওখান থেকে পুকুরের পাড় ঘেঁষে আরো ভেতরে গ্যাছে মানদা! অনেক ভেতরে। কুঁড়ে ঘরের মতো ঘর একখানা। মাটির দেয়াল-মেঝে বেশ পরিষ্কার কোরে নিকনো। দাওয়ায় বোসে বিদ্যাধর জ্যোতিষী। মানদাকে দেখে একগাল হেসে বোলেছে, কি রে মেয়ে! মনে পড়েছে? কতোদিন বাদে দ্যাখা বলতো! বয়েস হোয়ে গ্যাছে। কবে বোলতে কবে চলে যাই। যাক, দ্যাখা হোয়ে গ্যালো।

মানদার চোখ জলে ডবডবিয়ে উঠেছে।

—ও কথা মুখে এনো না ঠাকুরমশাই। তোমরা আছো বোলে কতো ভরসা এখনো। বৌমণিকে এনেছি। একটা ব্যবস্থা কোরতেই হবে। নাহোলে, নড়ছি নাও একপা এখান থেকে। যা হয় কর তুমি। সব ছেড়ে দিলুম তোমার ওপর। বৌমণিকে বাঁচাও তুমি। ঝরঝর কোরে চোখের জল ঝরে পড়েছে মানদার।

সমস্ত শুনে-বুঝে বিদ্যাধরের মুখখানা গম্ভীর হোয়ে উঠেছে। ভারী-গলায় বোলেছে, বিদ্বেষণ। বিদ্বেষণ ছাড়া কমলাপতিকে ফেরানো অসম্ভব। মন্দিরাকে বিষ কোরে তুলতে হবে কমলাপতির মনে। প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে মনোমালিন্য ঘটতে থাকবে তু'জনের। কমলাপতির আর

মন্দিরার। কেউ কাউকে সহ্য কোরতে পারবে না। কেউ কাউকে সুনজরে দেখবে না মোটে।

মানদা আনন্দে জোরে হেসে উঠেছে।

হ্যাঁ, এইটাই চাই।

নিভৃত-নির্জন গাছগাছালি ঘেরা ছমছমে শ্মশানে বিদ্বেষণ ক্রিয়ার সংকল্প নিয়ে ঘোড়ার চামড়ায় আসনে বোসেছে বিদ্যাধর। বেজির রোম আর সাপের খোলসের ধূপ জ্বালিয়েছে আসনের চারকোণে। শজারুর কাঁটা পুঁতেছে কোণে-কোণে। খটখটে শুকনো পলাশ কাঠের আগুনে হোমের আহুতি দিতে শুরু কোরেছে।...জ্যেষ্ঠায়ৈ...বিদ্বেষণং...।

ক'দিন চললো এই ক্রিয়াকর্ম।

শেষে নির্দেশ দিয়েছে সুরবালাকে। ও-ও যেন মনেপ্রাণে কামনা করে দিনরাত, কমলাপতি আর মন্দিরার বিচ্ছেদ অবধারিত। নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে।

দিনে দিনে বেশ রুক্ষ মেজাজি হোয়ে উঠেছে সুরবালা বৃদ্ধি হোয়েছে রাগদ্বেষ। চোখে প্রতিহিংসার আগুন ধকধক কোরে দিনেরাতে। যাকে তাকে যা-তা বোলে বোসছে যখন তখন। কটমট কোরে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। শিবের মদন ভস্মের মতো চোখের আগুনে ভস্ম কোরে ফেলবে বুঝি সকলকে। চোখের দিকে তাকানো যায় না।

সুরবালার নিজে দেবীর সাজে সেজে সবাইকে ভুলে নিজেকে নিয়ে মেতে থাকার সমস্যা যদিও বা গ্যালো, এ আবার আর এক উপসর্গ এসে উপস্থিত হোলো। যে সুরবালা সকলের আদরের নয়নের মণি, সে এখন মহাত্রাস সবার। ছেলে বুড়া—সবার। ওকে দেখলেই লোকে সরে যায় তফাতে। তারা মনে থেকে চলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

এদিকে মন্দিরার সঙ্গে প্রায় রোজই ঝগড়াঝাঁটি লেগে রয়েছে কমলাপতির। মন্দিরা কেন তার সামনে অপমান কোরলো সুরবালাকে। কেন আসতে বারণ কোরলো? আক্কেল-বিবেচনা নেই একটু। একটা শোকাতাপা মানুষ সুরবালা, তাকে মিছিমিছি আঘাত দেয়া। একথা ছাড়াও যে কোনো তুচ্ছ কারণে রাগ-বিতণ্ডা চলছে। এ যেন নিত্য-

নৈমিত্তিকের ঘটনা হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমনিতেই মনস্থির কোরে ফেলেছিলো মন্দিরা, দেবপ্রিয় মহারাজের কাছে গিয়ে সব বৃত্তান্ত জানাবে। যাই-যাই কোরে যাওয়া হোয়ে উঠছিলো না। কিন্তু কমলাপতির সদাসর্বদা দুর্ব্যবহারের জন্যে বাড়িতে টেকা দায়। ওর চোখের সামনে যাওয়া বিপদ। গুরুদেবের আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর অন্য কোনো পন্থা ভাখা যাচ্ছে না। জয়গুরু বোলে যাত্রা কোরেছে দেবপ্রিয় মহারাজের উদ্দেশে।

গাড়ি ট্রেন সাইকেল রিক্সা···।

আশ্রমের বাগানে দাঁড়িয়ে ফলফুল গাছের যত্নের তদারকি কোরছেন দেবপ্রিয় মহারাজ।

মন্দিরা দৌড়ে এসে দেবপ্রিয় মহারাজের দু'পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো একেবারে।—রক্ষে করুন গুরুদেব! রক্ষে করুন। সর্বনাশ হোয়ে গ্যাছে আমার।

মহারাজের চোখে বিস্ময়। সিঁথি-হাত লক্ষ্য কোরছেন। টকটকে সিঁদুর, লোহা-বালা-শাঁখা!

আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে দেবপ্রিয় মহারাজ শান্ত-মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস কোরেছেন মন্দিরাকে।—বোলবি তো কি হোয়েছে? কেঁদে পাগল হোলে চলবে কেন? কমল কই?

কান্না থামাতে গিয়ে আরো কেঁদে উঠেছে মন্দিরা।

আর কোনো কথা কন নি মহারাজ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

খানিক কান্নার পর চুপ কোরেছে মন্দিরা। ঢোঁক গিলে গিলে বোলেছে—আপনার ছেলে হারিয়ে গ্যাছে আমার কাছ থেকে।

দেবপ্রিয় মহারাজের অবাক চোখ আবার ঘোরাফেরা কোরেছে মন্দিরার সিঁথির ওপর দু'হাতের ওপর। ঠিক দেখেছিলেন। ঠিকই দেখছেন। দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি।

আচমকা যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে মন্দিরা।

দেবপ্রিয় মহারাজের পা ছেড়ে দিয়ে জিভ কেটে বোলছে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কি অভাগিনী আমি। আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে কতো

কষ্টই না দিলুম। চেয়ারে বোসে পড়ুন বাবা। বোসে পড়ুন।

মন্দিরার এমন কাণ্ডকারখানার সঙ্গে পরিচয় নেই মহাবাজের। রকমসকমে তাজ্জব।

মহারাজকে চেয়ারে বসিয়ে, পায়ের কাছে নিজে বোসেছে মন্দিরা।

নিজের ব্যাথার আবেদন কোরেছে করুণভাবে। সুরবালার মনোভাব জেনে বুকখালি করা চাপা নিশ্বাস ফেলেছে মহারাজ। দুঃখ কোরে বোলেছেন, উল্টা বুঝিলি রাম।

সুরবালার মনকে শোকের রাজ্যের বাইরে ছড়িয়ে রাখবার জন্যেই তিনি বোলেছিলেন, সকলের আত্মায় বিধুভূষণের আত্মা মিশে রয়েছে। তোমার আত্মাতেও। শেষেরটা নিলে না। প্রথমটারও ভুল মানে কোরলো! একটা বিশেষ লোকের মধ্যে—আর সে-লোক কমলাপতি. ওর স্বামী ঢুকেছে ভেবে একি পাগলামি!

একটা মলিন-বিষাদের ছায়ায় ছেয়ে গ্যাছে দেবপ্রিয় মহারাজের মুখ। আপসোস কোরে ক্ষীণস্বরে বোলেছেন, ভুল। ভুল কোরে ফেলেছি। সব উপদেশ সবার জন্যে নয়। সব সময়ে চলে না। লোকের মন বুদ্ধি আর পরিবেশ বিচার কোরে দেয়া উচিত। সুরবালার ক্ষেত্রে অতোটা তলিয়ে দেখিনি। তার ফল—যা হবার তাই হোয়েছে।

মন্দিরার সঙ্গেই কলকাতায় এসেছেন দেবপ্রিয় মহারাজ। সুরবালার শ্বশুরবাড়িতে এসে উঠছেন।

সকলের প্রণামপর্ব সারার পর সুরবালা এসেছে প্রণাম কোরতে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছেন মহারাজ। মনের চিন্তাধারা কি ভয়ানক ভাবে দৃষ্টি পাল্টে দিতে পারে। মনই করুণ কোরে তোলে কখনো, কখনো স্নেহ মাখানো, আবার কখনো বা রাক্ষুসে পিশাচ।

আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে নির্জনে বুঝিয়েছেন সুরবালাকে মহারাজ। তুমি সকলের কাছে করুণাময়ী। আমি সেই মূর্তিতে তোমাকে দেখতে চাই যে মা।

কেঁদে ফেলেছে সুরবালা।

বাবা! কি যন্ত্রণা ভেতরে কাকে বোঝাবো! কেউ আমাকে

বুঝলো না ! কেউ নয় বাবা, কেউ নয়।

মাথায় হাত রেখেছেন মহারাজ।

বোলেছেন, শান্তি পাও মা তুমি !

সুরবালার মনে হোলো, একটা গরম আগুনের স্রোত বুঝি দ্রুত-গতিতে নেমে গ্যালো। কতোদিন বাদে মাথাটা ঠাণ্ডা হোয়েছে আজ।

অকপটে মহারাজের কাছে স্বীকার কোরেছে সুরবালা বিদ্বেষণ-ক্রিয়ার কথা। মন্দিরা-কমলাপতির বিচ্ছেদ !

আবার মাথায় হাত রেখেছেন মহারাজ।

হাসতে-হাসতে বোলেছেন, পাগলী কোথাকার। নিজের ভেতরের হিংসে-দ্বেষ আর কামনাকে বিদ্বেষণ করার বেটি। ওদের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা কোরে রাখ, আলাদা কোরে রাখ। আমি চাই তুই এসবের অনেক ওপরে থাকবি রে। তুই মন্দিরা নয়। কমলাপতি নয় রে, কমলাপতির নয়। তুই আমার মা, সকলের মা যে রে।

সুরবালার ভেতরটা শান্ত হোয়ে গ্যাছে।

একটা অজানা-আনন্দের ঢেউ বোয়ে যাচ্ছে। কারা যেন ডাকছে 'মা-মা' বোলে তাকে। অনেক গলা। ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে—অনেক, অনেক !

জ্যোতিরেখা।

জ্যোতিরেখা স্নেহময় রাতুল।

নির্মম-নির্দয় রাতুলের রোষদৃষ্টি থেকে নিজেদের জীবন রক্ষে করতে পেরেছে কি ওরা?

ঘটনার বুনুনির ফাঁদে আটকে পড়েছে সে-রহস্য।

দম আটকানো পরিবেশ, ভয়াবহ পরিস্থিতি।

জীবন নিয়ে টানাটানি। মরতে ভয় পায় না জ্যোতিরেখা। ভয় দোয়েলকে নিয়ে। তার প্রাণটুকু নিঃশেষ ক'রে দিয়েও কি দোয়েলকে বাঁচানো যাবে? না না না।

নিজের কথা নিজের কানে যেতে ভীষণ চমকে উঠেছে জ্যোতিরেখা। একি অলক্ষুণে কথা মুখ দিয়ে বেরোলো তার! নাক-কান ম'লে জোড়হাত ক'রে ক্ষমা চেয়েছে দেয়ালে টাঙানো শান্ত-সৌম্যদর্শন তন্ময়া-নন্দজীর ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। ঠাকুর! রক্ষে কর দোয়েলকে!

পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো রেলিং দেয়া ছোট্ট খাটটার সামনে। ধবধবে সাদা চাদর বিছানো নরম গদির ওপর শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে দোয়েল। মাথাটা বালিশ থেকে নেমে এসেছে। ঠিক ক'রে শুইয়ে দিয়েছে জ্যোতিরেখা। দু'হাতে আলতো ভাবে ধরে আস্তে আস্তে মাথাটা তুলে দিয়েছে বালিশে। কপালে মৃদু চুমু এঁকে দিয়ে বোলেছে, দীর্ঘজীবী হও।

নিজের খাটে ফিরে আসতে গিয়ে ধড়াস-ধড়াস ক'রে উঠেছে বুকের ভেতর। অনেক পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে বাইরে। শুনছে ফিস-ফিসে কথার আওয়াজ। পা-হাত সর্বশরীর কাঁপছে। কোনরকমে পা ঘষে ঘষে নিজের খাটে এসে বসলো। পাশে একটু তফাতে স্নেহময়ের খাট। মুখ ফিরিয়ে তাকাতে আরো অসহায় হ'য়ে উঠেছে জ্যোতিরেখা। আশ্চর্য ব্যাপার! নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে মানুষটা। কোন চিন্তাভাবনা নেই। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যাকে বলে। চুপ ক'রে নীরব-দর্শকের ভূমিকা নিয়ে বসে থাকতে পারলো না আর।

স্নেহময়ের খাটে এসে ধপাস ক'রে বসে পড়েছে। কানের কাছে মুখ এনে খুব চাপা গলায় বলেছে বার বার। ওঠো জাগো। আর সময় নেই। বুকে-পিঠে ধাক্কা দিচ্ছে ঘুম ভাঙাতে।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েছে স্নেহময়।

বিস্ময় বিমূঢ় চোখ।

জ্যোতিরেখার মুখে কথা সরে নি। ভয়ে-ত্রাসে গলা শুকিয়ে কাঠ। চোখের-আঙুলের ইশারায় জানিয়ে দিয়েছে। কারা এসেছে। ঘরের বাইরে ঘুর ঘুর ক'রছে। নিস্তব্ধ-নিঝঝুম মাঝ রাতে ওদের আসার উদ্দেশ্য বুঝে নিক স্নেহময়। বাইরের বারান্দায় তারে ঝোলানো টিয়াপাখীর খাঁচাটা বড্ড বেশী দুলছে। পাখীটার ডানা ঝটপটের আওয়াজ কানে আসছে ভেতরে। জানালা-দরজা বন্ধ সত্ত্বেও। জেমি কুকুরের গলায়ও কেমন একটা মর্মছেঁড়া আর্তনাদ! ভয় পাওয়ার, না সাবধান করার, না চেন বাঁধা বলে, নিজের নিরূপায় অবস্থা জানানোর। কিছু বুঝে উঠতে পারছে না জ্যোতিরেখা। মাথাটা ঝিমঝিম ক'রছে। বিপদের মাঝে যাকে কাণ্ডারী ভাবা যায়, সেই ঘরের পুরুষ মানুষই বা কেমন। একদম চুপচাপ। নির্বিকার মুখ। বসে আছে তো বসে আছেই। পাথর মূর্তি একখানা। তন্ময়ানন্দজীর ছবি থেকে তো দৃষ্টি নড়ছে না এতটুকু। একেবারে অপলক চোখ। এসময় কি ছবি দ্যাখার সময়। যা হয় একটা বিহিত করা তো উচিত। মরণ-বাঁচন যাই হোক।

তন্ময়ানন্দজীই বলেছিলেন সেবার, ভয় দিয়েই ভয়কে জয় ক'রতে হয়। পালালে ভয় পেছু ছাড়ে না। ওর নাগালের বাইরে যাওয়া যায় না। বাতাসের বেগে দৌড়ে গিয়ে ঝাপটে ধরে ফেলে ভয় পাওয়া মানুষকে। এগিয়ে নিয়ে চলে ভয়ের নীরেট অন্ধকার মৃত্যু গহ্বরে। এ মানুষটার হ'ল কি! মরবার আগেই মরে গেছে যেন।

ভাবতে আর পারছে না জ্যোতিরেখা।

মনে হচ্ছে, ছবিটা টানমেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। স্নেহময় কল্পনায় ভেসে ভেসে নিজের বিপদ ডেকে আনে। ডেকে এনেছে বরাবর। এ লোককে বলার কি আছে জ্যোতিরেখার! যে কানে শোনে না, চোখে দ্যাখে না, মুখে বলে না, সবই আছে, অথচ সবই নেই যেন—এমন ভাব, তার সংসার করা ঠিক নয়। ঠিক হয় নি স্নেহময়ের। এতই যদি উদাসীন!

এ যাত্রা মৃত্যুর হাত থেকে এবাড়ির রেহাই নেই কারো। মরতে হবেই সকলকে। নির্মম মৃত্যু। অপঘাত মৃত্যু। যারা এসেছে, তাদের চূড়ান্ত আক্রোশ মিটিয়ে তবে স্থান ত্যাগ করবে। ওদের দয়া নেই মায়া নেই। আছে নিষ্ঠুর হৃদয়। আছে খুনের নেশা। আছে রক্তের পিপাসা। এছাড়া দুনিয়ায় আর ওদের কাছে কিছু নেই, কিছু নেই। অবধারিত জয় আজ ওদের।

গোটা বাড়িটা—একতলা দোতলা, ঘুমে অচেতন সত্যি সত্যি, না ভয়ে নিঃসাড়-নীরব—মুখে কুলুপ এঁটে মৃত্যুভয়ে কাঁপছে ঠকঠক ক'রে। আর মনে মনে জপছে, ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন। হে তেত্রিশ-কোটি দেবতা, তোমরা আমাদের বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও!

মানুষের ভাব-ভাবনাতেই তো ঈশ্বর-ভগবান। সত্যি কিছু থাকলে, কেউ থাকলে, গোটা পৃথিবী জুড়ে এত অন্যায় এত অবিচার এত অনাচার কেমন ক'রে হয়! নেই নেই নেই। কেউ নেই, কেউ নেই।

আর নিজের সঙ্গে যোঝাযুঝি ক'রতে পারছে না জ্যোতিরেখা।

জ্যোতিরেখা নিস্তেজ-নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়েছে। যত পায়ের চলার শব্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে দরজার দিকে, তত শরীরের সমস্ত স্নায়ু—পা থেকে মাথা অবধি অবশ হ'য়ে আসছে। ছ'বছরের দোয়েলের মিষ্টি মুখখানা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। খাটের বাজুতে মাথা ঠেকিয়ে তাকিয়ে আছে দোয়েলের খাটের দিকে।

কিছু একটা ঘষার আওয়াজ হ'চ্ছে না! খটখট শব্দটাও কানে আসছে যে! ডিমলাইটের সবুজ আলোয়ও দেখতে অসুবিধে হ'চ্ছে না কোন। দরজার ফাঁক দিয়ে একখানা পাতলা, খুব পাতলা ছোরা গলিয়ে কেউ বাইরে থেকে খিলটা ওপর দিকে ওঠাবার চেষ্টা ক'রছে।

ওদের এই ঘরটাই লক্ষ্য তাহলে প্রথমে।

পৌষের হাড়কনকনানি শীতের দাপট এদের প্রতিহিংসা চরিতার্থের ইচ্ছের কাছে হার মেনেছে ছাখা যাচ্ছে। এদের জিদে যদি এরা অচল-অটল হ'য়ে থাকতে পারে, জ্যোতিরেখাই বা সহজে হার মানবে কেন? ভয় পেলে চলবে না। বাধা দিতেই হবে। হোক মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষাকষি। এমনি মরার চেয়ে যুদ্ধ ক'রে, বাধা দিয়ে মরা বরং ভালো। এ মৃত্যুর আনন্দ আছে তবু একটা। বিজয়িনীর মৃত্যু। কাপুরুষের মতন ভয় পেয়ে জল্লাদদের তলোয়ারের নিচে নিজের ঘাড় বাড়িয়ে দিতে পারবে না জ্যোতিরেখা। বাবার কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছে ছোটবেলা থেকে।

দেহে দশহস্তীর বল এসে গেছে যেন জ্যোতিরেখার। উঠে পড়ল খাট থেকে। ক্রুদ্ধদৃষ্টি। একবার তাকাল স্নেহময়ের দিকে। আগের অবস্থা। নড়নচড়ন নেই একদম। থাক, ও ওইরকমই থাক। তন্ময়া-নন্দজী স্বশরীরে এসে রক্ষে করবে'খন ওকে। মৃত্যু শিয়রে। তবু কি অন্ধবিশ্বাস, অলীক ভাবনা! এযুগেও এমন মানুষ। পায়ের তলায় মাটি সরছে, কোন খেয়াল নেই। ধপাস ক'রে পড়বে কোথায় শূন্যের চিন্তা। কার কবে ফল হয়েছে, কে জানে!

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে দরজার দিকে জ্যোতিরেখা। ছদিক থেকে ছ'হাতে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে খিলটাকে

শক্ত ক'রে চেপে ধরেছে।

বাইরের দুজনের বেশ অসুবিধে হচ্ছে। খিলটাকে আগের মতন নাড়াতে পারছে না সহজে।

বাজখাঁই গলার আওয়াজ কানে এলো, এই স্নেহময়! সাহস থাকে তো, খুলে সামনে এসে দাঁড়া। মরদ হোস যদি। কতক্ষণ আটকাবি। তোর সাক্ষাৎ যম এসে গেছে আজ। কেউ রক্ষে করতে পারবে না। সেদিন জেলে পুরে ছিলি না? পালাবার কোন উপায় রাখি নি। নিচে ওপরে রাস্তায়, সব আমার লোক।

যাদের ভেতর হিংস্রপশু উন্মত্ত হ'য়ে নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে দিনরাত, তারা বোধ হয় রাতুলের মতনই নিজের দোষটা দ্যাখে না একদম। দেখলে তো আর নরখাদক বলে কোন কথাই থাকতো না এ পৃথিবীতে!

হ্যাঁ, স্নেহময় কাকা ধরিয়ে দিয়েছে রাতুলকে।

সে কি তার অন্যায়! সে কি শুধু শুধু। ওকি দোষী নয়! কোন অপরাধ করে নি।

নেশার তাড়নায় বাপ-ঠাকুর্দার নাম ডোবাতে বসেছিলো, বংশের মানমর্যাদা ধূলিস্যাৎ। বাড়ির লোকের পাড়াঘরে রাস্তাঘাটে জ্ঞাতি-স্বজনদের কাছে মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছে।

ছেলেকে আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথাটি চর্বিতচর্বণ করছে নির্মলা। কোন শাসন-বারণ নেই। আর হয়েছে তেমনি এই স্নেহময়টা। রাতুলের এত দুঃসাহস এত বেপরোয়া এত অস্পর্দ্ধা বাড়ানোর মূলে তো ওই! রাতুকে কিছু বোল না কেউ। রাতু বড় হয়ে কত বড় হ'বে তোমরা দেখবে।

ওর মধ্যে নাকি স্নেহময় দেখেছে কোন দেবদূতকে। সে দেবদূত নাকি হঠাৎ একদিন প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে স্নেহময়ের সামনে।

কি মুষলধারে বৃষ্টি।

রাস্তাঘাট ডুবে গেছে। চতুর্দিকে জল থৈ-থৈ। ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটের তো কথা নেই। একহাঁটু জল। গাড়ি চলছে সাঁতার কেটে কেটে। মানুষজন হাবুডুবু খেতে খেতে চলছে। সবে রাত আটটা। বৃষ্টি

থামবার নামগন্ধ নেই। রাত এখন অনেক বাকি। এবারের শ্রাবণ সুখস্বপ্নের সৌধ ভেঙে খান খান ক'রে দিচ্ছে সবার। ঘরবন্দী হ'য়ে থাকাও যায় না দিনরাত, বেরোবারও উপায় নেই।

তবু বেরোতে হয় অনেককে নানান কাজের তাগিদে। জল ভেঙে ভেঙে কাকা-ভাইপো এগোচ্ছে। স্নেহময় আর রাতুল। রাতুলের কতই বা বয়েস, চোদ্দ কি পনেরো। কাকা ভক্ত খুব। কাকাও পিতৃস্নেহ ঢেলে দিয়ে ওকে আগলে আগলে রাখে। স্নেহময় রাতুলের বাহু ডানহাতে শক্ত করে চেপে রয়েছে। পাছে খানাখন্দে পড়ে যায়। যা সব রাস্তার ছিরি।

রাতুল পড়লো না। পড়লো মড়ারখাটে কাঁধ দেয়ার একজন। পড়লো পড়লো একেবারে খোলা ম্যানহোলের ভেতর। পেছনের মোটর থেমে গেলো। ভেতর থেকে নেমে এলো মৃতের একমাত্র ছেলে সুশান্ত মুখুজ্জে। শরীর খারাপ, আর তা ছাড়া বয়েসও হয়েছে বেশ। সুশান্তর ছেলেরাই ঠাকুর্দার শবদেহ ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে।

চিৎকার করে উঠলো রাতুল, কাকু শীগগির চলো, শীগগির ডুবে গেলো, ডুবে গেলো।

দৌড়ে এসেছে স্নেহময়।

রাস্তার যত জমা জল হুড়হুড় করে নামছে ম্যানহোলে। কি তোড়, কি জোর। দাঁড়ানো যাচ্ছে না। যে পড়েছে, সে উঠতে পারছে না। নিচের দিকেই টানছে তাকে। জল বেরোবার জন্যে কেউ না কেউ মুখটা খুলে দিয়েছিলো। অনেক টানাটানি চেষ্টাচরিত্রের পর লোকটিকে তুলেছে স্নেহময়। অবিশ্যি ওকে সহায়তা করেছে অন্য শবযাত্রীরা! লোকটির ভায়েরা। মুখ্য ভূমিকা কিন্তু স্নেহময়ের। নিজের ওপর কোন লক্ষ্য না রেখেই লোকটিকে বাঁচিয়েছে স্নেহময় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।

তারপর গাড়িতে যত্ন করে তুলে দিয়ে তার জায়গায় নিজেই কাঁধ দিয়েছে শবযাত্রায়। গেছে শ্মশান অবধি।

আগাগোড়া সুশান্ত সব লক্ষ্য করেছে। স্নেহময়ের ব্যবহারে মুগ্ধ

অভিভূত। এখনো তাহলে তরুণদের কারো কারো মনে মানবতার মানুষ বেঁচে আছে। হারিয়ে যায় নি একেবারে।

শ্মশানেই পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে সমস্ত জেনে নিয়েছে স্নেহময়ের সুশান্ত। চাকরি-বাকরি নেই। এম কম পাশ করে বসে আছে।

সুশান্ত মিষ্টি খাও বলে কিছু দিতে চেয়েছে স্নেহময়ের হাতে। জোড়হাত করে ক্ষমা চেয়েছে স্নেহময়।

পরে এই স্নেহময়কে নিজের অফিসে কাজ দিয়েছে সুশান্ত নিজে ডেকে নিয়ে এসে। নিজের মতন ওর জন্যে আলাদা কোলতারের ব্যবসাও ক'রে দিয়েছে।

স্নেহময়ের ভাগ্য ফেরার অধ্যায়ে প্রথম সূত্রপাত ঘটেছে কিন্তু রাতুলের জন্যেই। ওর যদি লক্ষ্য না থাকতো, ও যদি চীৎকার করে এমন ব্যাকুল হয়ে উঠে বিপন্ন মৃত্যুপথের যাত্রীর কাছে না পাঠাতো, তাহলে স্নেহময় কি এত বড় হয়ে উঠতে পারতো! ওই দেবদূতের জন্যেই। রাতুলের ভেতর এক দেবদূত লুকিয়ে আছে। যার দয়ামায়া মানবতা—সমস্ত কিছু রয়েছে। বড় হ'লে, সময়ে সব কিছুরই প্রকাশ হবে আরো বেশি করে।

প্রকাশ হবে বেশি করে। হয়েছে নাকি এককণাও! দেবদূত না রাতুল, রাতুল যমদূত! স্নেহময়ের ধারণা ভুল। ভুল ভুল ভুল! ছোটো কেউটের চেয়ে জোয়ান কেউটের বিষ আরো ভয়ঙ্কর আরো মারাত্মক। সাংঘাতিক জীবন সংশয়।

স্নেহময়ের বন্ধ দরজার পাল্লায় শাবলের ঘা পড়ছে বেশ জোরে জোরে। সঙ্গে সঙ্গে রাতুলের তর্জন-গর্জন কটুকাটব্য চলছে অনর্গল।

জ্যোতিরেখা দরজায় বুক চেপে দাঁড়িয়ে ভেতরে।

পড়ুক শাবলের ঘা। পড়ুক তার বুকে। তার রক্তে চান করুক শান্ত হোক রাতুল। বাঁচুক অন্যেরা।

রাতুল তার বড় ছেলে, দোয়েল ছোটো। একথাই তো বরাবর বলে এসেছে জ্যোতিরেখা সবার কাছে। কোন ছুই-ছুই করে নি কখনো কোনদিন। মায়ের মনপ্রাণ দিয়েই তো ঘিরে রেখেছিলো ওকে।

তার পরিণাম এই। পরিণাম এই? দেহটা আবার অবশ হয়ে যাচ্ছে। পড়ে না যায় জ্যোতিরেখা।

মায়ের যত্নে ওকে সংশোধন করতে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে কি কোন কসুর ক'রেছে নয়নশোভা? জ্ঞানত মনে পড়ে না। বোঝানো-সোঝানোর সীমা-পরিসীমা ছিলো না। হ'ল কি?

কলেজে পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া ছেড়ে দিয়ে স্নেহময়ের ওপর কি জুলুম! তোমার অফিসে বসাতেই হবে। ব্যবসা শিখবো ব্যবসা করবো। আমাকে বড়লোক হ'তে হবে তোমার মতন। কোন ওজর -আপত্তি শুনবো না কিছুতেই।

ভালো ক'রে পড়, মানুষ হ'! এ বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে দাঁড়াতে পারবি না এ প্রতিযোগিতার যুগে। ভালো ক'রে বোঝ। এখন তোকে নিতে পারি না আমি কোন মতেই।

জেদি ছেলে বোঝেনি। উল্টে রাগে-অভিমানে ফেটে পড়েছে দেখিয়ে দেবো, কি ক'রে মানুষ হ'তে হয়! কারো সাহায্য চাই না। না।

মাথায় ভূত চেপেছে রাতুলের। কাকা মড়া বয়ে বড়লোক হ'য়ে গেলো, আর সে পারবে না? নিশ্চয় পারবে। মাথায় মতলব এসে গেছে তড়িঘড়ি। ভাড়াকরা শ্মশানযাত্রীদের দেখেছে বড় রাস্তায় মড়া ব'য়ে নিয়ে যেতে। অবিশ্যি ওরকম নাচতে-নাচতে গাইতে-গাইতে মড়া নিয়ে যাওয়াটা খুব বিসদৃশ। বেলেল্লাপনা যাকে বলে। শোকে কারো বুক ফাটছে, ওদের পৈশাচিক উল্লাস। ছড়া বেঁধে বেঁধে 'হরিবোল' বলারই বা কি বাহার। একদম হৃদয়হীন। মরুক গে, সে তো আর ওরা হ'তে যাচ্ছে না! যাচ্ছে, মড়া বইতে কাকার মতন নিশ্চয় কারো না কারো নজরে পড়ে যাবে ব'লে, তখন আর তাকে ছ্যাখে কে!

যে-ই ভাবা, সে-ই কাজ!

শ্মশানে ঘুরে ঘুরে ওদের সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে তুলেছে রতুল। ওরা রাতুলকে ধরে নিজেদের দুষ্টচক্রের আওতায় এনে ফেলেছে একেবারে। সম্পূর্ণ নিজেদের কব্জায়।

ওদের পরামর্শে গড়ে উঠেছে অন্য জগতের মানুষ। অন্ধকারে গড়ে উঠলো ওর মন-মাথা হৃদয় দৃষ্টি বুদ্ধি। মানুষের খোলসে নৃশংস পশু একটা। বন্য পশুর চেয়েও ভীষণ-ভয়াল।

পড়লো দখিনের—ক্যানিং-এর মেয়ে দেয়ালীর খপ্পরে। দেয়ালী সুরার নেশায় বুঁদ ক'রে রাখতে লাগলো ওকে। আমতা শ্মশানের গুণীনের পরামর্শে ওকে ওঠাতে লাগলো, বসাতে লাগলো। গুণীন মদ গেলাবার আগে ওকে নির্দেশ দিয়েছে, কাকার সর্বস্ব লুট ক'রে নিয়ে আসবে তুমি। কোন পরোয়া ক'রবে না। কোন ভয় ক'রবে না। বাপ-মারও নেবে। কাউকে ছাড়বে না। ওরা সুখভোগ ক'রবে, আর তুমি দুঃখে মরবে? কক্ষনো নয়। ওদের সুখের বাসা ভাঙতে হবে, ভাঙতে হবে।

গুণীনের নির্দেশ মনেপ্রাণে গ্রহণ ক'রেছে রাতুল।

তারপর গলায় ঢেলেছে কারণবারি ঢকঢক ক'রে। পরে শরীরে অসুরের বল এসে গেছে মনে হ'য়েছে। হ'য়ে উঠেছে ভয়াবহ দস্যুর চেহারায় দুর্দান্ত দৈত্য একটা। বাড়িতে কি অত্যাচার। সকলের ওপর কি নির্যাতন!

ওর দুর্মতি পরিবর্তন করানোর জন্যে জ্ঞাতিবোনের সঙ্গে বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরে গেছে জ্যোতিরেখা। জ্ঞাতিবোনের শ্বশুরবাড়ি ওখানে। ওখানে কালীঞ্জর শিবের মেলা বসে অক্ষয় তৃতীয়ায়। শেষ হয় পূর্ণিমায়।

প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগের এই কালীঞ্জর শিব। বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংই নাকি শিবের সেবার ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। বিরাট মন্দির। মন্দিরের বাঁদিকে পুকুর। পুকুরে চান ক'রে পুজো দিচ্ছে সবাই। মন্দিরের ভেতর কুণ্ডের মধ্যে শিব। একটু নিচে। মন্দিরের এদিকে-ওদিকে গাছ আর গাছ। লাল-খয়েরি কাঁকর মাটির ওপর। অশত্থ বট শিশু তেঁতুল। চতুর্দিকে দোকানপশারি ব'সেছে। নানা রকমের কাঁচের চুড়ি থেকে খাবার-দাবার পর্যন্ত। চিত্ত বিনোদনের জন্যে ম্যাজিক দ্যাখানো জুয়াখেলাও চলেছে নির্বিবাদে। আলো থাকলে অন্ধকার থাকবেই।

চতুর্দশীতে দীঘির পাড়ে মিছিল এলো। বিরাট মিছিল। ছ'পাশে বাঁশের ওপর ফুলে ফুলে সাজানো সিংহাসন বাঁধা। ভক্ত-সন্ন্যাসী-পুণ্যার্থীরা কাঁধে নিয়ে বয়ে চলেছে। বিকেলের সুন্দর আবহাওয়া! ছেলে-বুড়ো পুরুষ-নারী—দল দল লোক চলেছে মিছিলের সঙ্গে। সিংহাসনে উৎসব দেবতা শিলাটি কালাঞ্জর শিবের প্রতিনিধি। বড় বড় ভেলভেট-সিল্কের ছাতা ঘুরছে সিংহাসনের কাছাকাছি হাতে হাতে। লালের ওপর সাদা ক্রসের বাহারে পালক তোলা ঢাক বাজছে সার সার। ব্যাগপাইপও যে নেই, তা নয়। প্রায় সব রকম বাজনাই বেজে চলেছে উৎসব দেবতার শোভাযাত্রার সঙ্গে।

কলকাতার রাতের দুঃস্বপ্নের রেশ উঠে গেছে এদের চারজনেরই মন থেকে। নয়নশোভা স্নেহময় স্নেহময়ের দাদা ব্রজেশ আর নয়নশোভার বড়জা—রাতুলের মা নির্মলার।

ওরা খুব খুশী। এ এক আনন্দ লোকে এসে গেছে। শোভাযাত্রার সঙ্গী হয়েছে ওরাও। হাঁটাপথে হাঁটার কোন কষ্ট নেই। চতুর্দিকে সবুজ আর সবুজ।

জ্যোতিরেখা ডি. এল. রায়ের শাজাহান নাটকের গান মনে আসছে। গুনগুন ক'রে গাইছে শুধু একটা লাইনই।...এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বরগ সমান।'

শোভাযাত্রা থামলো দীঘির পাড়ে।

শিলা ঠাকুর এবার সকলের দেবতা ছোঁয়াছুঁয়ির কোন বালাই নেই। জাতপাতের আগল নেই। সকলেই পুজো নিয়ে মেতে উঠেছে। নিজেরাই নিজেদের হৃদয়-দেবতাকে ফুলের সঙ্গে বেলপাতার সঙ্গে নিজেদের প্রাণের অর্ঘ দিয়ে বুঝি পুজোয় দেবতার পায়ে নিজেদের সমর্পণ ক'রছে। উজাড় ক'রে দিচ্ছে।

বড় ভালো লাগছে। স্বর্গ নেমেছে যেন মর্ত্যে। কিন্তু জ্যোতিরেখা নরম মনে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা শুরু হ'য়ে গেছে সন্ন্যাসীদের গুণছুঁচে জিভ ফোঁড়া দেখে। যার ফোঁড়া হচ্ছে, তার চোখে গামছা বাঁধা। বৃদ্ধ কামারের গলায় ফুলের মালা। হাতে ছুঁচ। বিঁধিয়েই লোহার সরু

পাত প্রায় শিকের মতন ঢুঁকিয়ে দিচ্ছে ছেঁদায়।

সমস্বরে উল্লাসে নেচে উঠছে অন্যেরা।

—জয়! কালীগুরর বাবা…।

সন্ধের মন্দিরের চারপাশে পরিক্রমা করছে ভক্তজনেরা। এসেছে জ্যোতিরেখাও। আশ্চর্য হয়ে দেখছে অদ্ভুত দৃশ্য। শোনা কথার চাক্ষুষ ছাখা। এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

একটা কাঠের পাটাতনের ওপর দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে মালসায়। কাঠকয়লা-ঘুঁটের আগুনই হবে বোধ হয়। থামের মতন কাঠ আঁটা মাঝ বরাবর। ওপরে পা নিচে মাথা, ঝোলানো অবস্থায় বাঁধা। মাথার নিচে আগুন। পাটাতন ধরে সবসুদ্ধ মন্দির পরিক্রমা ক'রছে ভক্তরা। মানুষ আগুন পাটাতন।

মন্দিরের সামনে ধুনোপড়াও চলছে।

মাথায় গামছার বিড়ে পাকানো। তার ওপর মালসায় আগুন। সে-আগুনে ধুনো ছড়াচ্ছে ভক্তেরা। হাওয়ায় মালসার ধুনো জ্বলে উঠছে দপ দপ ক'রে।

পরের দিন। পূর্ণিমার সকাল।

সকলে দেখেছে জ্যোতিরেখা অবাক বিস্ময়ে। মন্দিরের সামনে ছুটি নালা কাটা পর পর একটু তফাতে প্রায় ছ'সাত ফুট লম্বায়, চওড়ায় আট-দশ ইঞ্চি। গভীর—বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কেন না ঘুঁটে আর কাঠকয়লার আগুনে ভরভর্তি নালা ছুটি। মাঝে মাঝে কলাপাতা। গোল ক'রে পাতা। একটু গভীর। কাঁচা ছুধে ভর্তি। উৎসবের সন্ন্যাসীরা আগুনে হাঁটছে। কলাপাতার ছুধে পা ভিজিয়ে নিচ্ছে। আবার হাঁটছে আবার ভিজিয়ে নিচ্ছে।

জ্যোতিরেখা উতলা হ'য়ে উঠছে রাতুলের জন্যে। ছেলেটা এসব দেখলে, অন্তত মনে একটু বিশ্বাস-ভক্তি জেগে উঠতো নিশ্চয়।

রাত্তিরে মনে হয়েছে না এসেছে, ভালোই হয়েছে। কি বীভৎস, কি মর্মান্তিক দৃশ্য। দেখা মাত্র বেহুঁশ হ'য়ে পড়েছে জ্যোতিরেখা।

বাজি পোড়ানোর উৎসবে দেহে আগুন ধ'রে গেল যে মানুষটার,

সেই মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খুঁড়ে সমাধি দেয়া হ'ল। খানিক রাখারও অপেক্ষা করা সইলো না কারো। আবার বাজি পোড়ানোর উন্মত্ত উল্লাসে মেতে উঠেছে সকলে। প্রাণের টান কোথায়!

এমন জায়গায় এমন পরিবেশে কেমন ক'রে প্রাণ বাঁচানো মন ঘোরানোর সন্ন্যাসী বা মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে? এও কি সম্ভব?

আর দরকার নেই থেকে একদণ্ড। ফিরে যাবে নয়নশোভা। ভালো লাগছে না আর।

জ্যাতিবোন বুঝিয়েছে অনেক। তন্ময়ানন্দজী প্রতিবারে ঠিক সময়ে আসেন। একেবারে কেন দেরী হ'চ্ছে, বুঝতে পারছে না কারণ। আর একটা দিন অপেক্ষা ক'রতে অনুরোধ ক'রেছে।

যাত্রা করার মুখে ছ্যাখা হয়ে গেছে আচমকা তন্ময়ানন্দজীর সঙ্গে। হাসি হাসি মুখ সৌম্যসুদর্শন। কত বয়েস বোঝা যাচ্ছে না। পাতলা গেরুয়া কাপড়-চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা। গোঁফ দাড়ি চুল—সমস্তই কালো কুচকুচে—চকচকে। বেশী উজ্জ্বল চোখের তারা দুটো। ও তারা যেন কত অভয় কত আশ্বাস।

আশায় বুক বেঁধে নয়নশোভা রাতুলের বিষয় সমস্তই জানিয়েছে তন্ময়ানন্দজীকে। কিছু রেখে ঢেকে বলে নি। প্রতিকার করার অনুরোধে, কোন উত্তর দেন নি, কোন সম্মতি জানান নি। কেবল মৃদু হেসে বলেছেন, সব শুনলুম তো। সময় আসুক। আবার পরের বছরে ছ্যাখা হবে এখানে।

আশাপূর্ণ হয় নি নয়নশোভাদের। নিরাশ হ'য়ে ফিরে এসেছে ওরা বাড়িতে। বাড়িতে এসে অবধি একটা বিষয়ই শুধু মনের মধ্যে খচ খচ ক'রেছে দিনেরাতে। তার অস্থির চিত্ত অবিশ্বাসী মনের জন্যেই কি ফিরিয়ে দিলেন তন্ময়ানন্দজী খালি হাতে। নানান রকম পরিস্থিতিতে সংসারী মানুষদের তো রকমারি মনের অবস্থা হবেই। মতিভ্রম হবেই। তা বলে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা ব্যথা বুঝবেন না। নির্দয় হবেন দয়ামায়ার বালাই বিসর্জন দিয়ে। তাহলে সৎব্রতে ব্রতী মানুষের সঙ্গে আর সাধারণের সঙ্গে তফাৎ কোথায়!

স্নেহময় বোঝায় নয়নশোভাকে। দুঃখ খেদ ক'র না। উনি যা ভালো বুঝেছেন, ব'লেছেন। বিশ্বাস রাখো, ভালোই হবে।

তোমার বিশ্বাস নিয়ে থাকো তুমি। একবছরে আরো কি ঘটবে, কে জানে। এখনই চরমে এসে গেছে। দেখে-শুনেও কি জ্ঞান হবে না তোমার !

বলার পর নয়নশোভা নিজেই ব্যথা পেয়েছে, এত ভালোমানুষ, একে বকা মানে নিজেকেই আঘাত করা।

কথার আঘাতে যাকে আঘাত দিয়ে নিজেই কষ্ট পেয়েছে নয়নশোভা, সেই মানুষকে কি আঘাতই না দিয়েছে রাতুল দিনকতক পর। কথা হ'লে তবু বাঁচোয়া ছিলো, একেবারে গায়ে হাত।

জ্বলে উঠেছে নয়নশোভা, জ্বলে উঠেছে নির্মলা। আর একমুহূর্ত বরদাস্ত করা হবে না এর অত্যাচার-উপদ্রব। ভদ্রতার জন্যে দুর্বল ভেবে ব'সেছে সকলকে। একটা হেস্তনেস্ত ক'রতেই হবে।

রাগের বসে কিছু ক'রে ব'সো না বৌদি। যত হোক, এবাড়ির ছেলে রাতুল, তোমার ছেলে রাতুল। থানাকাছারী কি ভালো হবে ? একটু বুঝে ছাখো। মাথা ঠাণ্ডা কর।

দ্বিগুণ খেপে উঠেছে নির্মলা।

আজ তোমার গায়ে হাত, কাল আমার, পরশু ওর বাবার। এ সহ্য করা যায় না। অসুরের মা হ'য়ে বাঁচতে চাই নে ঠাকুরপো।

নির্মলার গলার হার ছিনিয়ে নিয়েছে রাতুল, নিয়েছে নয়নশোভারও। বাধা দিতে এসে আঘাত পেয়েছে স্নেহময়।

নির্মলার জেদে থানাকাছারী হ'য়েছে।

স্নেহময়কে সাক্ষীসাবুদ দিতে হ'য়েছে। সাজার সময় আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই চিৎকার ক'রে বলেছে রাতুল।—ফিরে আসি, তারপর। পালের গোদা তুই। তুই প্রথমে। তারপরে একে একে। সাবধানে থাকিস স্নেহময়, বেইমান-বিশ্বাসঘাতক !

একবছর কেটে গেছে।

আবার পাত্রসায়েরে মেলা।

এসেছে নয়নশোভারা।

ভক্তিতে নয়, ভয়েতে—তন্ময়নন্দজীর কাছে। এবারে আসার পরই স্থাখা হয়ে গেছে।

একেবারে একান্তে—নিরালায় ডেকে নিয়ে গিয়ে অন্তরঙ্গভাবে কি সব কথাবার্তা ক'য়েছেন তন্ময়ানন্দজী স্নেহময়ের সঙ্গে—অনেকক্ষণ ধরে কারো কর্ণগোচর হয় নি কোন।

জ্যোতিরেখাদের সামনে হেসে বলেছেন, আমি সময় হ'লেই তোদের ওখানে আপনা হ'তেই গিয়ে পড়বো, দেখবি। কোন ভয় করবি না।

বাবা, প্রাণের প্রশ্ন আছে যে এখানে। রাতুলের যেরকম রাগ, সব সম্ভব। ও বলে যা, করে তা, বেরিয়ে এসে কি যে ক'রে বসে—সেই ভয়।

জ্যোতিরেখার মাথায় হাত রেখে বলেছেন তন্ময়ানন্দজী—আস্থক আগে। স্থাখা যাবে 'খন।

আজ ছাড়া পেয়ে এসেছে রাতুল।

দরজা ভাঙছে। পা তুটো ঠকঠক ক'রে বড্ড কাঁপছে জ্যোতিরেখার। কাঁপতে কাঁপতে ধড়াস ক'রে পড়ে গেছে মেঝেয়। দেয়ালের ঘুম ভেঙে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠেছে স্নেহময় কিন্তু ধীরস্থির।

ঘরের ভেতর পা রাখতেই রাতুল বিকট আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। স্নেহময়ের ওখান থেকে যেন একটা আগুনে হলকা বেরিয়ে এসে আছড়ে পড়ছে রাতুলের ওপর। কি ভীষণদর্শন আগুনের মানুষ একটা। জ্বলন্ত চোখে এগিয়ে আসছে। ওকে গিলে ফেলবে নিমেষে।

টলতে টলতে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে রাতুল। কথা কইতে পারছে না। দরদর ক'রে চোখের জল গড়াচ্ছে তু'গাল বেয়ে। উঠতে পারছে না, নড়তে পারছে না। তু'হাত জোড় ক'রে মাথা নাড়ছে কেবল, আর নয়, আর কখনো নয়। কখনো নয়, কখনো নয়।

সমস্ত বাড়ি ভেঙে পড়েছে স্নেহময়ের ঘরে। রাতুলের মতন রাতুলের বন্ধুরাও দেখে, যে যেখান দিয়ে পেরেছে ছুটে পালিয়েছে।

স্নেহময় কাছে এসে, বসে পড়েছে। রাতুলের মাথায় হাত বুলোচ্ছে, আর তন্ময়ানন্দজীর ছবির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ব'লছে সুস্থ ক'রে তুলুন! এমন হোক, এটা তো চাইনি। একি হ'ল! এমন জানলে কে এই অভ্যেস ক'রতো।

ভয় দ্যাখানোর জন্যেই স্রেফ। বলেছিলেন তন্ময়ানন্দজী। প্রাণ যাবার কোন ব্যাপার-ট্যাপার নেই এতে। মনে করবে তামার ত্রিকোণ-যন্ত্রের ওপর বসে আছি আমি। চারদিক দিয়ে উর্ধ্বমুখী আগুন জ্বলে উঠছে। নিশ্বাসে উচ্চারণ হ'চ্ছে, '...ভয়ঙ্করং ভীতিপ্রদং...।' আমি ভয়ঙ্কর আগুনের মানুষ হ'য়ে উঠছি। হ'য়ে গেছি।

এই ধ্যান একান্ত মনে দীর্ঘদিন অভ্যেস ক'রেছে স্নেহময়। রাতুলের ব্যাপারে সেই ধ্যান ক্রিয়ারই প্রয়োগ ক'রেছে। এখন দেখছে হিতে বিপরীত। জীবন সংশয় ঘটতে চলেছে ছেলেটার।

সারারাত জেগে বসে আছে স্নেহময়। অনুতাপ-অনুশোচনায় দগ্ধে দগ্ধে মরছে। কি করবে সে, কি হবে উপায়! তার জন্যেই না রাতুলের এই হাল।

এসেছেন তন্ময়ানন্দজী।

হাসতে-হাসতেই ঘরে ঢুকেছেন। কাল থেকেই কলকাতায় এসে রয়েছেন। এই ঘটনা ঘটবেন উনি জানেন। রাতুলের মাথাটা স্নেহময়ের কোল থেকে নামিয়ে নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন সযত্নে। মাথায় হাত বুলোচ্ছেন আস্তে আস্তে। নিশ্বাসে উচ্চারণ হচ্ছে ওঁর—'...সুন্দরং সুখপ্রদং শান্তিং আনন্দং।'

রাতুলের মুখের পরিবর্তন হয়ে আসছে।

মুছে যাচ্ছে মৃত্যুত্রাস।

শান্তি সুন্দর আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠছে।

কথা ফুটল রাতুলের মুখে। মৃদুস্বর, কিন্তু স্পষ্ট ঘুম আসছে! ঘুম ঘুম ঘুম...।

ঘুমিয়ে পড়ছে রাতুল তন্ময়ানন্দজীর শুচিস্নিগ্ধ কোমল কোলে ঘুমিয়ে পড়লো। অপরিসীম পরিতৃপ্তি, অজানা প্রশান্তি।

রতনমোতি।

রতনমোতি রোশনীকে নিয়ে মহাবিপাকে পড়েছে।

একধারে রোশনী একা, আর একধারে অগুনতি মানুষ।

কি যে করবে, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না মোটে।

পাতার পর পাতার মধ্যে দিয়ে জীবনস্রোতে বয়ে চলেছে রতন-মোতির পরিণতি।···

কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি রতনমোতি।

লোকেলোকারণ্য। চতুর্দিকে শুধু মাথা আর মাথা। থমথমে পরিবেশ, রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। রোশনীর নসিব কোনদিকে মোড় নেয়, কে জানে। এত লোক, কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। মেয়েদের মধ্যেও ফিসফিসিয়ে কোন কানাকানি নেই। মেয়ে-পুরুষ—সকলের মুখে একদম কুলুপ আঁটা। বাতাস ভারী হ'য়ে উঠছে ক্রমে। ছোট-বড়-লতানে—কোন গাছেরই পাতাটা পর্যন্ত নড়ছে না একটুও।

সব চেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার রতনমোতির।

অগুনতি চোখের তীক্ষ্ণ-অপলক দৃষ্টি তার দিকে। যেদিকেই তাকাচ্ছে, সেদিকেই অন্যের চোখে চোখ পড়ছে। এদের চোখের একটাই ভাষা স্রেফ। যে কোন প্রকারে একটা হেস্তনেস্ত। অনেক সময় দেয়া হ'য়েছে। আর নয়। আজই শেষ। রোশনীকে গ্রহণ, নয় বর্জন। দু'টোর একটা পথ বেছে নিতেই হবে রতনমোতিকে।

রতনমোতি নিজেও এবিষয়ে খুব সচেতন।

আর সচেতন বলেই এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব অস্থিরতা যন্ত্রণা ভেতরে। কোন রকমে অন্যায় ভুল সিদ্ধান্ত না করে বসে শেষে। শুধু একটা কথা। অগোচরে যদি একটা কথা খসে পড়ে মুখ থেকে, মেয়েটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রোশনী। বিচারপ্রার্থী, না করুণাপ্রার্থী তার কাছে আজ ও?

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকার মতো একইভাবে দাঁড়িয়ে। টানাটানা দু'চোখের করুণদৃষ্টি ঝরে পড়ছে। বুঝি সমস্ত ব্যথা-বেদনা উজাড় করে দিচ্ছে রতনমোতির চাঁপা রঙের দু'পায়ে।

সত্যি কি রোশনী জীবনে যা কিছু করেছে, সমস্তই অন্যায়? সবই কি ওর দোষ? দোষ দোষ?

রতনমোতি হাঁপিয়ে উঠছে।

নিজেকে সামলে রাখতে চেষ্টা ক'রছে দাঁতে দাঁত চেপে। নিজেকে একটু ধাতস্থ ক'রে নিয়ে মধুর গম্ভীর গলায় বলেছে, রোশনী মুখ তুলে তাকাও আমার দিকে। তোমার নিজের রায় তুমি বেছে নাও! এদের সকলকে জানিয়ে দাও।

জলভরা চোখে রোশনীর দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে আসছে। দেখতে পাচ্ছে না কাউকে, না কোন লোকজন, না রতনমোতির মুখ। না লাল-ভেলভেটে মোড়া রতনমোতির বসার সিংহাসন। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না! থেকে থেকে ঠোঁট দুটো বড্ড কেঁপে কেঁপে উঠছে।

রতনমোতির অবিচল দৃষ্টি ওর দিকে।

চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। কে? কে—ও? রোশনী না কমলমালা? একি দৃষ্টি বিভ্রম রতনমোতির। কেন এমন ভুল হচ্ছে তার? কেন—কেন? যত ভাবতে চেষ্টা করছে, না না, ও রোশনী—কমলমালা নয়। কখনোই নয়? হ'তে পারে না। তবু মন মেনে নিচ্ছে না তো! মন কেবল একইভাবে বলে চলেছে, কমলমালা কমলমালা কমলমালা! রতনমোতি! তুমি সমস্তই জানো, সবই চেনো! ভালো ক'রে ভাবো, ভালো করে ত্থাখো। ওর রায় ওর মুখ দিয়ে বার ক'রতে দিও না। কিছুতেই না। তুমি দেবে। তুমি, তুমি!

রতনমোতি উপস্থিত সকলকে আশ্চর্য ক'রে দিয়ে বেশ জোরেই বলে উঠেছে, রোশনী! তোমার রায় আমিই দোব। শোনবার জন্যে তৈরী হও তুমি।

কোমল মুখ কঠিন হ'য়ে উঠেছে রতনমোতির। কপালে রেখার কোঁচ। পাড় বিহীন গেরুয়া সিল্কের কাপড়ে ঢাকা দেহটাও বুঝি পাথর হ'য়ে উঠেছে। পিঠ ভর্তি রুখু-রেশমি চুলেও যেন শক্ত শক্ত জট পড়ে গেছে। শান্ত-সুন্দর স্নেহস্নিগ্ধ মুখে একি প্রতিক্রিয়া। বরং দেহি রুদ্রাণী মূর্তি একেবারে।

এ ভাবটা রইল না বেশীক্ষণ।

একটু পরেই হারিয়ে গেল। বিদ্যুৎচমকের মতো এলো আর গেল!

খুব দুর্বল দেখাচ্ছে রতনমোতিকে।

রতনমোতির ভেতর তছনছ হ'য়ে যাচ্ছে একটা দুর্দান্ত ঘূর্ণি ঝড়ে। ওলট পালট—সব ওলট পালট। ভেতর ব'লছে খালি, রোশনী, না কমলমালা? দু'চোখে মেলে ভালো ক'রে ছাখো। চোখ বুজে থেকে নিজেকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা ক'রো না।

দেখছে রতনমোতি! দেখছে দেখছে দেখছে।

রোশনীর চোখের জলে শোন নদীর জল টলটল ক'রে উঠছে না? শিউরে উঠেছে রতনমোতি! এতদিন বাদে আর কেন? এখনো কেন? ভুলতে চেষ্টা ক'রছে রতনমোতি। ভুলতে চেষ্টা ক'রছে রতনমোতি। মনকে ঘোরাতে চেষ্টা ক'রছে। চিন্তাভাবনার রাজ্য থেকে কমলমালাকে দূরে সরাতে চেষ্টা ক'রছে।

না, রতনমোতির সামনে দাঁড়িয়ে যে, সে রোশনী। কমলমালা নয়। কমলমালা মরেছে অনেকদিন। কেমন ক'রে ফিরে আসে! রোশনী, রোশনীই।

রোশনীর সঙ্গে রতনমোতির প্রথম দেখা কাশীধামে। বিশ্বনাথের দেশে। দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ির ধাপে। ও আপন মনে বসে বসে প্রার্থনা ভজন গাইছে। দৃষ্টি অনন্ত আকাশে। দু'চোখ বেয়ে জলের

ধারা নামছে। কি কাতর প্রার্থনা। অন্তরের গান। ভোজপুরের মেয়ের ভোজপুরী বুলি মিষ্টিগলায় ভারী সুন্দর। আশেপাশে লোকের ভিড় জমেছে। জমছেও আরো নানান বয়সের শ্রোতা। ছোট থেকে বড়।

রতনমোতির সঙ্গে সাঙ্গপাঙ্গ অনেক। ছেলে-মেয়ের দল।

গান শুনে, গানের টানে রতনমোতি এগিয়ে চলেছে। অনুগতের অনুসরণ ক'রছে। বাতাসে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়ছে গানের সুর গানের কথা। এহি এ মন্দিরিয়া মে অত সুখ কইলি, আগিয় লাগেলা রাম···।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রতনমোতি।

হ্যাঁ, ঠিকই। যত যত্নের যত আদরের দেহ হ'ক যার, থাকবে না থাকবে না। তখন আগুনেই শেষ সব।

চোখ বুজে চোখের জল ফেলে ফেলে গাইছে রোশনী। কে দেখছে, না দেখছে, কে এসেছে না এসেছে—কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। গান থামতেই রতনমোতির ডানহাত চেপে বসেছে রোশনীর মাথায়।

চোখ চেয়েই রোশনী লুটিয়ে পড়েছে রতনমোতির পায়ে। দেবীজী আমার কি মুক্তি নেই এজীবনে?

হাত ধরে রোশনীকে টেনে তুলেছে রতনমোতি। বুকে জড়িয়ে ধরেছে নিবিড় করে।

একটা অজানা আশংকায় কেঁপে উঠেছে রোশনী।

কেন! অমন কিন্তু বোধ করছো কেন?

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে গেছে রোশনী। দূর থেকেই পাথর বাঁধানো চত্বরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়েছে রতনমোতির উদ্দেশে।

রতনমোতি শুধু দেখেছে চেয়ে চেয়ে। কিছুক্ষণ। কোন কথাবার্তা না কয়েই নীরবে টাঙায় এসে উঠে বসেছে। ফিরে যাবে। সারনাথের দিকে। আশ্রমে। সঙ্গী-সঙ্গিনীরা যে যার টাঙায় এসে বসেছে। চলেছে টাঙার মিছিল। চলেছে গোধৌলিয়া পেরিয়ে। ডাইনে বেঁকে উত্তরে, আরো উত্তরে···।

অতটা রাস্তা, কিন্তু একেবারে নিস্তব্ধ মৌন রতনমোতি। বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখ। নিজেকে নিজেই জিজ্ঞেস ক'রে চলেছে, কেন এত আকর্ষণ মেয়েটার ওপর। পথেঘাটে মঠে-মন্দিরে তো অনেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কই এমন করে তো মুখের ছবি, জলভরা চোখের ছবি খোদাই হয়ে এঁকে যায় না? নিজের কাছে নিজেকেই খুব আশ্চর্য মানুষ ঠেকেছে রতনমোতির। ও আর রতনমোতি তফাৎ ভাবতে পারছে না। যেন অভিন্ন-অবিচ্ছিন্ন। মনে হ'চ্ছে, যে রতনমোতি টাঙায় বসে, সেই রতনমোতিই আবার গঙ্গার ঘাটের চত্বরে দাঁড়িয়ে। অদ্ভুত চিন্তাধারা পেয়ে বসেছে তাকে।

আশ্রমে ফিরে এসেও, একই ভাব। রাতে পুজোর সময়ও তাই। শোবার সময়ও এভাব যায় নি মাথা থেকে।

পরদিন বিকেলে আবার এসেছে রতনমোতি দশাশ্বমেধ ঘাটে। রোশনীর টানে, রোশনীর গানের টানে। আসবে না আসবে না ভেবেও আসতে বাধ্য হয়েছে। নিজেকে স্থির রাখতে পারে নি। ধরে রাখতে পারে নি আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে চেষ্টা ক'রেও। এবারে সঙ্গে নেয় নি কাউকেই। একেবারে একা। সঙ্গে আসার জন্যে কত অনুনয়-বিনয় মেয়েদের। রাখে নি। নিজের সিদ্ধান্তে অচল-অটল থেকেছে। না তো নাই। ছেলেদের আশ্রম থেকে ছেলেরাও এসেছে। ওদেরও একই দশা। ফিরিয়ে দিয়েছে। আজ একা যাবে রতনমোতি। সে সুস্থ সে সবল। তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে হবে না কাউকে। কোন প্রয়োজন নেই।

এসেছে রতনমোতি ঘাটে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে রোশনী। নিজেকে তফাৎ রেখে প্রণাম জানিয়েছে আগের দিনের মতো। রতনমোতি কাছে যেতে আঁতকে উঠে বলেছে, ছোঁবেন না দেবীজী। সারা দেহে আমার কালিমাখা। আপনার পবিত্র দেহ!

হেসে ফেলেছে রতনমোতি।

নিজেকে অত হীন ভেবো না। তুমি হীন নও। অনেক অনেক উঁচু।

চত্বরে সামনাসামনি বসেছে দু'জনে। রতনমোতি আর রোশনী রোশনী গান গায় নি। ইচ্ছে করেই। পাছে লোকজনের ভিড় হ'য়ে যায়। সে তার জীবনের গান শোনাতে চেয়েছে রতনমোতিকে। রতনমোতির সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই মনে দোলা দিয়েছে তার কে এই স্নেহ মমতায় গড়া দেবীজী! দিনেরাতে সারাক্ষণ দেবীজীর মুখ ভেসে উঠেছে চোখের সামনে, মনে হ'য়েছে কত জন্মের কতদিনের পরিচয় বুঝি। দেবীজী তার কাছে নতুন নয়। কত আপনার। একেবারে অন্তরের মানুষ তার। বিকেলভোর কি উৎকণ্ঠা তার। যদি না আসে, যদি না আসে! মনেপ্রাণে একা চেয়েছে সে দেবীজীকে। যা কাউকে শোনাতে পারে নি। শোনাতে গেলে, ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে লোকেরা, সে-কাহিনী দেবীজীকে শোনাবে। বিশ্বাস, দেবীজী নিশ্চয় শুনবে। তারপর দেবীজীই তার মুক্তির রাস্তা বাতলে দেবে নিশ্চয় কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে, আত্মগোপন ক'রে ক'রে আর কতকাল ঘুরে ঘুরে বেড়াবে রোশনী! আর যে পারছে না সে।

গোপন জীবনের গোপন কথা শুনতে শুনতে রোশনীর চোখের জলের ধারার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চোখের জলের ধারা নেমেছে রতন-মোতির দু'গাল বেয়ে। শেষে সস্নেহে আবার বুকে টেনে নিয়েছে রোশনীকে বোন! তুমি পবিত্র তুমি নিষ্পাপ তুমি দেবতার পুজোর ফুল।

কথা শুনে রোশনী নিদারুণ আঘাত পেয়েছে। দেবীজীও তার ওপর নির্দয়। একি বিদ্রূপ! পুজোর ফুল!

উঠে পড়ছিল রোশনী। রোশনী পথের মেয়ে। পথেই হারিয়ে যাবে। কে শুনবে তার আবেদন-নিবেদন ব্যথার কথা। কেউ নেই, কেউ নেই। কোথায় আশ্রয় তার। নেই নেই। ঠাঁই কোনখানে।

জোর করে ধরে বসিয়ে দিয়েছে রোশনীকে। বলেছে রতনমোতি: আমার আশ্রমে তোমাকে নিয়ে যাব আমি এখুনি। আমার সঙ্গে।

হতভম্ব-হতবাক রোশনী!

স্বপ্ন, না সত্যি? ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছে। তার পোড়া

ভাগ্যে এ-ও কি সম্ভব। মায়ার ছলনা না তো? মরীচিকায় জলের ঢেউ নয় তো?

কেমন হ'য়ে গেছে রোশনী।

রতনমোতি হাত ধরে টাঙায় তুলে বসাবার পরও, নিজের মধ্যে নিজে ছিল না যেন ও। একটা পুতুল। রতনমোতির হাতের। ওরই ইচ্ছে ঘোরাচ্ছে ফেরাচ্ছে চলাচ্ছে বসাচ্ছে।

রতনমোতির ইচ্ছেতেই রোশনী সসম্মানে স্থান পেয়েছে আশ্রমে। সুরেলা-সুকণ্ঠের অধিকারী রোশনী। সকাল-সন্ধের ভজনে আশ্রমের সবাই মুগ্ধ। প্রাণের আবেগে ভক্তির নির্যাস মিশিয়ে যখন গায় ও, স্বর্গ নেমে আসে বুঝি মাটির বুকে। দেবলোক থেকে দেবতারাও নেমে এসে, তাদের মাহাত্ম্যগুণ শোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর মুখ থেকে।

আশ্রমের প্রধান রতনমোতির শুধু নয়, প্রত্যেকেরই ছেলেদের আশ্রমের ছেলেদেরও অতিপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে রোশনী ধীরে ধীরে। রোশনীর আচার ব্যবহারের তুলনা নেই। অতিথি আপ্যায়ন দেখবার মতো শেখবার মতো। পা ধুইয়ে-মুছিয়ে দেয়া থেকে পরিপাটি ক'রে খাওয়ানোর পর মুখ ধোয়ার জলটি পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। বিশ্রামের শয্যার ব্যবস্থা করা, কোন কিছুর ত্রুটি খুঁজে পাবে না কেউ। শুধু কি এই নাকি? সেবা—কারো কোন রোগ জ্বালা হলে, ওর নাওয়া খাওয়া ত্যাগ। মায়ের স্নেহ ঢেলে বুকভরা সেবা। ভোলা যায় না। ভাবা যায় না।

রতনমোতি খুশী।

তার অবর্তমানে শূন্যস্থান পূর্ণ করার মতো মেয়ে বটে রোশনী। এতদিনে রতনমোতি নিশ্চিন্ত। রোশনী আশ্রম-সেবিকার ধাতুতে গড়া।

কিন্তু এই রোশনীকে নিয়েই আজ তুলকালাম কাণ্ড বেধেছে আশ্রমে। সবাই ওকে দেখে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কথাবার্তা বন্ধ। ছোঁয়াছুঁয়িও। রোশনী পাপী রোশনী নরক। রোশনী

রাক্ষুসী। আত্মগোপন ক'রে মিথ্যে ছলনার আশ্রয় নিয়ে পবিত্র দেবভূমিতে ঢুকেছে। দেবভূমি আজ অপবিত্র পাপীয়সীর জন্যে। কি অভিনয় কি প্রবঞ্চনা। প্রত্যেকের চোখে ধুলো! সাংঘাতিক-সর্বনেশে মেয়ে ও। এক মুহূর্ত দেরী না ক'রে, এখুনি বিদেয়। ও যদি বিদেয় না হয়, ওকে যদি রতনমোতি বিদেয় না করে, তাহলে আশ্রমের সব মেয়েরা বিদেয় নেবে নিজে হ'তে। প্রত্যেকের মানসম্মান আছে। গরীব হ'ক, বড় হ'ক—সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা তাদের একটা বংশ পরিচয় আছে। রোশনীর কি আছে?

একটা কুলটা। ওর নাম মুখে নিতেও পাপ। কুমারী থেকে চরিত্রের বালাই নেই কোন। স্বামীত্যাগিনী। কত পুরুষ যে পতি ওর কে জানে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ওর হাতে খাওয়া-খায়ি। প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে রেহাই নেই কোন। এতদিনের সাধন ভজন সব পণ্ড—সব বৃথা হ'য়ে গেল।

সকলের সমস্ত আবেদন-নিবেদন স্থির-ধীর হ'য়ে বসে বসে শুনেছে রতনমোতি। যতটা পেরেছে, নিজের বুদ্ধি বিচার দিয়ে বুঝিয়েছে ওদের। অতীতে কেউ যদি সত্যিসত্যিই বিপথে চলে যায়, ফিরতে চাইলে কেন সে সুযোগ দেয়া হবে না তাকে। দেয়াটাই তো সন্ন্যাসীর ধর্ম! সুরদাসের গানের কলির একটা লাইনে গেয়ে শুনিয়েছে, 'অজ্ঞানী সে ভেদ হ্যায়, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।'

সমবেত সকলে গলায় গলা মিলিয়ে বেশ জোরেই বলে উঠেছে, আমরা পবিত্র, আমরা পবিত্র হ'য়েই থাকতে চাই। ফের বুঝিয়েছে তুলসীদাসের দোঁহা শুনিয়ে রতনমোতি। তোমরা পবিত্র। তোমাদের পবিত্র স্পর্শে ও-ও পবিত্র হ'য়ে উঠবে। আগুনের স্পর্শে কয়লার কালোও তো নিশ্চিহ্ন হ'য়ে সাদা হ'য়ে ওঠে। 'কয়লা সি ময়লা ছুটে জব আগ করে পরবেশ।'

কোন কিছুতেই ফল হয় নি।

রতনমোতির সঙ্গে এতদিন থেকেও এদের একি মনোভাব! যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল যেমন ভাবে, সে ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আশ্চর্য। না, এদের কারো দোষ নয়। রতনমোতির নিজের ভেতরই বুঝি ঠিকমতো তৈরী হয় নি এখনো, তা নাহ'লে তার মনের প্রভাব এতটুকুও পড়ল না ওদের কারো মনের কোণেও। পড়ছেও না তো।

ওরা যে যার ঘরে ঘরে বিশ্রাম নিতে যাবার আগে রোশনীর পাপ কর্মের প্রমাণের ফিরিস্তি দিয়ে যেতে ভোলে নি আর একবার। রতনমোতির স্মরণে থাকবে। রোশনীর মোহে অন্ধ রতনমোতির যদি চোখ খোলে তবু।

বালিয়া থেকে যে অতিথিরা এসেছে আশ্রমে, তারাই প্রধান সাক্ষী। তারাই এখানে ওকে দেখে অবাক প্রথমে। তাদের পুরনো সঙ্গিনী রোশনী। দরকার পড়লে, আরো অনেক রোশনীর অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের এখানে নিয়ে আসতে পারে। ওকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে অনেকে। খবর পেলে এখুনি তুলে নিয়ে চলে যাবে। দরকার পড়লে, সেটা করতেও ওরা পেছপা হবে না।

মানুষ এখনও দয়ামায়াহীন হয়। যদি একটা মেয়ে বাঁচবার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, তাকে কি বাঘের মুখে তুলে দিতে হবে! মেয়ে হ'য়েও মেয়ের হৃদয় বোঝে না এরা কেউ! রোশনী রতনমোতির চোখের মণি হ'য়ে উঠেছে, এটা পুরনোদের অনেকের চোখে জ্বালা ধরেছে। চোখে শুধু নয়। মনেও, মাথায়ও। চাপা ছিল। এতদিন ছাইচাপা আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলছিল, আজ সুযোগ পেয়ে জ্বলে উঠেছে দপ ক'রে মরণ-আক্রোশের আগুন। রতনমোতিকে দিয়ে রোশনীকে দূর না করিয়ে ওরা কেউ কিছুতেই ছাড়বে না রতনমোতিকে, কিছুতেই না।

তবু রোশনীকে আগলে আগলে আটকে রেখেছে রতনমোতি। ছাড়ে নি। ছাড়তে চায় নি। সময় পেলে অনেকের অনেক ভুলভ্রান্তি ভেঙে যায় তো আবার। এটা তো মিথ্যে নয়। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে। এখানেও বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে যে পড়বে না, কে বলতে পারে। ফল ফললেও ফলতে পারে। চেষ্টার দোষ কি!

না, ফল ফলে নি।

কোন মেয়েরই মন পালটায় না। রোশনীকে বিদেয় করার সিদ্ধান্ত থেকে এক চুল নড়ে নি কেউ। বরং দেরী হওয়ায় আরো বিদ্রোহী ওরা।

রতনমোতিকে ওদের শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছে। তিনদিন সময়। এরপর আশ্রম বর্জন ওদের। রোশনীর গায়ের কালি নিজের গায়ে মেখে, রোশনীকে আশ্রমে নিয়ে থাকুক রতনমোতি।

কেঁদেকেটে কত বলেছে রোশনী, ওরা অন্যায় কিছু বলে নি দেবীজী। সব সত্যি। সে এখানের অনুপযুক্ত। তাকে বিদেয় দেয়া হ'ক। এদের শান্তি হ'ক। তাকে নিয়ে রতনমোতির মানসিক যন্ত্রণা সেটাই বড্ড বেশী লাগছে তার। সেটাই সে আর সইতে পারছে না একদম।

তবুও রোশনীকে আটকেছে রতনমোতি।

রতনমোতি রোশনীর সমস্তই জানে। কোন ব্যাপারে কোন কথা গোপন করে নি। রতনমোতি কাউকে জানাতে বারণ করেছে, এখন নয়, পরে। সময় হ'লে। ঋতুর ফুল সময়েই ফোটে। রোশনীর কাজকর্মে গুণে যখন ওরা মুগ্ধ হ'য়ে যাবে, তখন আসল রোশনীকে ওরা চিনতে পারবে। তখন ওরা প্রত্যেকেই এক একটা রোশনী হ'য়ে উঠতে চাইবে। তখন ওদের কাছে রোশনীর আগের জীবন থেকে মুক্তির জীবন একটা আদর্শ জীবনের জলন্ত উদাহরণ হ'য়ে থাকবে।

সে আর হ'ল কই!

সময় আসার আগেই অসময়ে বাজ পড়ল রোশনীর মাথায়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে রতনমোতি।

আজ শেষ তিনদিনের দিন।

সকাল থেকে মেয়েরা এসে চোখের জলে পা ধুইয়ে দিয়েছে রতনমোতির। এতদিন মায়ের আদর পেয়েছে তারা রতনমোতির কাছ থেকে। রতনমোতিকে ভুলতে পারবে না তারা জীবনে। প্রত্যেকের গলার লকেটে রতনমোতির ছবি।

বুক অবধি ঝুলছে। ছবির রতনমোতি ওদের বুকের মাঝে হাসছে। কি স্বর্গীয় হাসি। রক্তমাংসের রতনমোতির বিষণ্ণমুখ। মাঝে মাঝে চোখের কোণ চিকচিক ক'রে উঠছে। প্রত্যেকের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছে রতনমোতি। হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে, কত দুর্বল কত শীর্ণ।

ওরা আজ আশ্রম ছেড়ে চলে যাবে। তাই যাওয়ার প্রণাম সারছে সকলে ব্যথার ভারে নুয়ে পড়ে। ভীষণভাবে মোচড় দিয়ে উঠছে রতনমোতির ভেতর। চুপ ক'রে বসে থাকতে পারছে না। পারল না।

সিংহাসন ছেড়ে উঠে পড়েছে।

না, তোমাদের কারো আশ্রম ছেড়ে এক পা বেরোনো চলবে না। কাউকে যেতে দোব না আমি। না না না। আমি বেঁচে থাকতে নয়। একটু অপেক্ষা কর তোমরা। বিকেলটা অবধি অন্তত।

দু'চোখে হাতচাপা দিয়ে বসে পড়েছে রতনমোতি। মেয়েরা চতুর্দিক থেকে এসে ঘিরে ধরেছে। মা, মা। আমাদের মা।

···দিন গড়িয়ে এসেছে বিকেল আশ্রমে। মিহিঘাসের সবুজ কার্পেটে মোড়া মাঠে তিল ধারণের জায়গা নেই একটুও। ছেলে-মেয়ে ভর্তি। ছেলেদের আশ্রম থেকেও কোন ছেলের আসতে বাকি নেই।

মাঠের সামনে শ্বেতপাথরে বাঁধানো পাঁচ ধাপের বেশ উঁচু বেদী। তার ওপর সিংহাসন। সিংহাসনে বসে রতনমোতি। আকাশ-পাতাল ভাবনা। ভাবনার সাগরে উঠছে-ডুবছে। ডুবছে-উঠছে।

বেদীর ঠিক শেষ ধাপের নিচে একটু তফাতে রতনমোতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রোশনী।

এতক্ষণ রোশনীর কথা ভাবতে ভাবতে, রোশনীকে দেখতেও মন স্থির হয় নি রতনমোতির। রোশনীর জায়গায় ঘুরে এসে হাজির আবার কমলমালা।

শোনপুরের কমলমালা।

কার্তিকী পূর্ণিমার মেলায় কি ভিড়, কি ভিড় শোনপুরে। অগুনতি লোকের। শুধু কি মেয়ে পুরুষ আর বাচ্ছার? তা কেন হবে। হাতী উট ঘোড়া—আরো কত কি। এছাড়া নাচগান জাদুর খেলা সার্কাস। হরেকরকমের দোকানপশার। খাবারদাবারের পর্যন্ত। নানা দেশের—দেহাত-গাঁয়েরও সব বয়েসের লোক এসে জড়ো।

রামবালকের পেড়াপীড়িতেই কমলমালা এসেছে মেলা দেখতে। কমলমালার দিকে খুব নজর রামবালকের। মেলাতে কত রকমের কত প্রকৃতির লোকই না আসে! দেশঘরে—শুধু দেশঘরেই বা কেন, শহরেও বিবির রূপগুণের খুব সমাদর খুব প্রশংসা। যে দেখে, সে আর চোখ ফেরাতে পারে না। অগত্যা এহেন বিবিকে—নতুন শ্বশুরালে এলেও এমন একটা মেলা, না দেখিয়ে পারে নাকি রামবালক!

রামবালক দু'হাতের বেড়ায় আগলে-আগলে নিয়ে চলেছে কমলমালাকে। যাতে বিবি ধাক্কা না খায় কারো সঙ্গে।

কমলমালা রামবালকের অতি আদরের দুলালী। সময় সময় ও দুলারীবিবি ব'লেও ডাকে। লজ্জায় কমলমালা একগলা ঘোমটা টেনে দিয়ে ঘরে পালিয়ে যায়। পায়ের রুপোর মল বেজে ওঠে। টুংটাং। নির্লজ্জ বেহায়ার মতো হেসে ওঠে রামবালক।

ভালো লাগে না এসব কমলমালার।

লোকটার যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে ঘটে। আক্কেল-বিবেচনার মাথা খেয়ে ব'সে আছে একদম। বিয়ের সময়ও কি বেহায়াপনা।

সাজানো মণ্ডপের ভেতর যজ্ঞের আগুন জ্বলছে তখন অগ্নি-পুরোহিত সাক্ষী রেখেই কমলমালার সিঁথিতে সিঁদুর টেনে দিয়েছে। সিঁদুরদান-পর্ব শেষ। আত্মীয়রা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল কমলমালাকে। এদিকে জ্ঞাতিবোনেরা গান গাইতে-গাইতে কোহবর ঘরে নিয়ে যাচ্ছে রামবালককে দল বেঁধে ঘিরে রেখে।···অযোধ্যপুরিয়া সে আইলন রঘুবর রাম, জানকী কে ঘর—রাজা জনক কে ধাম···। অনেকে আবার রীতিমতো বরকে নাজেহাল করবার জন্যে উদ্ভট উদ্ভট প্রশ্ন করছে। বর উত্তর দিতে না পেরে হেরে যায়।

কে কাকে হারাবে? রামবালক নাটক ক'রতেও জানে। যে-দৃশ্যের অবতারণা করল, ভয়ে সবার মুখ শুকিয়ে গেছে। মাথা ঘুরে নাকি পড়ে গেছে রামবালক ধড়াস ক'রে। মেয়েরা চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়েছে! পাখার বাতাস ক'রেছে। কি বিপদ। হরিষে বিষাদ যেন।

যাক এ অধ্যায়ের পর কোহবর ঘরে প্রবেশ ক'রে আর এক কীর্তি। মেয়েরা একই রঙের শাড়ী পরে ঘোমটা ঢেকে বসে রয়েছে ঘরে। জনাপাঁচেক। একটু থমকে গেছে প্রথমে রামবালক। ওরা আগে থেকেই বসে আছে। এবারে নিজের বিবিকে চিনে নেয়ার পালা। ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্কের একটি মেয়ে একটা পাতাসুদ্ধ আমের ডাল রামবালকের হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছে, এই মেয়েদের মধ্যে থেকে নিজের বিবিকে চিনে নাও! আমের পাতা মাথায় ছুঁইয়ে দিয়ে।

রামবালক কিন্তু এরীতি না মেনে চূড়ান্ত অসভ্যতা ক'রেছে যা নিয়ম নয় তাই। দু'জন দু'জন ক'রে দু'হাতে ঘোমটা খুলে দিয়েছে। হি-হি ক'রে হেসে উঠেছে। লাল ছোপধরা বড় বড় মূলোর মতো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

ঘরের কোণে পুজোর রামসীতা মূর্তি বসানো। মনে মনে স্মরণ ক'রে নিয়েছে কমলমালা। নিজের মান আদমির মান রাখতে মাথার ঘোমটা সরিয়ে মুখ খুলে ফেলেছে। বেশরম আদমি চিনে নিক। এসব ঘটনার পর কেমন মনে একটা বিরূপ ভাব এসে গেছে রামবালক সম্বন্ধে কমলমালার।

ওর সঙ্গে কোন জায়গায়ই যেতে চায় না ইচ্ছে থাকলে, কে জানে, লোক সমাজে না নিজের কৃতিত্ব গৌরব ভেবে নচ্ছার কিছু ভাঁড়ামি ক'রে বসে। অন্তরের কথা রামবালকের কাছে চেপে রাখে নি কমলমালা। যাকে নিয়ে জীবনভোর ঘর, তার কাছে লুকনো-ছাপানোর ঠিক নয়। দু'জনের মধ্যেই এ বোঝাপড়া বিশেষ প্রয়োজন। রামবালক স্বীকার ক'রেছে অন্যায়। আর হবে না।

মেলাতেও এনেছে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে।

মেলা দেখাতে দেখাতে কোন গণ্ডগোলই করে নি রামবালক। হঠাৎ

মাথায় কি ভূত চাপল কে জানে। অন্য ধারে নিয়ে গেছে কমলমালাকে। আপত্তি ক'রেছে কমলমালা, অন্ধকার-অন্ধকার লোকজন নেই, ওখানে দেখার কি আছে?

সেকি! ভগবানের মন্দির। শিবজীর। জাগ্রত দেবতা। প্রণাম না ক'রে এলে অমঙ্গল হবে যে। নিজের নাক-কান ম'লে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়েছে রামবালক। অগত্যা যেতে হয়েছে কমলমালাকেও।

প্রণাম সারার পর আরো ভেতর দিকে নিয়ে গেছে একটা জায়গায় টিমটিমে লণ্ঠনের আলো জ্বলছে গোটা চারপাঁচ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কটা মেয়ে বসে আছে এপাশে-ওপাশে। কারো মাথায় ঘোমটা, কারো খোলা। কেউ মাঝবয়েসী, কেউ কম তার চেয়ে। জায়গাটা যেন একটা খাটাল। চতুর্দিকে মোটা কাঠের খুঁটি। মাথার ওপর টিনের চাল।

এখানে কেন—কথাটা মুখ থেকে খসতে না খসতে জনতিনেক জওয়ান এসে হাজির। রামবালককে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস ক'রে কানে কানে কি সব বলেছে ওরা। আচমকা রামবালকের মুখের ভাব একটা কিরকম হ'য়ে গেছে। যেন কোন দুঃসংবাদ পেল বুঝি এখুনি। দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কমলমালার কাছে এসে জানিয়েছে মহাবিপদের কথা। বন্ধুর বৌ অজ্ঞান হ'য়ে গেছে মেলায়। সে যাচ্ছে। এই বন্ধুরা ডেরায় পৌঁছে দেবে'খন। জানিয়েই, একছুটে চলে গেছে।

মহাফাঁপরে পড়েছে কমলমালা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তবে জওয়ানরা বেশ সম্ভ্রম রেখেই তার সঙ্গে কথা বলেছে, ভাবীজী ঘাবড়াইয়ে মত। সত্যিই ওরা যত্ন ক'রে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হ'লে কি হবে, কমলমালার ভেতরে রাজ্যের ত্রাস। বুক ঢিবঢিব ক'রে চলেছে একনাগাড়ে। বুকের আওয়াজে একটা বিপদের সংকেত শুনছে।

তিনজন জওয়ানের একজন চলে গেছে রামবালকের সঙ্গে। অন্য

দু'জন তার দু'পাশে। প্রহরীর মত পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ ধূমকেতুর আবির্ভাবের মতো শক্তসমর্থ চারপাঁচজন তরুণ এসে হাজির হয়েছে সামনে। ওরা যেন অন্ধকারে ভুঁইফুঁড়ে বেরিয়ে এলো। হাতে ভোজালী-তলোয়ার-রিভলবার! এদের ঘিরে ধরে কমলমালাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কমলমালার কাতর আর্তনাদে কারো সাড়া পাওয়া যায় নি। কেউ আসে নি রক্ষে করতে। হয়ত নিজেদের প্রাণের মায়ায়।

সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য ঠেকেছে কমলমালার। নিজেদের বাড়ির কাছ বরাবর আসতে। যুবকরা জোড়হাত ক'রে বলেছে, নমস্তে ভাবীজী। আপ ঘর যাইয়ে।

ঘর ফিরেও বুকের কাঁপুনি যায় নি কমলমালার। একথা বলবে সে কাকে! স্বামী ছাড়া বাড়ির কাউকে তো আর প্রকাশ করা যায় না।

রাতে বাড়ি ফিরতে রামবালককে সমস্ত ঘটনা জানিয়েছে চোখের জলে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে! যে বন্ধুরা নিয়ে আসছিল, তাদের কাছ থেকে এদের ছিনিয়ে আনার কি প্রয়োজন ছিল? ওরাও তো বাড়ি পৌঁছে দিতে আসছিল। দরকার ছিল। তুমি ওসব বুঝবে না। রামবালকের গলার স্বরে বিরক্তি ফেটে পড়ছে। এরা কারা? প্রশ্ন করেছে কমলমালা। জবাব দিয়েছে রামবালক, সাচ্চা দোস্ত ওরা? ক্ষেপে উঠেছে রামবালক—অত খবরে দরকার কি?

আর কোন প্রশ্ন করেনি কমলমালা।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, এ মানুষের সঙ্গে জীবনে আর একপাও বাড়াবে না বাড়ির বাইরে। কোনরকমে না। শত অনুরোধ-উপরোধ কান্নাকাটিতেও না। লোকটা হৃদয়হীন একেবারে। কপালে এই ছিল তার!

কথায় আছে স্বভাব যায় না ম'লে, এও ঠিক তাই।

ভেবেছিল কমলমালা, তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ধনুকভাঙা পণ দেখে রামবালকও আর কখনো নিয়ে বেরোবার কথা উচ্চারণ করবে না। তা বুঝি হবার নয়। বেহায়ার নাহি লাজ নাহি মান নাহি অপমান,

সুজনকে এক কথা মরণ সমান। বছর ঘুরে এসেছে। আবার এসেছে কার্তিকী পূর্ণিমার মেলা। শোনপরের মেলা। রামবালকের কি অনুনয়-বিনয় আবার। হাতে ধরছি, এবারটির মতো। আর বলবো না কোন বছরে। দোহাই তোমার। শপথ করছি, যা যার যা হোক, জাহান্নামে যাক যে, আমি তোমাকে ছেড়ে এক পা নড়ছি না। প্রাণ যাক আর থাক। তোমার কোন ভয় নেই। কোন বিপদ হবে না। আর ভুলেও কারো হাতে ছেড়ে দিচ্ছি না। খুব শিক্ষা হয়েছে।

না। যাবে না কমলমালা। দেবতারা এলেও তাকে নিয়ে যেতে পারবে না কোনমতে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন!

অপারক হ'য়ে নিয়ে যাবার কারণ শোনাতে ছাড়ে নি রামবালক। কেন এত পেড়াপীড়ি?

শুনে তো ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কমলমালা। ছিঃ ছিঃ। নিজের ছলচাতুরীর কথা শোনাতে মুখে বাধলো না একটু। মনে ভাবে, না জানে কি পৌরুষেরই ব্যাপার এটা। কি উঞ্ছবৃত্তি!

আর বারের ঘটনাটা নাকি সব সাজানো। বন্ধুর বিবি অজ্ঞান। এক বন্ধুর সঙ্গে চলে যাওয়া। যার সঙ্গে চলে গেছে, সে মেয়ে বিকিকিনির মুরুব্বি। যে দু'জন বন্ধু বাড়ি নিয়ে যাবে বলা হ'য়েছিল, আসলে তারা কিনে নিয়েছিল কমলমালাকে। নিয়ে যাচ্ছিল তাদেরই আস্তানায়—তাদের দেশ ঘরে। যারা যারা উদ্ধার করে পৌঁছে দিয়ে গেছে কমলমালাকে, তারাই আসল বন্ধু। আগে থেকে ওদের সমস্ত বলা কওয়া ছিল।

কমলমালাকে তো আর সত্যি সত্যি কারো হাতে ছেড়ে দিচ্ছে না। জীবন থাকতে পারবে না। মাঝখান থেকে কিছু টাকা কামিয়ে নেয়া মন্দ কি! যার বুদ্ধি আছে সেই জেতে। আর নির্বুদ্ধি আহাম্মুক-লোভীরাই ঠকে চিরকাল। এখেলা খেলতে খুব ভালো লাগে রামবালকের। স্ত্রী বলেই, প্রাণের কথা মনের কথা জানিয়েছে রাম-বালক। পত্নীর পতির আদেশ শিরোধার্য করা উচিত। কোন অন্যথা নয়। অমান্য তো একদম নয়। তাহলে নরকগামী হতে হবে।

এবিষয়ে কোন ভুল নেই।

কমলমালা কেবল চেয়ে চেয়ে দেখেছে শুধু রামবালককে।

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। সর্বনেশে লোক এ। ঢের বলেছে সে। আর নতুন করে ব'লে কোন লাভ নেই। দেখা যাক এর কতদূর বাড়। যুদ্ধক্ষেত্রে নামবার জন্যে তৈরী হতে হবে তাকে। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস ক'রতে পারবে না কমলমালা। অন্যায়ের হাতে নিজেকে বিলিয়ে দিতেও পারবে না।

গম্ভীর-কর্কশ গলায় বলেছে রামবালক, তুমি উত্তর দাও আর না দাও, আমার কিছু এসে যায় না। স্ত্রী স্ত্রীর মতো থাকবে। মতামত নেবার আমার কোন প্রয়োজন নেই। তোমায় যেতে হবেই। কেমন ক'রে নিয়ে যাওয়া যায়, সে বুদ্ধি আমার যথেষ্ট আছে। আমার খেতে-পরতে হ'লে আমার কথা শুনতে হবে। হবেই হবে। রাগেক্ষোভে ফেটে পড়ে দুম দুম ক'রে পা ফেলে ফেলে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে রামবালক।

চারপাইয়ের ওপর বসেছিল কমলমালা।

ওর বুক কাঁপার সঙ্গে চারপাইটাও কেঁপে উঠেছে।

এ লোক সব পারে। যে কোন মুহূর্তে তার বিপদ ঘটতে পারে। এখুনি না ব্যবস্থা করলে আর কোন উপায়েরই সুযোগ পাওয়া যাবে না। চারপাই থেকে উঠতে যাচ্ছে, শুনেছে পায়ের আওয়াজ। রামবালক বেরোতে গিয়েও ফিরে এসেছে। এ লোকের চোখে ধুলো দেয়া কঠিন। প্রাণ বাঁচাতে এর হাত থেকে মুক্তি পেতে অন্য পথ ধরতে হবে। স্থির মাথায় বুদ্ধি করে চলতে হবে।

উগ্রমূর্তিতে ঘরে প্রবেশ করেছে রামবালক। সপ্তমে গলা চড়িয়ে বলেছে, আজ যেতে হবে তোমাকে।

শান্ত গলায় হাসতে হাসতে বলেছে কমলমালা, আজ শরীরটা তত ভালো নয়। কাল নিশ্চয়ই যাবো।

একগাল হেসে রামবালক বলেছে, জানি, তুমি আমার কথা শুনবেই। গুন গুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

সেদিনই রাতের অন্ধকারে চুপিসাড়ে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে কমলমালা। গাঁয়ের মেঠোপথ ভেঙে ভেঙে এসে পৌঁছেছে বান্ধবী নাজমাদের বাড়ি। নাজমা অবাক। মুখে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ থাকতে ইশারা করেছে কমলমালা। ওর বোরখাটা চেয়েছে। বিশেষ দরকার। কিরকম বিশেষ? সব শুনে, নাজমাও কেঁদে সারা। ওরা বোরখা পরিয়ে দিয়েছে, পাছে না কেউ চিনতে পারে।

দরজা অবধি এগিয়ে দিয়েছে নাজমা। বলেছে, ধরা পড়লে আর বাঁচবি না রে কমল। পালিয়ে এসে কি ভুল করলি। জ্যান্ত মরার চেয়ে মরে বাঁচাটা কি ভালো নয় নাজমা? হেসে বলেছে কমলমালা।

কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে, কিছু জানে না কমলমালা। কমলমালা তবু চলবে। যেদিকে দু'চোখ যায়। চলতে-চলতে মৃত্যু যদি আসে আসুক। জানবে, তার জীবনে এটা মস্ত বড় করুণা ঈশ্বরের। আশীর্বাদ ঈশ্বরের। তবু মুক্তি হবে তো তার রামবালকের হাত থেকে। মজঃফরপুরে মায়ের কাছে গেলে, আরো অশান্তি। রামবালক তো হন্যে হয়ে যেখানে যেখানে যেতে পারে সে, যাবে। না, কারো কাছে নয়। নিজের অশান্তির বোঝা আর কারো ঘাড়ে চাপানো নয়।

কালো বোরখায় আপাদমস্তক ঢাকা কমলমালার।

লক্ষ্যহীন পথে চলেছে কমলমালা। চলেছে চলেছে চলেছে…।

বিচারকর্ত্রীর আসনে বসে রতনমোতি।

একইভাবে অপলকে তাকিয়ে আছে অপরাধী রোশনীর দিকে। অন্য সকলের কাছে রোশনী অপরাধী হলেও, রতনমোতি এখনো পর্যন্ত ঠিক মেনে নিতে পারছে না। তার চিন্তার রাজ্য থেকে জোর করে কমলমালাকে বার ক'রে দিয়ে রোশনী আনবার চেষ্টা ক'রছে। সামনে দাঁড়িয়ে যে, সে কমলমালা নয়। রোশনী। রোশনী রোশনী রোশনী।

বিয়ে হয়েছিল বীরলালের সঙ্গে।

বিয়ের আটমাস অবধি স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ীর খুব স্নেহের পাত্রী

া। বাদ সাধলো সুধন কোলে আসতে। কানাঘুষা হ'তে হ'তে দিকে একই কথা ছড়িয়ে গেল। আটমাসে এমন পুরুষ গড়নের লে হয় নাকি। ও দশমাসের ছেলে। বৌয়ের বাড়ি থেকে চেপে য় দিয়ে দিয়েছে। যাক শত্রু পরে পরে। তা কখনো হয়, পাপ নো ঢেকে রাখা যায়। বীরলালটা ভেড়া। মিথ্যে বাপ হওয়ার নন্দে নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে। ওর মা-বাবাই বা কেমনতর? একটুও বোঝে না। নাতি নাতি ক'রে পাগল? এদিকে যে, গাঁয়েগঞ্জে নপাতা দায়—সে খেয়াল নেই। লজ্জায় মরে যাচ্ছে সবাই, ঘেন্নায় র যাচ্ছে সবাই। চতুর্দিকে ছিছিকার পড়ে গেছে। ওদের কোন নইজ্জতের বালাই নেই। হবে, হবে। ও ঘরের আইবুড়ো মেয়ে য়ছে এখনো, বীরলালের ছোট বোন—কে ওকে বিয়ে করবে? াশনীর জন্যে নিরীহ মেয়েটার বারাত পুড়ল। আ-হা-রে! গাঁয়ের াক একঘরে করবে ওদের। তবে যদি শিক্ষা হয়। রোশনীকে দেয় কর, তা নয় আনন্দ করার ধুম কি!

গাঁয়ের পঞ্চায়েতের প্রধানের রায় নির্দ্বিধায় মাথা পেতে মেনে য়েছে বীরলাল। বীরলালের বাবা বীরলালের মা। যাকে বলে না বাক্যব্যয়ে।

হাপুস নয়নে কেঁদে সারা রোশনী।

কেউ মুখ ফিরিয়ে তাকায় নি। কেউ কোন সহানুভূতি প্রকাশ রে নি। গাঁয়ের লোক তো দূরের কথা, মায় শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী র্যন্ত।

চোখের জলে ভিজে বুকে সুধনকে বুকে চেপে একা পথে বেরিয়েছে াশনী। রোশনী দিশেহারা পাগলপারা। কোথায় যাবে, কার াছে যাবে। কে ঠাঁই দেবে তাকে। তবু অজানার উদ্দেশে চলেছে। া ছাড়া অন্য গত্যন্তর নেই যে, তার আর।

গাঁও পেরিয়ে অন্য গাঁয়ের মুখে দেখা কুঞ্জকিশোরের সঙ্গে। ঞ্জকিশোর বীরলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আগে থেকে সমস্তই জানতো, াশনীর পরিণাম ভবিষ্যৎ কি? জেনেশুনেই রোশনীর জন্যে অপেক্ষা

করছে। সকলে ত্যাগ করলে কুঞ্জকিশোর কিন্তু ত্যাগ করে
রোশনীকে। বিপদভঞ্জনের ভূমিকা নিয়ে ওই কিন্তু রোশনীকে
যাত্রা রক্ষে ক'রেছে। বাঁচিয়েছে। তা না হলে রোশনীকে সুধন
নিয়েই আত্মঘাতী হ'তে হ'ত।

রোশনীকে নিয়ে এসেছে কুঞ্জকিশোর ভাগলপুর শহরে। তামা
ব্যবসায় ভালো রোজগারই ছিল কুঞ্জকিশোরের। সুধনও ভালোভা
মানুষ হ'য়ে উঠছিল, কিন্তু সুখের সৌধ বছর দুয়েক যেতে না যেতে
পড়েছে। বাড়ির কাঠামোটা সুদ্ধু মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। গ্রী
প্রখর রোদের তাপে সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠেছে কুঞ্জকিশোরে
জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। বেহুঁশ। ডাক্তার বদ্যির চেষ্টা সার্থক হয় নি
চলে গেছে কুঞ্জকিশোর দিনের শেষে। আবার পথে বসেছে ছে
নিয়ে রোশনী। ভাগ্য বটে!

এরপর যারা এসেছে রোশনীকে সাহায্য করতে রোশনীকে আগবাড়ি
স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তারা কিন্তু কুঞ্জকিশোর নয়। তারা কুঞ্জকিশোরের বিপরী
প্রকৃতির। ওরা তার রূপলাবণ্যের দাস হতেই চেয়েছে শুধু। তার অন্ত
টাকে দেখে নি! দেখতে চায় নি। ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যে, ওরই
চেয়ে, রোশনী অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছে

কিন্তু এত নিচে নেমেও কি তার সুধনকে ধরে রাখতে পেরে
রোশনী? পারে নি।

বছর চারেক বছরে সুধনও ছেড়ে চলে গেছে রোশনীকে। ড
নিউমোনিয়ায়। এ ব্যামো কার না হয়, কিন্তু সুধনের বেলা
একেবারে কাল হয়ে দাঁড়াল। শিশুমন—ও কি সব বুঝতে পার তে
হয়ত মায়ের নরক যন্ত্রণা ও আর চোখে দেখতে পারে নি বলেই, চ
গিয়ে রোশনীকে মুক্তি দিয়ে গেল?

ঘরে একা বসে বসে কেঁদেছে আর ভেবেছে মনে মনে।

কিসের বাঁধন আর তার? নিজের পাপজীবনের মুক্তির জ
পালিয়ে এসেছে কাশীধামে। গঙ্গার ধারে ভজনের আসরে দেবী দ
হয়েছে তার। দেখেছে রতনমোতির মধ্যে দয়া মমতায় ভরা পতি

[ধ]ারিনী অন্নপূর্ণামূর্তি। প্রার্থনা করেছে মুক্তির।

দেবী অভয় দিয়ে এসেছে আশ্রমে। বলেছে, তুমি পাপী নও। [তু]মি পবিত্র। ইচ্ছাকৃত কোন অন্যায় কর নি তুমি। অনুশোচনার [আ]গুনে পুড়ে পুড়ে যত খাদ তোমার, সব শেষ হ'য়ে গেছে।

এতক্ষণ বাদে রতনমোতি নড়ে বসেছে। কিছুক্ষণ আগের পাথর [মূর্তি]তে প্রাণের সঞ্চার হল বুঝি। সিংহাসনের দু'পাশের হাতলে ভর [দি]য়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখের দৃষ্টি ঘুরে এলো একবার [স]কলের দিকে চক্কর দিয়ে। আবার দুচোখ রোশনীর চোখে আটকেছে। [আ]বার ওই চোখে কমলমালার চোখ ভেসে উঠছে।

···বোরখা পরে চলতে চলতে ক্লান্তশ্রান্ত কমলমালা। আর পারছে [না]। দুদিন ধরে চলেছে তো চলেছেই। রাতে-দিনে বিরাম নেই। [ত]ষ্টার জল পায় নি। ছাতি ভেজে নি। শুকিয়ে কাঠ। পেটে [দা]না নেই। শরীরটা কিরকম করছে। কোথায় এসেছে—কতদূরে—[স]ব নাগালের বাইরে কি? মাথাটা কেমন ঘুরে উঠছে। অন্ধকার, [চ]তুর্দিক অন্ধকার। সারা শরীর বড্ড বেশী কাঁপছে। টলছে কমলমালা। [দাঁ]ড়াতে পারছে না। পরে গেছে ধড়াস ক'রে। এরপর আর কিছু [জা]নে না।

জ্ঞান হতে দেখেছে নির্বাণজীর কোলে মাথা। মাথায় সস্নেহে হাত [বু]লিয়ে দিচ্ছেন। কমলমালার মনে হয়েছে স্বয়ং শিব এসে [মৃ]তসঞ্জীবনী সুধা তার মুখে ঢেলে দিয়ে বাঁচিয়ে তুলছেন যেন। মাঝে [মা]ঝে জলের মতো মুখে কি ঢালছেন কুশি ক'রে। মিষ্টি-মিষ্টি লাগছে। [ভি]তর-বার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।

কাছেই, গাঁয়ের বাইরে তপোবনের মতো আশ্রম নির্বাণজীর। [এ]টাও মেয়েদের। বিহারের এ জায়গাটা খুব নিরিবিলি-নির্জন। [শে]ষ রাত্তিরে যজ্ঞ সেরে বেরিয়েছেন পায়চারি করতে নির্বাণজী। [অ]চৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছে কমলমালাকে।

আশ্রমের মেয়েদের হাতেই, নিয়ে এসে, কমলমালার সেবার ভার [দি]য়েছেন! একটু সুস্থ হতে কাশীধামের আশ্রমে নিয়ে এসেছেন।

ওখানে নিরাপদ নয় ব'লে। যদি এসে পড়ে রামবালক।

রামবালকের কাছে কাশীর আশ্রম অগোচর থাকে নি। অনে খোঁজাখুঁজিতে না পেয়েও হয়রান হয় নি। কমলমালাকে বার করতে হবে। জীবনের মায়া ত্যাগ ক'রেও। অসুর প্রকৃতির লোকে লক্ষ্যটাই বড় একটা হয় না। যেটা করবে, সে বিষয়ে ইচ্ছেশ প্রবল। এতটুকু নড়চড় নয়। তাই তারা তাদের ইচ্ছে পূর্ণ কর সক্ষমও হয়। সে দেরী হ'লেও।

প্রায় পনের বছর পর।

পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে পৌঁছেছে কমলমালা। স্নেহময়ী জননী চেহারা। দেখলেই ভক্তি আসে। কিন্তু অসুরের চোখ বুঝি অ ধাতুতে গড়া। দৃষ্টি আলাদা। আগের কমলমালাকেই দেখে রামবালক। দশাশ্বমেধ ঘাটের চত্বরে। মেয়েদের নিয়ে মাঝে মা আসে। বজরায় বসে অর্ধচন্দ্র কাশীর দৃশ্য দেখতে। ওর ব ভালো লাগে। সন্ধ্যে-জোছনায় বড় সুন্দর হয়ে ওঠে। সমস্ত মন্দি যেন অর্ধচন্দ্র রেখার ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

কমলমালাকে দেখতে পেয়ে টাঙাকে অনুসরণ ক'রেছে রামবালক আশ্রমে এসে হাজির।

রণং দেহি মূর্তি।

নির্বাণজীর হোমের আগুন তখন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে। যজ্ঞের আগুনে কাঠের হাতায় ঘি ভর্তি ক'রে ক'রে আহুতি দিচ্ছেন নির্বাণজী আদিরূপে জ্যোতির অদৃশ্যশক্তির আরাধনা-প্রার্থনা। সকলের মঙ্গল প্রার্থনা সর্বজন হিতায়।

বিকট চিৎকার রামবালকের। কমলমালাকে এখুনি যেতে হবে আমার সঙ্গে।

বুক কেঁপে উঠেছে কমলমালার।

পুজোর আসন ছেড়ে উঠে এসেছেন নির্বাণজী।

দাঁড়িয়েছেন সামনে এসে। দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, যাবে না। যাবে না।

নির্বাণজীর আশ্রমের মেয়েরা, পাশের ছেলেদের আশ্রমের ছেলেরাও যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। সকলে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে নির্বাণজীর দুপাশে। কিন্তু নির্বাণজীকে বাঁচাতে পারে নি কেউ।

রামবালকের হাতের রক্তখেকো ছোরা ঠিক লক্ষ্যেই পৌঁছেছে। একেবারে বাঁদিকের বুকে। রামবালককে ধরে ফেলেছে সকলে। কেবল ধরে রাখতে পারে নি নির্বাণজীকে।

নির্বাণজীর অমৃতবাণী শুনতে পাচ্ছে রতনমোতি। সূর্যের দিকে মুখ করে চললে ছায়া পেছনে। পেছন ফিরে চ'ললে ছায়া সামনে। সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে সামনে চললে—এগিয়ে গেলে, ছায়ার মতোই মিথ্যে পেছনে পড়ে থাকে। শত বাধা বিঘ্ন এলেও এগিয়ে চলবে। এগিয়ে চলবে সত্যকে লক্ষ্য রেখে।

বেদীর সিঁড়ি দিয়ে নামছে রতনমোতি।

নামল। নরম ঘাসের ওপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে রোশনীর দিকে।

নির্বাণজী বলেছিলেন, আমার চিনতে ভুল হয় নি তোমায়। তুমি সব রত্নের রত্ন। তুমি রতনমোতি।

নির্বাণজীই কমলমালার নামকরণ করেছিলেন। রতনমোতি। দুবৃর্ত্তের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে দেহ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে তাঁকে।···

রোশনীর কাছে এসে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রতনমোতি। আদর ক'রে, চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে টেনে নিয়েছে বুকে।

চলেছে দুজনে পাশাপাশি। হাত ধরাধরি ক'রে। রতনমোতি আর রোশনী।

এগিয়ে চলেছে ওরা সামনের দিকে। আরো আরো আরো···।

জানকী।

সম্পূরণের পরেও জানকী বন্দী হ'য়েছে রূপচাঁদের কয়েদ খানায়।

কিসের কারণে?

মনোবল কি রূপচাঁদের প্রাণঘাতী আকর্ষণ থেকে বাঁচাতে পেরেছে ওকে? বাঁচাতে পেরেছে নীলাঞ্জনকে?

মধুর ভয়ঙ্করে মাখামাখি হরফের মালায় সাজানো···

অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ঘরটার ভেতর।

বাইরের ধোঁয়াটে-গুমোট আকাশের ভারী বাতাস ভেতরে বড্ড-বেশি ভারী হ'য়ে উঠছে। মুহূর্তে-মুহূর্তে পরিবেশ পাল্টাচ্ছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হ'চ্ছে জানকীর। অদ্ভুত অবস্থা। নিতে কষ্ট যেমন, রাখতে তেমনি। ছাড়তে আরো যন্ত্রণা। সময়ে সময়ে মনে হ'চ্ছে, প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যাবে এখুনি। জীবন-মরণের দোটানায় পড়ে অস্থির হ'য়ে পড়ছে জানকী। তলকূল খুঁজে পাচ্ছে না কোন। কি করবে, কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে?

তিষ্ঠতে পারছে না ঘরে, কিন্তু বেরোতেই বা পারছে কই! উভয় সঙ্কট। জানকী বন্দিনী। বন্দিনীদশা থেকে মুক্তি চায়। সে বেঁচেই হোক, আর মরেই হোক। অসহ্য হ'য়ে উঠছে জীবন। প্রতি বছরই তো জষ্ঠির এরকম গরম আসে, আবার চলেও যায়। কই, এরকম তো হয় নি কখনো কোনদিন জানকীর! এবছরেই সমস্ত কিছু ওলোটপালোট হ'য়ে যাচ্ছে। সব কাজে গণ্ডগোল, কেবল গণ্ডগোল।

সন্ধেয়ও বাতাস গরম। ঠাণ্ডা বাতাস আসার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না মাসের শেষ দিনটাতেও। আকাশের চাঁদও স্নিগ্ধ-শান্ত নয়। কটকটে সাদা। দিনের সূর্যের তাপ। তাপে তাপে দগ্ধে মরছে জানকী। এরকম মৃত্যু কামনা করে নি কিন্তু জানকী। নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে মরতে চেয়েছে বরাবর। চেয়েছে শান্তিতে, কোন যন্ত্রণা না পেয়ে, ঘুমের ঘোরে পরিতৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়তে বরাবরের জন্যে।

কতদিন কতবার একথা ব'লেছে রূপচাঁদকে।

রূপচাঁদ হেসে উত্তর দিয়েছে, এখন ওসব অলক্ষুণে কথা কেন? আগের জীবন তোমার ভুলে যাও জানকী! মন থেকে মুছে ফেলো সে-সব দুঃস্বপ্নের ঘটনা। স্বপ্ন, স্বপ্নই। স্বপ্ন ভেঙে গেলে, তার অস্তিত্ব কিছুই থাকে না। বর্তমানকে মেনে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। • তুমি এখন সুখী। অনেক, অনেক।

মনে মনেই হেসেছে জানকী।

মুখে কথা না ক'য়ে মনে মনেই ব'লেছে। নিজের মনের কানে নিজেকেই শুনিয়েছে স্রেফ। সুখ কাকে বলে, সুখী কাকে বলে, আজো তো ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারলো না। কোনটা সুখস্বপ্ন, কোনটা দুঃস্বপ্ন—তা-ও না।

হ্যাঁ, রূপচাঁদ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে খুব দুঃখ প্রকাশ ক'রেছে প্রথমে। সহানুভূতিতে ওর দু'চোখ ছলছল ক'রে উঠেছে। শুধু ছলছল ক'রে ওঠা নয়, টসটস ক'রে দু'গাল বেয়ে জলও ঝরেছে। পুরুষমানুষ যে এত কাঁদতে পারে, এই দেখলো জানকী। এর আগে দেখে নি। রাজকুমার সম্পূরণের বেলায়ও না।

সম্পূরণকে কি ভুলতে পেরেছে জানকী? পারবে কোনদিন?

না না না। জীবন গেলেও না। স্বপ্ন-স্বপ্ন ক'রে যতই বোঝাক রূপচাঁদ, তবুও না।

কতঘাটেই তো জানকীর জীবনতরী ভিড়লো, আবার ভেসেও গেল। কোনটা স্বপ্ন, কোনটা বাস্তব—যাচাই-বাছাই ক'রে উঠতে পেরেছে কই।

রূপচাঁদের সঙ্গে এতদিন একসঙ্গে থেকেও কি তাকে যথার্থ চিনতে পেরেছে, জানতে পেরেছে? রূপচাঁদ তার জীবনে দুঃস্বপ্ন, না সুস্বপ্ন—সেটা কি প্রকৃত বিচারের নিরিখে আনতে পেরেছে আজো? পারে নি, পারে নি।

হার মেনেছে। জীবনভর শুধু হার মানারই পালা তার।

আশ্চর্য ভাগ্যের লিখন। ঈশ্বরকে নির্দয়, নিয়তিকে নির্মম ব'লতে পারবে না জানকী। ঈশ্বর থাকুক না থাকুক। আর নিয়তি থাকুক না থাকুক। প্রচুর পেয়েছে, ব'লতে গেলে, সর্বদিক দিয়েই। লোকের চোখে মনোহারিণী রূপসী, শ্রোতাদের কানে মধুকণ্ঠী পাপিয়া। আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় হৃদয় কেড়ে নেয়া ত্রিভুবন জয়ী মেয়ে। তুলনা মেলা ভার। দ্বিতীয় জুড়ি নেই কোন। একবার দেখলে, বারে বারে দেখতে ইচ্ছে করে। একবার কথা কইলে বারে বারে কথা কইতে ইচ্ছে করে। একবার সঙ্গ করলে, বারে বারে সঙ্গ ক'রতে ইচ্ছে করে।

জানকীর মতো যে এহেন মেয়ে যে, কেমন ক'রে নিজেকে অনায়াসে রূপচাঁদের হাতে সঁপে দিলে, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। বসে বসে ভাববার বিষয়।

হ্যাঁ, রূপচাঁদের সত্যিকারের রূপ আছে বউ ছেলে-মেয়ের—সকলেরই চেয়ে চেয়ে দেখবার মতো। ওর অতি বড় শত্রুও খুঁত ধরতে পারবে না কো একটুকু! পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি—আপাদমস্তক—রূপের হাট বসানো। মিষ্টি-গম্ভীর গলা। গানের গলা আরো মধুর। কান জুড়িয়ে যায়, প্রাণ জুড়িয়ে যায়। একবার শুনলে, দ্বিতীয়বার না গাইয়ে ছাড়বে না কেউ।

ছাড়ে নি জানকীও।

বন্ধুর সঙ্গে জানকীর বৌবাজারের বাড়িতে গান শুনতে আসে রূপচাঁদ। জানকীর গান শুনে তারিফ ক'রেছে কত। বাহবা দিয়েছে থেকে থেকে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছে। ওর উর্দু গজলগানের একটা কলির সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে গলাও মিলিয়েছে। ···তুম ফুলোঁ বনকর রহে দুনিয়ামে, ম্যায় কাঁটে বনকর রহুঁ সাথো মে···।

খুশী জানকী। সাচ্চা সমজদার এতদিনে এসেছে একজন।

খুশী রূপচাঁদও।

গানপাগল রূপচাঁদ কত জায়গায় না ঘুরেছে। এমন দরদ দেয়া দরদীগলার গান শোনে নি কোথাও। বন্ধুর পিঠ চাপড়ে ব'লেছে, ঘরের কাছে এমন একজন গুণী, এতদিন আনিস নি কেন?

জানকীর অনুরোধে নিজেও গেয়েছে রূপচাঁদ সারেঙ্গী-তবলার সঙ্গে। জানকীরই বাজিয়েরা সঙ্গত ক'রেছে।

ঝাড়লণ্ঠন ঝোলানো আয়নাঘেরা ফরাস বিছানো তাকিয়া সাজানো ঘরখানা হ'য়ে উঠেছে মুহূর্তে মহেফিলখানা—জলসাঘর। এক গান দুবার তিনবার গেয়েছে। শুনে শুনেও শোনার সাধ মিটছে না জানকীর। শেষে জানকীর নিজের লেখা গানটাও গেয়েছে রূপচাঁদ। ···তুম ফুলোঁ বনকর রহে দুনিয়ামে, ম্যায় কাঁটে বনকর রহুঁ সাথোঁ মে···।

এরপর রূপচাঁদের নিয়মিত আসাযাওয়া চলেছে জানকীর বাড়িতে। রোজ। একদিনও বাদ নেই। প্রথমে বাঁধাধরা সময় ছিল গান-বাজনার, সেটার সীমানা ধসে পড়েছে পরে। রাত কাবারেও খেয়াল থাকে নি কারো। কখনো জানকী তান ধরে, কখনো রূপচাঁদ। গানে-গানে গানের মালা গেঁথে চলে দু'জনে। গানের সায়রে পাশাপাশি হাত ধরাধরি ক'রে যেন দু'জনে সাঁতার কেটে কেটে চলেছে।

বেশ কিছুদিন কেটেছে এইভাবে।

রূপচাঁদের রূপেগুণে মুগ্ধ জানকী। নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলেছে ওর সত্তার মধ্যে। ওর আনন্দে জানকীর আনন্দ, ওর হাসিতে জানকীর আনন্দ-উল্লাস। হাসির লহরী ছুটে বেড়ায় শিরায়-শিরায়—অঙ্গে-অঙ্গে। ও এসে উপস্থিত হ'লে, ঘুমন্ত প্রাণ বুঝি জেগে ওঠে তখুনি। সজীব সতেজ হ'য়ে ওঠে। চলে গেলে নিষ্ক্রিয়-নিঝঝুম নিস্তেজ-নীরব। ঘুমিয়ে পড়ে। নিজেই বুঝে উঠতে পারে না নিজের অবস্থা। জ্ঞানে না অজ্ঞানে রয়েছে সে।

এমন যখন অবস্থা, রূপচাঁদ বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে জানকীকে।

খানিকক্ষণ নিথরপাথর হ'য়ে, গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থেকেছে

জানকী। অপলক চোখে চেয়ে চেয়ে রয়েছে। সত্যি কি রূপচাঁদের মুখ থেকে শুনছে জানকী।

আবার শুনছে। আবার আবার আবার।

দীর্ঘদিন রাজস্থান ছাড়া জানকী।

কত পুরুষ এসেছে-গেছে—এ প্রস্তাব দেয় নি কেউ। এই একটি মাত্র পুরুষ, যে দিয়েছে, দিচ্ছে। আগে রাজস্থানে অবিশ্যি দিয়েছে আর একজন—সে সম্পূরণ। সম্পূরণের কথা মনে পড়লে ভেতরে মোচড় দিয়ে ওঠে বড্ড। অস্থির হ'য়ে পড়ছে জানকী। নিজেকে ঠিক রাখতে পারছে না। কাজল চোখের কানায়-কানায় জল ভরে উঠেছে।

ছ'হাতে জানকীর ডানহাতখানা চেপে ধরেছে রূপচাঁদ। বলেছে, তুমি কিছু ভেবো না। আমি তোমায় স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েই রাখবো। গানের স্বাধীনতা পুরোমাত্রায় বজায় থাকবে তোমার। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

একি শুনছে জানকী।

সম্পূরণের সমস্ত কথাই—হুবহু শুনছে রূপচাঁদের মুখে। সম্পুরণের মুখখানা ভেসে উঠছে রূপচাঁদের মুখে।

মত দাও জানকী! কাতর অনুরোধ রূপচাঁদের।

মাথাটা সামানর দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়েছে জানকী। রাজি। সোনালী জরির চুমকি বসানো ফিনফিনে পাতলা কালো ওড়নাটা সরে গেছে মাথা থেকে। খসে পড়েছে পিঠে—বিনুনি বাঁধা বেণীর ওপর।

বিয়ের পর প্রকৃত সুখী হ'তে পেরেছে জানকী?

পারলো কই! সোনার ঘড়ায় পারা ভরা রূপচাঁদ। কি নৃশংস মন। ভাবা যায় না। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে ভেতরটা ওর। দিনরাত জ্বালা। নিশ্বাসে প্রতিধ্বনি উঠছে কেবল, 'প্রতিশোধ, প্রতিশোধ'। রাতে ঘুমিয়েও স্বস্তি নেই। ঘুমের ঘোরেই দাঁতে দাঁত চেপে বলে যায়—'প্রতিশোধ, কোন ক্ষমা নয়, কোন দয়া নয়। প্রতিশোধ।'

রূপচাঁদ নিজের জীবনের কোন ঘটনাই গোপন করে নি জানকীর কাছে। কেন তার রক্তে নির্দয় পশু একটা হন্যে হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, তাও ব'লতে বাকি রাখে নি।

সব শুনে জানকী প্রতিশোধ নেয়ার পথ থেকে রূপচাঁদকে সরে আসতে অনুনয় বিনয় ক'রেছে।—এপথ এমত ঠিক নয়। একের অন্যায়ে অপরের সাজা হওয়াটা কোনরকমেই বাঞ্ছনীয় নয়। কোন মেয়ে বা কোন ছেলের দোষে গোটা সমাজের মেয়ে বা ছেলেরা দোষী হ'য়ে পড়ে না।

রূপচাঁদের ভুল ধারণার গতিরোধ ক'রতে নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে এগিয়েছে জানকী। ফল কি ফলেছে? অন্তত কিছুটা? না, একটুও না। যেখানে যেমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে রূপচাঁদ, ঠিক সেখানে তেমনভাবেই রয়েছে। একচুল সরে নি, নড়ে নি। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ জানকীর।

ভুল, ভুল! জানকী ভুল বুঝেছে, ভুল চিনেছে রূপচাঁদকে। রূপচাঁদের মুখে সম্পূরণের মুখ বসিয়েছে। কি আহম্মকিই না ক'রেছে। কোথা সম্পূরণ কোথা রূপচাঁদ। আশমান-জমিন ফারাক। মানুষ মনের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে চায় দূরে সরা জিনিসকে টেনে নিয়ে এসে। যখন সেটা পায় না, বা পাবার আশা আর থাকে না কোনপ্রকারে, তখন সেই রকমের কাছাকাছি দেখলে, ভুল ক'রে ভেবে নিলে, আঁকড়ে ধরে সেইটাকে। মনে করে পেয়েছি বুঝি আগেরকেই। হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া, আনন্দে বিভোর হ'য়ে যায়।

এ ঘোর কাটে এ মোহ ভাঙে, যখন প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটতে থাকে দিনেরাতে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে এক মনের সঙ্গে অন্য মনের! চাক্ষুষ-প্রমাণে প্রকৃত মনের পরিচয় পেয়ে সংঘাতের পর সংঘাত চলে ঘন ঘন। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে এমন এক চরম অবস্থায় এসে পৌঁছয় মানুষ, বেঁচে থাকার স্পৃহাটাও শুকোতে শুকোতে একদম শুকিয়ে যায় শেষে।

জানকীরও সেই দশা।

জানকী এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার বুঝে ফেলেছে।

এ মানুষ সম্পূরণ নয়। কখনো হ'তে পারে না। হবে না। দেবতার অসাধ্য রোগ এর। যদিও রূপচাঁদের ঘটনার সঙ্গে সম্পূরণের ঘটনার তফাৎ অনেক তবুও সে-যাত্রা অনেক প্রাণ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে জানকীর অনুরোধেই। জানকী বলেছে, কুমারসাহেব, যারা দোষ করলো, তারা তো পালালো। ওদের আত্মীয়-স্বজনদের কি অপরাধ! ওদের শেষ করে ফেলতে হুকুম দিও না তুমি! তোমার ধনরত্ন লুট ক'রে যারা তোমার লোকজনদের মেরেছে, তাদের ধরার চেষ্টা করতে হুকুম দাও কুমারসাহেব। সম্পূরণের হাত ধরে জলভরা চোখে ব'লেছে জানকী, আমার কথা রাখো! শত শত লোকের মঙ্গল কামনা, দীর্ঘজীবন কামনার অনেক মূল্য। অনেক অনেক।

গোলাপী ওড়নাটা জানকীর মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে সম্পূরণ ব'লেছে।—ঠিক বলেছো, তাই-ই হবে। মাথার ওড়নার কোণটা মুঠোয় পুরে থুপে থুপে জানকীর চোখের অঝোর ধারা মুছিয়ে দিয়েছে সম্পূরণ অতি সন্তর্পণে।

এই সম্পূরণ!

সম্পূরণ একটা স্বপ্নের মানুষ! পুরোমাত্রায়। অন্তত জানকীর তাই মনে হয়েছে ওকে দেখা মাত্র। প্রথম দেখা। সে এক বিচিত্র পরিবেশ, এক অজানা পরিস্থিতি।

উটের পিঠে চেপে লাগাম ধরে আসছে জয়শলমির দুর্গের দিকে জানকী। পাহাড়ঘেরা পাহাড়ের ওপর দুর্গ। কি-ই বা আছে এখন। রাজা জয়শালের স্মৃতি বয়ে চলেছে স্রেফ জীর্ণ কখানা হাড়পাঁজরা নিয়ে। সারি সারি ভাঙা-ভাঙা পাথরের থাম ক'টার ইতিহাসের সাক্ষীগোপালের ভূমিকা শুধু।

জল আনতে বাড়ি থেকে বেরোলেই এই দিকে মনটা বড্ড টানে। কেন কে জানে! আনমনে উটের মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে এই দিকেই চলে আসে।

একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখে দূর থেকে। কল্পনার রাজ্যে ভেসে যায় নিজে। ভাঙা থাম নতুন হ'য়ে গড়ে ওঠে। কত মজবুত কত সুন্দর।

আনন্দে বুক ভরে উঠছে জানকীর। একেবারে ভেতরে টইটম্বুর। দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসছে এক সুদর্শন রাজকুমার। পাজামা কামিজ পাগড়ি—সব একরঙা। আকাশ নীলে রাঙানো। মায় পায়ের নাগরা জুতোটাও ওই রঙের ভেলভেটের, জরি বসানো। কিন্তু রাজকুমারের মুখখানা দেখতে পাচ্ছে না স্পষ্ট। কেমন আবছা-আবছা। কুয়াশার কাঁচে চোখ রেখে দেখা যেন। দেখার জন্যে কি আকুলিবিকুলি কি কষ্ট!

এসব রোজের ব্যাপার। তবে কল্পনা হলেও, কল্পনা ভাবতে পারে না মোটে জানকী! কল্পনাকে মনেপ্রাণে সত্যি ভেবে নিতে ভালো লাগে। আর যা দেখে, তখনকার মতো যথার্থ-সত্যি ভেবে নেয়। একদিন সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল আচমকা।

উটের পিঠে গান গাইতে গাইতে আসছে জানকী।—'আজ একেলী জল ভরনে চলি রে, তু তো ছায়লা মাত্তা বোকে ঠাহরি রে···।

দূরের বাবলা-কাঁটা গাছের ঝোপঝাড়। বালি তেতে উঠছে। তফাতে-তফাতে মনে হ'চ্ছে জলের ঢেউ দুলছে বাতাসে। মরীচিকার প্রহসন। রোদে পোড়া চিকচিকে বালির ধাঁধা চোখে। ঘাগরা ওড়না-কুরতায় সর্বাঙ্গ মোড়া জানকীর। হলুদ ঘাগরায় নীল ওড়না জড়ানো। গোলাপী কুরতায় বেড় দিয়ে মাথা অবধি উঠে এসেছে। রুপোর ঝুমকো দুলছে দু'কানে। হাতে বালা, পায়ে মল—সবই রুপোর। লাল ভেলভেটে মোড়া জুতো পায়ে। সব মিলিয়ে ফর্সা ষোড়শী জানকীকে অপরূপা দেখাচ্ছে। একটা সত্যিকারের সুন্দরী মেয়ে। গানের গলাও মধুঢালা। বিধাতার অশেষ করুণা ওর ওপর।

অনেক পথ এগিয়ে এসেছে জানকী।

দূরের গাছগাছালি কাছে এসে গেছে।

জানকীর গান থেমে যাচ্ছে। কেমন হ'য়ে যাচ্ছে ও। ঘুম-ঘুম চোখে রাতভোরের ঘুম নামছে বুঝি। লুটিয়ে পড়ছে উটের পিঠে জানকী। ঘুমিয়ে পড়ছে। স্বপ্নের মতো জয়শলমিরের ভাঙা দুর্গের নতুন গড়ন দেখতে দেখতে। পুরনোকে নতুন দেখে ও কোন্ অতীতের

কার দৃষ্টি নিয়ে, কে জানে! ঘুমিয়ে পড়ল জানকী। দুর্গের কাছ বরাবর এলে জানকীর এমন হয়।

কিন্তু সম্পূরণের?

দুর্গের থাম ধরে দাঁড়ালে মনে হয়, এ দুর্গ কত জানা কত চেনা। খুব ভালো লাগে যেমন, খুব কষ্টও হয় তেমন। একেবারে শেষ হয়ে যেতে বসেছে যে দুর্গের শেষ চিহ্নটুকুও। জমাট ব্যথার নিশ্বাস ঝরে পড়ে বাতাসে সম্পূরণের।

প্রতিদিনই এই আসা-যাওয়া ভালো লাগা আর ব্যথা পাওয়া নিয়ম ক'রে চলেছে রাজবংশের কুমার সম্পূরণের জীবনে। এখানে বাবার সঙ্গে প্রথম আসে যখন, বছর কুড়ির তরতাজা তরুণ তখন। সেই আসা থেকে আসার নেশা পেয়ে বসেছে। প্রত্যেক দিন একবার ক'রে আসতেই হবে। সে যেকোন সময়েই হ'ক না কেন।

সম্পূরণ থাম ধরে দাঁড়াতেই চোখ পড়েছে জানকীর ওপর।

চমকে উঠেছে। মেয়েটা যে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। এখুনি উটের পিঠ থেকে না গড়িয়ে পড়ে যায় নিচে।

দুর্গ থেকে নেমে এসেছে তাড়াতাড়ি নিচে। লাফিয়ে উঠেছে ঘোড়ায়।

কাছে আসতে-আসতেই বালির ঝড় উঠে গেছে। এসেই, কাল-বিলম্ব না করে মাথার পাগড়িটা খুলে ফেলে আপাদমস্তক—মাথা থেকে পা অবধি ঢেকে দিয়েছে জানকীর। চারদিকের চারটে খুঁট শক্ত করে বেঁধেছে উটের দড়ির সঙ্গে।

উটটা জানকীকে নিয়েই ধীরে ধীরে বসে পড়েছে বালিজমির ওপর। নিজের মাথা গুঁজে দিয়েছে বালির মধ্যে। আত্মরক্ষার জন্যে মরুভূমির ঝড়ে ওরা এইরকমই ক'রে থাকে। সম্পূরণও শুয়ে পড়েছে বালির ওপর উপুড় হ'য়ে চোখ বন্ধ ক'রে।

একটু পরে থেমেছে ঝড়।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। প্রকৃতি শান্ত। সূর্যের আলো নিস্তেজ, নিবু নিবু। বিকেল-সন্ধে একসঙ্গে নামছে বুঝি।

স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে জানকী।

তুলে নিয়েছে পাগড়ির চাদর সম্পূরণ।

সম্পূরণকে অবাক চোখে দেখছে জানকী। যাকে রোজ দেখে সে, এ কি সে-ই। সে-ই।

একগাল হেসে সম্পূরণ বোলেছে, পিছুমে দেখো, আউর শোচো, ম্যাঁয় কৌন হুঁ। অভি তো বাতাও, কেঁও বেহুঁশ হো জা রহি থি?

মাথা নিচু ক'রেছে জানকী।

লজ্জারাঙা মুখে তার দেখার কথা জানিয়েছে। জেনেছে সম্পূরণ। নিজের আসার কারণ কিন্তু তখন জানায় নি জানকীকে। বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে গেছে।

প্রথম দেখার পর থেকেই জানকীর মনে হয়েছে, সম্পূরণ তার আপনের চেয়েও আপন।

দু'জনের দেখাসাক্ষাত হয়েছে এরপর থেকে প্রতিদিন। দুর্গের নিচে। এসেছে জানকী, এসেছে সম্পূরণ। ক্রমে গড়ে উঠেছে হৃদ্যতা। কোন কারণে একদিন না দেখা হ'লে অস্থিরতা বাড়ে একজনের। অন্যজনেরও যে না বাড়ে, তা নয়। বাড়ে—একদিনে মনে হয়, বহুদিন হয় নি দেখা। সে যে কি যাতনা, বলে বোঝানো যায় না। ভেতরের ছবিও দেখানো যায় না।

এইরকম যখন অবস্থা দু'জনের ঠিক সেই সময়েই নীরাজনা উৎসব শুরু হ'য়েছে রাজস্থানে। ভবানী মন্দিরের সামনে। দেবীর নবরাত্রি পুজোর পর বিজয়াদশমী—দশেরা।

রাজবংশের পাইক-বরকন্দাজরা নকল যুদ্ধ শুরু করেছে দেবীর স্থানে। রাজার দলরা জিতেছে। ওরা তো জিতবেই। ইচ্ছে ক'রেই অন্য দল হেরে যায়। এটা সকলের জানা কথা। পুরোহিত-পূজারী মশাই রাজপুতদের পাগড়িতে দেবীর আশীর্বাদী শমীপাতা গুঁজে গুঁজে দিচ্ছেন। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে জানকী।

প্রথমে পুরোহিত মশাই ওকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেছেন। তারপর কি মনে করে, দেবীর চরণে ছোঁয়ানো শমীপাতা জানকীর

বিনুনির ফাঁকে গুঁজে দিয়েছেন।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সম্পূরণ।

মাথা নিচু ক'রে এগিয়ে দিয়েছে। কোন ইতস্তত না ক'রে নিজের বিনুনি থেকে শমীপাতা টেনে নিয়ে সম্পূরণের পাগড়িতে গুঁজে দিয়েছে জানকীর। জানকীর হাত ধরে দেবীর সামনে ধর্মপত্নীর স্বীকৃতি দিয়েছে জানকীকে সম্পূরণ।

দেবীপ্রণাম পুরোহিত প্রণাম সেরে সম্পূরণ মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ঘোড়ার পিঠে চড়িয়েছে জানকীকে। নিজে উঠে বসে লাগাম ধরেছে।

ঘোড়া ছুটছে। ছুটছে ছুটছে ছুটছে…।

অন্দরে মহলে—রানীমহলে নিয়ে গিয়ে তুলবে সম্পূরণ জানকীকে। জানকীর স্বপ্ন দেখা সার্থক। স্বপ্নের মানুষকে আজ সত্যিসত্যিই পেয়েছে যে সে।

স্বপ্ন যে স্বপ্নই শুধু, বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই, এজ্ঞান হয় নি জানকীর। হয়েছে রানীমহলে আসবার পর থেকে। বাস্তবের ঈর্ষার গরম নিশ্বাসে সরস সতেজ মন-প্রাণ নিস্তেজ নীরস হ'য়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। হাঁপিয়ে উঠছে। রানীমহলে কি আগুনের হলকা।

সম্পূরণের প্রথম স্ত্রীর রূপ আগুনের মতো। আচার-ব্যবহারেও একেবারে গনগনে আগুন। কোনদিন সম্পূরণের স্ত্রীর মর্যাদা দেয় নি জানকীকে। কাছে গিয়ে দিদি ব'লে ডাকলে, কি লাঞ্ছনা কি কটুভাষা—শোনা যায় না। দু'কানে হাত চাপা দিয়ে চোখের জলে নাকের জলে হ'য়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে ঘর থেকে। ঘরে এসেও স্থির থাকতে পারে নি মোটে। অসহ্য যন্ত্রণা বুকের ভেতর। দমাদম হাতুড়ি পিটছে যেন কে। আর সেই সঙ্গে কানে বাজছে। লজ্জা করে না। হা ঘরের মেয়ে কোথাকার। জঙ্গলের কাঠ্‌কুড়ুনী হ'য়ে, রানীর বোন সাজতে বড় সখ। রক্ষিতার সাধ কম নয়। ছ্যা ছ্যা ছ্যা। ওয়াক, থু থু।

সব ভুলে যেতে চেষ্টা করেছে জানকী, প্রথম স্ত্রী শান্তাকুমারীর

ং'সনা, কিন্তু শত চেষ্টা করেও ভুলতে পারে নি 'রক্ষিতা' কথাটা। সম্পূরণকে বলেছে সজল চোখে, কুমার। শুধু শান্তাদি নয়, এবাড়ির সকলেই তো তাকে রাস্তার মেয়ে ভাবে। হ্যাঁ, রাস্তা থেকেই কুড়িয়ে এনেছে তাকে কুমারসাহেব, এটা যেমন ধ্রুবসত্যি, তেমনি স্ত্রীটাও মিথ্যে নয়। জানকী রাজারাজড়ার ঘরের মেয়ে নয় বটে, তা বলেও তুচ্ছ করার মতো নয়। সাধারণ ঘর হলেও বংশপরিচয় একটা আছে। প্রশংসাও আছে, সম্মানও আছে। রাজপুতের ঘর না হক রাজ কুল। পুরোহিতের ঘর তো বটে। কুমারসাহেবের শান্তির ঘরে অশান্তির আগুন জ্বালাতে চায় না জানকী। তার মেয়ে বরং মনে কোন ক্ষোভ দুঃখ না রেখে জানকীকে রাজমহল থেকে বিদেয় দিক কুমারসাহেব।

পায়ের তলা থেকে হাত ধরে টেনে তুলে পাশে বসিয়েছে জানকীকে সম্পূরণ।—না, আমাকে ছেড়ে একপাও কোথাও যাওয়া চলবে না। দৃঢ়স্বর সম্পূরণের। আমি আগে—

বাকি কথাটা বলতে দেয় নি জানকী। সম্পূরণের মুখে হাত চাপা দিয়েছে। তার আগে আমি যেন—

এবারে সম্পূরণ হাত চাপা দিয়েছে জানকীর মুখে। ব'লেছে, কোন কথা আর বলতে দোব না তোমাকে আমি। মেওয়ালালকে ব্যবস্থা তো করে দিয়েছি। কেবল গান। তোমার মুখ থেকে নতুন-নতুন গান শুনতে চাই। আর কিছু না। আর কিছু না।

স্থানান্তর ঘটেছে জানকীর।

রানীমহল থেকে হাওয়ামহলে। অবিশ্যি সম্পূরণের নির্দেশেই। গানের আসর জমবে ভালো। রেওয়াজের-গলা সাধার দারুণ সুযোগ-সুবিধে।

গানের সাগরে ডুবেছে জানকী!

দুঃখে-সুখে শোকে তাপে—সবেতেই ছোটবেলা থেকে গান তার সঙ্গী। সেই গানকে কাছে পেয়ে স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি পেয়ে গেছে যেন।

সম্পূরণ খুশী খুব।

গান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায়। দুনিয়া ভুলে যায়। সুর-

কথার ধাপে ধাপে কত উঁচুতে উঠে যায় কে জানে। আকাশের কাছাকাছি কি? হবে বা। পূর্ণিমার চাঁদের মধ্যে দেখে কে যেন ব'সে আছে। জানকী কি? হ্যাঁ জানকীই তো। দেখে দমকা হাওয়ায় কোথা থেকে উড়ে আসছে একটু করে কালো মেঘ। ঝপাং করে আছড়ে পড়েছে চাঁদের বুকে। জানকীর কপালের ওপর। চমকে উঠেছে সম্পূরণ। ছুটে গেছে তন্দ্রার ঘোর। চেয়ে চেয়ে দেখেছে জানকীর দিকে।

অমন করে কি এতো দেখছো আমাকে?

কিছু না। দেখছি নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক মুখ কত সুন্দর হ'তে পারে।

বাইজি নাম প্রচার হবার পরেও?

হ্যাঁ, জানকী বাইজি নয়। জানকী মীরাবাঈ। ওদের চোখ থাকলে দেখতে পেত! মন থাকলে বুঝতে পারতো।

চোখ আছে কি না আছে, জানে না জানকী। জানকীর মুখ দর্শন করতে কেউই আসে নি হাওয়ামহলে। আসার নামগন্ধও নেই কারো। সত্যিকারের মত আছে কি না, তাও বোঝে না। কমলেশ কোলে আসবার পরও কেউ, আনন্দবার্তা পাঠানো তো দূরের কথা, দেখতেও আসে নি একবারের জন্যে। শান্তাকুমারী নিজের ছেলেকেও—ব্রজেশকে আটকেছে। ব্রজেশ ছেলেমানুষ, সবে বারো। ছোট মা জানকীর কাছে আসার জন্যে পাগল। জানকীই কি কম স্নেহ করে ওকে! বলে, ওই তো আমার বড় ছেলে। কমলেশকে দেখার জন্যে ব্রজেশকে জানকী ডেকে পাঠিয়েছে। ফল উল্টো হ'য়েছে। শুনতে হ'য়েছে শান্তাকুমারীর বিষোদ্গার। কার ছেলে কে জানে! সতীপনা ফলাবার জন্যে কি ঢাক পিটিয়ে সকলকে নেমন্তন্ন পাঠানো। ডাইনী ডাইনী। সম্পূরণকে তো একদম বোকা ভেড়া বনিয়ে রেখেছে। দিনরাত হাওয়ামহলে। একবারও আসতে দেয় রানীমহলে? আহা-হা-হা-হা। কত দরদ। ব্রজেশ মরল কি বাঁচলো—সে খবর-টুকুও রাখে না কুমারসাহেব। বংশের কুলতিলক, সমস্ত বিষয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী যে, তার এই দশা। নচ্ছার জানকীর

জন্যেই তো এই মন হ'য়ে গেছে সম্পূরণের।

জানকী কুমারসাহেবকে অনুরোধ ক'রেছে কত, অন্তত আমার দোষখণ্ডন করবার জন্যে ওখানে যাও একটিবার। দোহাই তোমার।

না, কিছুতেই না। ওদের ভুল যতক্ষণ না ভাঙছে, সম্পূরণ সে বান্দাই নয় যে, ও ভিটেয় পা বাড়াবে।

জানকী চেয়েছে ওবাড়ির সঙ্গে সম্পূরণের মিল করাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারে নি। অনুনয় বিনয় কান্না—সমস্তই বিফল হয়ে গেছে। ব্যর্থ ব্যর্থ। পূর্ণমাত্রায় যাকে ব্যর্থ বলে, তাই।

ক্ষণ দিন মাস ঋতু বছর অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে না কারো কখনো। এমন কি বয়েসও। কিন্তু অনেক মনের ভাবভাবনা বুঝি একই থেকে যায় যুগ যুগ ধরে। পরিবর্তনের পথে পা বাড়ায় না। বাড়াতে জানে না মোটে। আর তাছাড়া চায় নাও বোধ হয়। এক এক ক'রে দশ দশটি বছর কেটেছে, ওবাড়ি ওবাড়িতেই দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আগেরেই মতো হিংসায়-ঈর্ষায় জর্জর হয়ে। মরণবিষ বুকে ভরে নিয়ে। অপেক্ষা—স্রেফ অপেক্ষা। শুধু সুযোগ। সুযোগ কোন পেলেই, প্রাণঘাতী ছোবলে ছোবলে শেষ করে ফেলবে এ বাড়িকে।

তবু মনে মনে শুভবুদ্ধির কামনা করে ওবাড়ির জানকী।

কমলেশ দশে পড়েছে, ব্রজেশ বাইশে। ব্রজেশকে দেখতে ইচ্ছে করে বড্ড। কিন্তু উপায় নেই।

জানকীর দেখবার প্রবল ইচ্ছেই কি তার সর্বনাশের মূল হ'ল। এটা চায় নি জানকী। এ পরিস্থিতি তার জীবনে আসুক চায় নি। চায় নি চায় নি চায় নি। না চাইলেই বা ছাড়বে কে তাকে। মহাকালের রায় নেমে এলো এ বাড়িতে মর্মান্তিকভাবে। নির্দয় নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

এসেছে ব্রজেশ। কিন্তু হাসিমুখে নয়।

দেখেছে জানকী ওকে, কিন্তু খুশির দৃষ্টি দিয়ে নয়। ছেলেকে মায়ের বুকভরা স্নেহ-আদর নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে নি কাছে। এতদিনের সযত্নের সঞ্চয় উজাড় করে দিতে পারে নি। সে-সময়

এ-সময় নয়। শুধু জল ওপচানো জলভরা ঝাপসা চোখে দেখেছে কেবল।

হোলির আহেরিয়া উৎসবে গেছে ঘোড়া চেপে শিকারে সম্পূরণ বাসন্তী সাজে সেজেগুজে। পাজামা-মির্জাই পাগড়ি অবধি বাসন্তী রঙে ছোপানো। ভারী সুন্দর দেখিয়েছে সুন্দর চেহারায়। জানকী ঘোড়ায় ওঠার সময় প্রতিবারের মতো বিদায় জানাতে এসে, হাসিমুখে পারে নি। ভেতরটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে, মনে হয়েছে। পালিয়ে এসেছে ঘরে তাড়াতাড়ি!

আছড়ে পড়েছে বিছানায়। এত কান্না যে কোথা ছিল কে জানে!

সন্ধেয় ফেরার সময় ফিরেছে সম্পূরণ। কিন্তু সুস্থ-স্বাভাবিক নয় বেহুঁশ। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেছে। পুরনো প্রিয় ঘোড়া দক্ষ সওয়ার। কিন্তু তবু এমন হ'ল! সাংঘাতিক আঘাত। জ্ঞান আর ফেরে নি সম্পূরণের।

সম্পূরণের এই ব্যাপার নিয়ে ওবাড়ির আসা-যাওয়া শুরু হ'ল এ বাড়িতে। ব্রজেশ তো আসছেই। জানকীকে সান্ত্বনা দিতে কসুর করে না। যতদিন ব্রজেশের দেহে প্রাণ থাকবে, ছোটমার কোন কষ্টই সহ্য করবে না সে। কমলেশ তো তার নিজের ভাই। ওর দায়িত্ব তার। শান্তাকুমারীও আসে মাঝে মাঝে। বলে, ছোট! বোন তোমার বড়দি বেঁচে আছে জেনো। কিচ্ছু ভাবনা নেই তোমার কমলেশ তোমার একার নয় বোন। ও আমার ছোটছেলে, ব্রজেশের ভাই।

মুখে কোন কথা সরে না জানকীর।

একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে কেবল। ভাবে, সেই সব হ'ল, কিন্তু বড় দেরীতে। একটু আগে হ'লে, মানুষটা কত সুখী হত। কত শান্তি পেত। মনে করলেই যে সব কিছু হবে, এ পৃথিবীর সে-নিয়ম বোধ হয় নয়। অন্য ছকে বাঁধা, যা চাওয়া, তা পাওয়ার ঠিক বিধান নেই হয়তো কারো কারো বেলায়। যেমন জানকীর। বুকচাপা জমাট

ব্যথার নিশ্বাস ঝরে পড়ে জানকীর। এ ছাড়া আর কি-ই বা সম্বল আছে তার জীবনে।

নিজেকে সামলে রাখতে পারে না আর।

চোখের জলের ধারা নামে দু'চোখ বেয়ে।

সাদা সিল্কের ওড়নার কোণ দিয়ে আস্তে আস্তে মুছিয়ে দেয় শান্তাকুমারী।—আহা-রে!

শোনা যায় একবার যদি কারো অদৃষ্ট পুড়তে শুরু করে, তাহ'লে নাকি পুড়তেই থাকে। নেভে না সহজে। নেভানো যায়ও না নাকি সহজে। তাই হয়েছে জানকীর। কপাল পুড়েছে বলেই না তার স্বপ্নের মানুষ সম্পূরণ চলে গেছে। এবার কমলেশকে নিয়ে মহাভাবনা। কে জানে জানকীর পোড়া ভাগ্যে আরো কত কি আছে। জানকীর নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ। চিন্তায়-চিন্তায় আধমরা।

শান্তাকুমারী সান্ত্বনা দেয়।—বোন! যাতে কমলেশের জীবনহানি যোগটা কাটে, সে ব্যবস্থা তো চলছে। তুমি ভেবে ভেবে মরে যাবে যে, শেষে।

দিদি! আমার মরণটা আরো আগে হলেই তো ভালো ছিল। তাহ'লে এসব দেখতে হত না, এসব শুনতে হ'ত না!

শান্তাকুমারীর বাপের বাড়ির খুবই কাছের মানুষ সাধু যোগিয়া বাবা। বাড়িতে আসতে কমলেশকে দেখিয়েছে শান্তাকুমারী। আশীর্বাদ করতে বলেছে।. আশীর্বাদ করা দূরে থাক। বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলেছে যোগিয়া বাবা, এ ছেলের মৃত্যুযোগ আসছে শীগগির।

যোগিয়াবাবা তো কমলেশের কপাল দেখে ভবিষ্যৎ বলে গেল, কিন্তু কমলেশের ভবিষ্যৎ আরম্ভ হয়ে গেল তখন থেকে। ও সর্বত্রই কার যেন ক্রুদ্ধ চোখ দেখছে। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে চিৎকার করে উঠছে ভয়ে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। কেবলি ভুল বকছে কে যেন ডাকছে।

শান্তাকুমারী অস্থির হ'য়ে যোগিয়াবাবাকে আনিয়েছে। সম্পূরণের নজর পড়েছে নিশ্চয় ছেলেটার ওপর। বড্ড ভালোবাসতো যে। যোগিয়াবাবা এসে, কমলেশকে সামনে বসিয়ে যাগযজ্ঞ ক'রেছে।

কমলেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে আগের মতো। সকলের মুখে হাসি ফুটেছে। যোগিয়াবাবার কি অসাধারণ ক্ষমতা। সাক্ষাত শিবলোকের শিব একেবারে।

যোগিয়াবাবার প্রশংসায় ভাগীদার হয়ে হাসতে-হাসতে এ মহল থেকে ও মহল অবধি বুক বাজিয়ে বাজিয়ে বলে বেড়িয়েছে, সে থাকতে কারো সাধ্যি নেই যে, একগাছা কেশ স্পর্শ করে কমলেশের। স্বয়ং ধর্মরাজেরও নয়। হুঁ-হুঁ বাবা! এ রানী শান্তাকুমারী।

যোগিয়াবাবার ক্রিয়াকলাপে কমলেশ সুস্থ হ'য়ে উঠল ঠিক, কিন্তু সেটা সাময়িক। দিন পনেরোর জন্যে। আবার আগের ব্যামো এসে উপস্থিত। আবার শান্তাকুমারীর অনুরোধে যোগিয়াবাবার আগমন, ক্রিয়াকলাপ। কমলেশ সুস্থ।

কিন্তু একটা আশ্চর্যের বিষয়, কমলেশ সুস্থ হয়ে উঠলেও সুস্থ থাকছে না বরাবরের মতো। ভালো, আবার অসুস্থ। আবার ভালো, আবার অসুস্থ। দিন দিন ক্ষীণ হ'য়ে যাচ্ছে। শয্যাগত। শেষে যোগিয়াবাবাকে বাড়িতে থাকতেই অনুরোধ করেছে শান্তাকুমারী। যোগিয়াবাবা কমলেশের কাছে যতক্ষণ বসে থাকে কমলেশ বেশ সুস্থ বেশ হাসিখুশি। সরে এলেই, যত বিপত্তি। অসুস্থ হয়ে পড়ে।

শেষমেশ যোগিয়াবাবাও ধরে রাখতে পারে নি এভাবে। যোগিয়াবাবা কমলেশের ক্রিয়াকলাপের জন্যে শ্মশানে মাটি আনতে গেছে। ঠিক সেই অবসরে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেছে কমলেশ। সামনে বসে বসে দেখেছে চুপচাপ জানকী। চোখে জল ঝরেনি। ছেলের বুকের ওপর আছড়েও পড়ে নি। নিথর-পাথর।

যে বাঁচবে না। বাঁচাতে আসে নি পৃথিবীতে, তাকে নিজের পরমায়ু দিয়ে দিয়ে আর কত রাখা যায়। যথেষ্ট আত্মত্যাগ করেছে কমলেশের জন্যে যোগিয়াবাবা। যে কদিন ছিল, যোগিয়াবাবার ক্রিয়াকলাপের ফলে। আর তা ছাড়া কমলেশ শাপভ্রষ্ট। পূর্বজন্মের কর্মফল শেষ করতে এসেছিল। যোগিয়াবাবার একথাটার সঙ্গে নিজের কথা যোগ ক'রে দিয়ে শান্তাকুমারী শোক লাঘব করতে চেয়েছে

জানকীর, জানকীর মা-বাবার।

জানকী দু'দুটো শোক পেল পর পর। ওকি আর ওতে আছে! কথায় বলে, অল্প শোকে কাতর, আর বেশী শোকে পাথর। দিনকতক বাপের বাড়ি না হয় ঘুরে আসুক। একটু স্বাভাবিক হ'ক। বিপদে-আপদে শোকে দুঃখে মা-বাবাকেই কাছে পেতে চায় অন্তত অনেক মেয়েই।

জানকীকে বাপ-মার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে শান্তাকুমারী চোখের জল ফেলতে ফেলতে।

সত্যি সত্যিই কি মানুষের মনের পরিবর্তন হয়? হ'লেও আবার কি আগের অবস্থায় নেমে যেতে পারে? না, দয়া-মমতা-সহানুভূতির খোলসে ঢাকা আগের নৃশংসটাই পুরোপুরি থেকে যায়, সময় বিশেষে খোলস ছেড়ে ফণা তুলে বেরিয়ে আসে?

এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হ'তে হয়েছে জানকীকে। যখন বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে।

গেটের দরোয়ান ভেতরে ঢুকতে দেয় নি।

মালকিন শান্তাকুমারীর মানা আছে। মানা আছে রাজকুমার ব্রজেশ সাহেবের।

চোখের জলে রাস্তা ঝাপসা হ'য়ে এসেছে। ফিরে এসেছে জানকী কোন বাদপ্রতিবাদ না করে। বেশী ক'রে মনে পড়েছে সম্পূরণের কথা, কমলেশের কথা। ওরা বুঝি এই মুহূর্তে সত্যিই জানকীকে পৃথিবীতে একা রেখে চলে গেল।···

আবার বাপের বাড়ি।

চুপচাপই বসে থাকে দিনরাত জানকী। ওস্তাদ মেওয়ালাল আসে রোজ। সঙ্গীতপ্রিয় জানকীকে সঙ্গীতের রাজ্যে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে প্রাণপণে। জানকীর মনকে ঘোরাবার জন্যে, সুস্থ-স্বাভাবিক ক'রে তোলার জন্যে। মেওয়ালালের খালি চিন্তা, জানকী মরে গেলে, একটা সঙ্গীত প্রতিভারই মৃত্যু হ'য়ে যাবে। যে প্রতিভার শূন্য আসন অন্য কেউ পূর্ণ করতে পারবে না সহজে। ঈশ্বরদত্ত গলা, গলার কাজ

দরদ মেজাজ—সব মিলিয়ে ও নিজেই সঙ্গীতপ্রতিমা একখানা। এ জিনিস সাধনায়ও অনেকের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় কি না সন্দেহ। ও শোক-দুঃখ আঘাত কার না হয়। মানুষের রূপ ধরে দেবতারা এসেছে, তাদেরও তো হয়েছে। রেহাই পেয়েছে কি কেউ ?

রামচন্দ্র সীতা শ্রীকৃষ্ণ, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ সহায় থেকেও পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীও। সাধুসন্তদেরও মৃত্যু হয়, হয়েছে। জীবনের সব ঘটনাই স্বপ্ন। স্বপ্ন ভেঙে গেলে যেমন কিছু পাওয়া যায় না, তেমনি অতীত, অতীতই। ফিরে আসে না। যারা যায়, তারা ফিরে আসে না, আসে নি কেউ—কারো। যারা থাকে, তাদের পাগল হ'লে চলবে না, চলে না।

অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মেওয়ালালই জানকীর মৃতপ্রাণে গানের মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢেলেছে আবার। গানের রাজ্যে ডুবে গেছে জানকী। মাঝে মাঝে মেওয়ালালকে বলে কেবল, গুরুজী। প্রিয় মানুষের নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে বেড়ায় কেমন মানুষ। মরে গেলে নাকি প্রেতাত্মা লোকের অনিষ্ট করে। কারণ, তার শরীরকে জ্বালিয়ে দেয়ার রাগে। দিদির একথা মোটে ভালো লাগে নি। কানে আজো খচখচ ক'রে বাজে। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, দিক, একটুও দুঃখ নেই, কিন্তু কমলেশের ওপর সম্পূরণের নজর পড়েছে ভালোবাসার দরুণ, এমন হৃদয়হীন কথা ভুলতে পারছে কই! এখানে থাকতে পারবেও না বুঝি। কোথায় যায়, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না। গুরুজী, যে কোন জায়গায় নিয়ে যাক তাকে যত শীগগির পারুক। সে আর নিজের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারছে না। পারছে না—

জানকীকে কলকাতায় বৌবাজারে এনে তুলেছে মেওয়ালাল।

জানকী পুরোমাত্রায় গাইয়ে হ'য়ে উঠেছে। বড় গাইয়ে। চতুর্দিকে নাম ছড়াতে শুরু করেছে। বেশীদিন লাগে নি, অল্প কিছুদিনের মধ্যে তার গানের আসর জমজমাট। গুণমুগ্ধ শ্রোতার দল বাড়ছে দিনকে দিন। এখানে-ওখানে গানের তারিফ গানের বাহবা জানকীর। কানে কানে মুখে মুখে প্রশংসা আর প্রশংসা।

জানকীর গৌরবে মেওয়ালালের মহাগৌরব।

একটা জলজ্যান্ত প্রতিভাকে সে জাগিয়ে তুলতে পেরেছে।

দিবারাত্র সঙ্গীত সাগরে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে জানকী।

গানপাগল জানকী যখন সঙ্গীত রসিকদের সঙ্গীতপাগল ক'রে তুলছে, ঠিক সেই সময় তার গানের রমরমা আসরে উপস্থিত হয়েছে রূপচাঁদ। হ'য়েছে, প্রতিরাতের নিয়মিত শ্রোতা। রূপচাঁদ গান শোনে আর দেখে জানকীকে। সারা শরীরটা সম্মোহনী শক্তিতে গড়া জানকীর। আবার ব্যবহার যত্নআত্তি কথাবার্তা গানবাজনা—সবেতেই একটা অদ্ভুত আকর্ষণীশক্তি। যে শক্তি মানুষের মন-প্রাণ-বুদ্ধি-বিবেচনাকে নিমেষে কাছে টেনে নিতে পারে। টেনে নেয় নিজের মুঠোয়। এরকম মেয়েই খুঁজেছে এতদিন, পায় নি। বিধাতা সুপ্রসন্ন বুঝি এবার।

বিয়ের প্রস্তাব দিতে, মেওয়ালাল সাবধান করে দিয়েছে জানকীকে—শিল্পী জগতের শিল্প। একা কারো না সে, অথচ সবাই জানবে, সে সবার। এটাই মহৎশিল্প অমরশিল্প। শিল্পের মৃত্যু ঘটাতে যেও না জানকী। যেও না, যেও না!

শোনে নি মেওয়ালালের কথা জানকী।

রূপচাঁদ সঙ্গীত শিল্পী। শিল্পের মানুষ সে। শিল্পেগড়া মন। তা ছাড়া সহানুভূতিতে ভরা তার ভেতর। জানকীর জীবন শুনে, চোখের জল চেপে রাখতে পেরেছে ও কই। পরোপকার করেই বেড়াচ্ছে দিনরাত। লোকের রোগ-ব্যাধি ভালো করে তোলার জন্যেই তো ওর কত কষ্ট করে গুরু খুঁজে খুঁজে কত সাধনা করে সম্মোহন বিদ্যা শেখা। আজ কত নাম ডাক ওর। বাড়িতে ভিড়ে ভিড়। একবার কারো দিকে ফিরে তাকালে একটু স্পর্শ করলে লোকে নিজেকে মহাভাগ্যবান মনে করে, ধন্য মনে করে। রোগমুক্ত মনে করে। রুগীদের চোখে ও আধিব্যাধি নাশের দেবতা স্বর্গের অশ্বিনীকুমার। এ মানুষ চেয়েছে তার কাজে সাহায্য করুক জানকী লোকের মঙ্গলের জন্যে। এ বিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়।

শিল্পের সঙ্গে শিল্পের। সৎ কাজের ইচ্ছের সঙ্গে সৎ কাজের ইচ্ছের। জানকীর গান বাজনার সাধনা আসর যেমন চলছে, তেমনিই চলবে। বন্ধ হবে না কখনো।

শিল্পীকে শিল্পকে দরদীমনকে ফিরিয়ে দিতে পারে না জানকী। পারে না অপমান ক'রে ত্যাগ করতে। তার সম্পূরণকেই বেঁচে উঠতে দেখছে যেন সে রূপচাঁদের মধ্যে। মুখে চোখে চেহারায়। মত দিয়েছে জানকী রূপচাঁদকে। রাজি।

বিয়ের লগ্নক্ষণ রূপচাঁদের গুরুদেব দিব্যরাজজী স্থির করলেন। ওঁর আশ্রমেই শুভপরিণয় সম্পন্ন হ'ল। ওঁরই সামনে। উনি উপদেশ দিয়েছেন রূপচাঁদকে। জানকীমাকে সুখী ক'রো। তোমার মায়ের মতো অশান্তি যেন না পায়।

জানকী চমকে উঠে মুখ তুলে তাকিয়েছে দিব্যরাজজীর দিকে। প্রণাম করতে করতে এ কি বিপত্তি। আশীর্বাদবাণী শোনবার বদলে কেমন যেন বেসুরো সুর একটা শুনলো ওঁর কণ্ঠে।

দিব্যরাজজী বলছেন আমি তোমাদের দু'জনেরই বাবা। আমার ঠিকপথ শান্তির পথ দেখিয়ে দেয়া বিশেষ কর্তব্য। নেয়া না নেয়া নির্ভর করছে স্রেফ তোমাদের ওপর।

খুব চঞ্চল হ'য়ে পড়েছে রূপচাঁদ।

দেখে মৃদু হাসলেন দিব্যরাজজী।

হ্যাঁ, সবাই দোষী হয়েই জন্মায় না। পরিবেশ-পরিস্থিতি গড়ে তোলে কাউকে। বিদ্রোহী ক'রে তোলে। তবে একজনের দোষে অন্যে না বলি হয়। রূপচাঁদ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে খাক হয় গেছে। মায়ের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠেছে। বেঁচে থাকতে ওর বাবা মাকে কোনদিন সুখী করে নি। অত্যাচার অত্যাচার অত্যাচার। সর্বস্ব খুইয়ে রাস্তায় বসিয়ে গেছে। বাইজিপাড়াই তার ঘরবাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষনিশ্বাসও ফেলেছে ওখানেই।

দুঃখকষ্টে মানুষ রূপচাঁদ দুঃখিনী মায়ের কাছে। ছোটবেলা থেকেই

মন বিষিয়ে গেছে পুরুষ মানুষের ওপর। এরা বড় নির্দয়। আর বাইজিদের ওপরও। এরা লোকের ঘরসংসার ভাসিয়ে দেয় নিজেদের সুখবিলাসের জন্যে। এদের কাউকে ক্ষমা নয়। এমন বিদ্যে শিখবে, যে-বিদ্যেয় এদের মুঠোয় পোরা সহজ।

দিব্যরাজজী বারণ করেছেন, বারণ করেছে মা-ও। একের অপরাধে অন্যের সাজা হওয়া উচিত নয়। একটা পুরুষ একটা নারী কি করেছে, তার জন্যে সব পুরুষ সব নারী দায়ী নয়।

শোনেনি রূপচাঁদ কারো কথা।

প্রতিহিংসার আগুন তার মাথায়-বুকে দাউদাউ ক'রে জ্বলছে। কাউকে জ্বালাতে না পারলে, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। যাযাবরী বুড়ির খোঁজে হন্যে হ'য়ে ঘুরেছে চতুর্দিকে। বুড়ির সম্মোহনবিদ্যে হারায় মানায় সকলকে।

বুড়িকে খুঁজে পেয়ে পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়েছে।

রূপচাঁদের করুণ ব্যথার কথা শুনে যাযাবরী বুড়ি সদয়। নিজের বিদ্যের উত্তরাধিকারী ক'রে রেখে যাবার জন্যে প্রাণখুলে উজাড় ক'রে শিখিয়েছে রূপচাঁদকে।

রূপচাঁদ তার সম্মোহনবিদ্যেয় লোককে সুস্থ ক'রে তোলে যেমন সত্যি, তেমনি এটাও সত্যি যে, অসুস্থও ক'রে তোলে আবার। রূপ-চাঁদের পায়ে টাকা ঢালতে ঢালতে রোগ-রুগী—দুই-ই শেষ হ'য়ে যায় একদিন। এটা উচিত নয়। এটায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় বটে রূপচাঁদ, কিন্তু প্রকৃত শান্তি-আনন্দ নেই এতে একদম। এটা অন্যায়ের পথ। মহাঅন্যায়ের।

জানকীকে আদেশ করেছেন দিব্যরাজজী, এপথ থেকে তুমিই এক-মাত্র ফেরাতে পারবে ওকে। নিশ্চয় চেষ্টা করবে।

চড়াইয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ ধসের মুখে পড়ে গেছে যেন জানকী। হতভম্ব-হতবাক। পায়ের তলায় মাটি আছে কি? নেই বুঝি। শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি।

মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন দিব্যরাজজী। মা, ও বড়

হতভাগা। কেউ নেই দেখার। মা-টাও চলে গেছে। তোমার শান্তি-মূর্তি ওকে শান্ত করবে। তোমাকে দেখে আমার সে বিশ্বাস এসেছে। পারে যদি কেউ, একমাত্র তুমিই পারবে। তুমিই পারবে। দেখো মা, বুড়োবাবার কথা মনে রেখো।

বিয়ের পর একরকম বোবাকালাই হ'য়ে গেছে জানকী। গানবাজনা সব বন্ধ। মনে হয় রূপচাঁদকে ছেড়ে যেখানে দু'চোখ যায়, চলে যায়। কানে বাজে দিব্যরাজজীর বাণী অমনি।—তুমিই পারবে। বুড়ো···মনে রেখো।···সে বিশ্বাস···

পা বাড়াতে গিয়েও থেমে যায়। ফিরে আসে ঘরের ভেতর জানকী। জানকীকে বিনয় ক'রে বলেছে রূপচাঁদ। জানকী। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ঘরে আনি নি তোমায়। তোমার মধ্যে আমার মায়ের চোখ দেখি। তোমার চুপচাপে মৌন-শাসন দেখি। তুমি ছেড়ে যেওনা। আমাকে বাঁচাও।

সম্মোহনে মানুষের মন ঘোরানোর ক্রিয়াকলাপ শিখিয়েছে জানকীকে রূপচাঁদ ভালো ক'রে নিখুঁতভাবে।

ক্রিয়াকলাপে মন ঘোরাবার প্রয়াস চালিয়ে যায় জানকী, তবু মানুষটার প্রতিহিংসার আগুন নেভে কই। ওর মাথায় একটা দৈত্য ভর করে বুঝি। ও নিজের ইচ্ছে শক্তিকে আরো প্রবল ক'রে তোলে। দ্বিগুণ চতুর্গুণ। সব ভেস্তে যায় জানকীর। জানকীর বুকের বাঁ পাশটায় একটা যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। বড্ড নিস্তেজ-দুর্বল হ'য়ে পড়ে।

বলেছে রূপচাঁদকে, ভালো মারবার কল করেছো আমাকে। আমিও চাই আমার মুক্তি হ'ক। তা যে ভাবেই হয়, হ'ক।

না না না! ও কথা মুখে এনো না। আমি নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারি না জানকী। চেষ্টা করেও না। বিশ্বাস কর।

পারবে। আমি চলে গেলে।

কখন মানুষের মুখ দিয়ে কি কথা যে বেরিয়ে যায় নিজের অগোচরে, তখন বুঝে উঠতে না পারলেও, পরে অকস্মাৎ ফলে গেলে মানুষের বৃথা হা-হুতাশ আর 'হায় হায়' করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। জেনে-

শুনেও এমন হবে জানি না।

নীলাঞ্জনকে নিয়ে এসেছে তার মা।

মাঝে মাঝে খুব ভোগে। শরীর সেরেও সারে না। একমাত্র ছেলে। বংশের শিবরাত্রির সলতে। ওকে রোগমুক্ত ক'রে তুলতেই হবে। পায়ে প্রণামীর দিকে ভালো ক'রে দেখেছে রূপচাঁদ। প্রথম প্রণামীতেই এত। লোভে চকচক ক'রে উঠেছে দু'চোখ।

নীলাঞ্জনকে দেখার পর থেকে খুব আনমনা হ'য়ে পড়ছে জানকী। থেকে থেকে মনটা অস্থির হ'য়ে পড়ে। চোখের সামনে তার কমলেশকে ঘোরাফেরা করতে দেখে যেন।

নীলাঞ্জনেরও কমলেশের মতো ব্যাধি শুরু হয়ে গেল রূপচাঁদের কাছে আসবার পর থেকে। রূপচাঁদের কাছে এলেই ভালো। ভালো কিছুদিন। তারপর যে-কে সেই।

খট্‌কা লেগেছে জানকীর!

রূপচাঁদের স্বভাব জানে। ঠেলে দিয়ে ধরে টানা। ভালো করে আবার খারাপ করা পয়সার লোভে। তাহ'লে কমলেশকেও কি সেই যোগিয়াবাবার সম্মোহন ক্রিয়ার ভালো-খারাপের প্রভাব পড়ে পড়ে, চলে যেতে হয়েছে শেষে! এখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই জানকীর।

হাপুসনয়নে কেঁদে সারা হয়েছে জানকী একা ঘরে।

ঈশ্বর! তোমার কি নিষ্ঠুর রসিকতা। কেন এখানে নিয়ে এলে! কেন রূপচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলে? কমলেশের গোপন মৃত্যুরহস্যটা জানিয়ে দেয়ার জন্যেই কি? কমলেশকে জোর ক'রে মেরে ফেলা হ'য়েছে। তার বুক কমজোরি করে দিয়ে সম্মোহনে ভয় দেখিয়ে-দেখিয়ে। মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করছে জানকীর। জানিয়ে দিলে কেন? কেন কেন?

চোখ মুছে, নিজেকে একটু সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে জানকী। ঘরের খিল খুলে কাউকে কিছু না বলে কয়ে একা একাই বেরিয়ে গেছে।

এসে পৌঁছেছে দিব্যরাজজীর আশ্রমে।

কেঁদে লুটিয়ে পড়েছে পায়ে। মহারাজ! বাঁচান নীলাঞ্জনকে রূপচাঁদের হাত থেকে। এক কমলেশ গেছে আমার। আর এক কমলেশও চলে যাবে আপনি না দেখলে।

একমনে সমস্ত ঘটনা শুনেছেন দিব্যরাজজী।

সান্ত্বনা দিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন, নির্দেশও দিয়েছেন। রোজ বিকেলে নিয়ে আসতে বলেছেন নীলাঞ্জনকে। মায়ের সঙ্গে আসবে। যে সময় নিজের ডেরায় বসে সম্মোহনের প্রভাব খাটায় নীলাঞ্জনের ওপর রূপচাঁদ।

দিব্যরাজজীর নির্দেশ পালন ক'রে চলেছে জানকী অক্ষরে অক্ষরে।

রোজ বিকেলে ঘরে বসে আসনে স্থির হ'য়ে। চিন্তাররাজ্যে স্থির-লক্ষের ইচ্ছের রাজ্যে মনকে ভাসিয়ে দেয়। মন চলে গেছে দিব্যরাজ-জীর কোলের নীলাঞ্জনের কাছে।

দিব্যরাজজীর কোলে শুয়ে নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে নীলাঞ্জন। সুখনিদ্রায় মগ্ন। জানকী আগলে বসে সামনে। রূপচাঁদের মন তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না নীলাঞ্জনের কাছে কিছুতেই। কিছুতেই না। ফিরে যাবে। নিশ্চয় ফিরে যাবে। জানকী নীলাঞ্জনের ধর্ম-মা। দেহরক্ষী।

নিয়ম ক'রে, ক'রে যাচ্ছে জানকী এই ধ্যানধারণা নিষ্ঠার সঙ্গে একমনে। করে যখন, তখন ও আর ওতে থাকে না। দেহটা পড়ে থাকে শুধু ঘরে। আর একটা জানকী, যে জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না কোন আঘাত যাকে স্পর্শ করে না, সেই জানকীই নীলাঞ্জনের চারপাশে দিব্যরাজজীকে ঘিরে পরিক্রমা ক'রে বেড়ায় ওখানে—আশ্রমে। দিব্যরাজজীর পুজোর ঘরে।

একই সময়ে পাশের ঘরে রূপচাঁদ নীলাঞ্জনের ওপর সম্মোহনের প্রভাব বিস্তারের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেয়। মন্ত্রজপ আর ইচ্ছে-শক্তির প্রয়োগ। ···আং···আগচ্ছ···। নীলাঞ্জন ভয়ানক ভয় পাচ্ছে। অসুস্থ হ'য়ে পড়ছে। আসছে আসছে। আসার জন্যে ছটফট করছে।

মাকে ধরাধরি করছে। এসো এসো এসো…।

রূপচাঁদের ক্রিয়াকলাপ অব্যর্থ। কোনদিন কোন কাজ বিফল হয় নি। হচ্ছে এই প্রথম। নিশ্চয় জানকী বাধা দিচ্ছে। মাথায় রক্ত চড়েছে। তারই বুকে বসে, তারই দাড়ি ওপড়ানো। বেইমান কোথাকার।

দুম দুম ক'রে পা ফেলে, বারান্দা কাঁপিয়ে এসেছে এঘরে। রূপ-চাঁদের রণং দেহি মূর্তি দেখে, হো-হো ক'রে হেসে উঠেছে জানকী। আগুনে ঘি পড়ল যেন। দপ ক'রে জ্বলে উঠেছে রূপচাঁদ। ওর কিছু বলার আগেই জানকী বলেছে, তোমাকে ঘোরাতে তুমিই বলেছো আমায়। রাগলে কি হবে! মাথা ঠাণ্ডা কর।

থপাস ক'রে বসে পড়েছে মেঝেয় রূপচাঁদ।

বলেছে, তোমার ওই গানের লাইনটা যে আমায় পাগল করে দেয়, খেপিয়ে তোলে। আমি তো সরে যেতে চাচ্ছি, কিন্তু, কিন্তু ওই লাইন। 'তুম ফুলোঁ। বনকর রহে দুনিয়া মে, ম্যায় কাঁটে বনকর রহুঁ সাথ মে। যারা আমার মায়ের বুকে যন্ত্রণার পেরেক পুঁতেছে ঠুকে ঠুকে। তাদের বুকে আমি বিষের কাঁটা হ'য়ে বিঁধে যেতে চাই। প্রথমদিনে তোমার ঘরে তোমার সঙ্গে এ লাইনটা আমি বার বার গেয়েছি গলায় গলা মিলিয়ে। লাইনটা আমার মনে দাগ কেটে বসে আছে আজো।

যারা মাকে দুঃখ দিয়েছে, তারা কিন্তু নেই আর ইহজগতে। অন্যের ওপর প্রতিশোধ নেয়া অন্যায় তোমার। যা হবার হয়ে গেছে। যা করার, করেছো আগে। আর নয়। আর এগোতে কিছুতেই দোব না তোমায় আমি। অন্তত আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত: বেশ জোর দিয়েই বলেছে জানকী।

নত মাথায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে রূপচাঁদ।

হ'লে হবে কি, আবার এসেছে তার পরদিন। তার পরদিন তার পরদিন। ওর কাজে বাধা পড়লেই ও কেমন হ'য়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। স্বাভাবিক অবস্থায় সুন্দর কথাবার্তা। আমি যাই বলি না

কেন, তুমি শুনো না। আমাকে ঘোরাও। দিব্যরাজজীর আদেশ পালন কর।

দোটানায় পড়েছে জানকী।

একদিকে ভালো ক'রে তোলো, আর একদিকে সর্বনাশী আমার ঘরে বসে, আমারই সর্বনাশের চেষ্টা! কোনটা নিয়ে থাকবে জানকী? জিজ্ঞেস করতে গেছলো দিব্যরাজজীর কাছে। কথায় বলে, হাকিম টলে তো হুকুম টলে না। দিব্যরাজজীর একই কথা। ওকে ঘোরাবার দায়িত্ব দিয়েছি আমি তোমার ওপর। তোমার ওপর।

ফিরে এসে দ্বিগুণ উৎসাহে আসনে বসেছে আবার! ধ্যানে দেখে, ওর সেই দশবছরের ফুটফুটে কমলেশই যেন সত্যিসত্যিই শুয়ে রয়েছে দিব্যরাজজীর কোলে। শোনা যায় মানুষ নাকি আবার জন্মায়। কে জানে। তবে নীলাঞ্জনের সঙ্গে কমলেশের বড্ড যেন মিল। বয়েসটারও।

জানকী ধ্যান করছে।

তার মঙ্গল হচ্ছে আলোয়-হাওয়ায় ভেসে ভেসে পৌঁছচ্ছে নীলাঞ্জনের কাছে। যেখানে দিব্যরাজজীও ধ্যানেমগ্ন নীলাঞ্জনের। রূপচাঁদের সম্মোহন ক্রিয়ার প্রভাব ছিন্ন করার সাধনায় ডুবিয়ে দিয়েছেন নিজেকে। মানসিক জপধ্যান চলছে একাগ্রচিত্তে।...রক্ষিনী...সম্মোহনীশক্তিং...। চন্দ্রের শোভার মধ্যে তার কোলে শুয়ে নীলাঞ্জন। সুস্থ-নীরোগ সতেজ সবল। বাইরের কোন শক্তিই ওকে স্পর্শ করতে পারবে না। পারবে না। কোন অনিষ্টের তাপউত্তাপ ওর দেহের কোন অঙ্গই ছুঁতে পারবে না। ফিরে যাবে। নিশ্চয় ফিরে যাবে।

রূপচাঁদ মুখে যতই বলুক, অভ্যেস ত্যাগ করতে পারেনি। বসেছে বিকেলে নিত্যকর্মপদ্ধতির মতো।

যা ফল হবার, তা হয়েছে।

আবার ব্যর্থ। রাগ—চণ্ডালের ভূত মাথায় চেপে বসেছে আবার। তার পরাজয়, তার আত্মসম্মানহানি—বরদাস্ত করবে না কোনমতেই রূপচাঁদ। রূপচাঁদ ক্ষমা করতে পারবে না কাউকে। তাদের কেউ দয়া করে নি, ক্ষমা করে নি। জানকীর ঘরে এক্ষুনি যাবে সে। একটা

হেস্তনেস্ত চায় রূপচাঁদ। একটা হেস্তনেস্ত। আর সহ্য করা যায় না। একেবারে মাথায় উঠে বসেছে!

আসন ছেড়ে উঠে পড়লো রূপচাঁদ।

জানকীর ঘরের সামনে এসে, ভেজানো চাপ দরজায় সজোরে মেরেছে লাথি। দড়াম শব্দে খুলে গেছে দরজা। ভীষণ চমকে উঠেছে জানকী। আসনে বসা দেহটা একটু উঠেই ধড়াস ক'রে পড়ে গেছে। জানকীর বুকের ওপর কে যেন একটা বড় পাথরের চাঁই বসিয়ে দিলে। দম নিতে পাচ্ছে না। নিশ্বাস ফেলতে পারছে না। আস্তে আস্তে ঢ'লে পড়েছে জানকী আসনের ওপর।

স্থির মনে একটা ছোট্ট শব্দে বিরাট আওয়াজ। যে কোন সময় জীবন বিপন্ন ক'রে তোলে। সব জেনেশুনেও কি মতিভ্রম রূপচাঁদের। ছুটে কাছে যেতে গিয়ে আছড়ে পড়েছে মেঝেয়।

জানকী ঢ'লে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান আপনা থেকেই ভেঙে গেছে দিব্যরাজজীর। ইচ্ছা শক্তির প্রভাবের ঘুম ভেঙেছে নীলাঞ্জনের। উঠে বসে জড়িয়ে ধরেছে দিব্যরাজজীকে।—মহারাজ। বুকের ভেতর বড্ড কষ্ট হচ্ছে। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে জানকী মাকে যে।

নীরবমুখে চেয়ে রইলেন দিব্যরাজজী নীলাঞ্জনের দিকে। কিছুক্ষণ। খুব আস্তে আস্তে বলেছেন। জানকীমা চলে গেছেন।

অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করেছে নীলাঞ্জন কানের কাছে মুখ এনে, দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে। কোথায়?

অনেক—অনেক ওপরে।

কোল থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে নীলাঞ্জন জানলার গরাদ ধরে। দু'চোখ আকাশে। দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ছে দূর থেকে দূরে। আরো দূরে···।